الفتاوى الألباني

ফাতাওয়ায়ে আলবানী

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী

সংকলন ও অনুবাদ

আব্দুল্লাহ মাহমুদ

অনুবাদ-সম্পাদনা

শাইখ ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী

শাইখ ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

বিলিভার্স ভিশন পাবলিকেশন্স
২১-২২, নুরুল হক টাওয়ার (৪র্থ তলা), পাটুয়াটুলী, ঢাকা।
অভিযোগ ও পরামর্শ : ০১৩২২ ৩৫২ ১০১

ফাতাওয়ায়ে আলবানী

(ইসলামের বুনিয়াদি বিষয়ের ওপর প্রশ্নোত্তরের এক অনবদ্য সংকলন)

ISBN : 978-984-35-2222-1

প্রকাশকাল : মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ। শাবান, ১৪৪৩ হিজরি

প্রুফ : মুহাম্মাদ সাজেদুল ইসলাম, মাহিন আলম

পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ :

Believers
Graphic Design & Printing Solution
Contact : +880 1611 409831

পরিবেশক : আত-তাওফীক প্রকাশন
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্রাসা মার্কেট নিচতলা, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৩৮১৬২২৯৬, ০১৯১৬৫২৪২৪১

অনলাইন পরিবেশক :
rokomari.com | wafilife.com | salafibooksbd.com
আলোকিত বই বিতান, বই আপণ, আনাবা বুকস, ইখলাস স্টোর

মূল্য : ৬৫০ টাকা

believersvision.com | info@believersvision.com | BelieversVision

সূচিপত্র

অধ্যায়: চার

হায়েয-নিফাস

অধ্যায়: পাঁচ

অজু

অধ্যায়: ছয়

মাসাহ

অধ্যায়: সাত

গোসল

অধ্যায়: আট

তায়াম্মুম

অধ্যায়: নয়

ফিতরাত

অধ্যায়: দশ

সালাত

অধ্যায়: এগারো

যাকাত

অধ্যায়: বারো

সিয়াম

অধ্যায়: পনেরো

ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেন

অধ্যায়: ষোলো

পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জা

অধ্যায়: সতেরো

দুআ ও আযকার

অধ্যায়: আঠারো

পান ও ভোজন

অধ্যায়: উনিশ

খেলাধুলা, শরীরচর্চা ও আনন্দ-ফুর্তি

অধ্যায়: বিশ

চিকিৎসা

অধ্যায়: একুশ

বিবাহ ও দাম্পত্য

অধ্যায়: বাইশ

বিবিধ বিষয়

প্রকাশকের কথা

আবদুল মালিক (রাহি) হতে বর্ণিত, আল্লাহর বাণী,

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার যারা 'উলিল আমর'।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আতা (রাহি) বলেন: 'উলিল আমর' বলতে ইলম ও ফিকহের অধিকারী আলিমদেরকে বোঝানো হয়েছে আর রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ বলতে কিতাব ও সুন্নাহর' অনুসরণকে বোঝানো হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

فَسْئَلُوٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

তোমরা যদি না জানো, তাহলে আহলুয যিকির [তথা কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানীদেরকে] জিজ্ঞেস করো।

বিংশ শতাব্দীর কিংবদন্তি মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুজাদ্দিদ, ইমাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আল-আলবানী (রাহি) 'উলিল আমর', 'আহলুয যিকির'-দের একজন। এরূপ মহান আলিমের কাছ থেকে মুমিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর লাভ করতে পারা সত্যিই সৌভাগ্যের ব্যাপার। আলহামদুলিল্লাহ।

বইটি পাঠের মাধ্যমে আমাদের দেশে আহলুল হাদীস ও হানাফি সম্প্রদায়ের মাঝে শাইখ আল-আলবানী সম্পর্কে গতানুগতিক ধারনার পরিবর্তন আসবে মনে করি। শাইখের ইলমের গভীরতা, অনবরত দলীল ও তাহকীক পেশ সত্যিই অভাবনীয়। বইটি প্রকাশ করতে পেরে বিলিভার'স ভিশন পরিবার সত্যিই ধন্য। মহান আল্লাহ তাআলা কিতাবটিকে কবুল করে নিন। কিতাবের পেছনে সকলের মেহনত কবুল করুন। নাজাতের উসিলা করে দিন। আমীন।

'গাফফার'-এর ক্ষমার ভিখারি
— মুহাম্মাদ মাহিন আলম
প্রকাশক

রাজকীয় সৌদি দূতাবাসের সিনিয়র কর্মকর্তা, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর দাওয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সম্মানিত সভাপতি, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, লেখক, গবেষক, **অধ্যাপক ড.শাইখ আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী** হাফিযাহুল্লাহ-এর

সুচিন্তিত অভিমত

ইন্নাল হামদা লিল্লাহি ওয়াহদাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা মাল্লা নাবিয়্যাহ বা'দাহ

বিশ্বখ্যাত মারকাযী দারসগাহ জামিয়া সালাফিয়া, বেনারস-এর এক সময়ের কৃতী ও মেধাবী ছাত্র, ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা-এর সাবেক কৃতী ছাত্র ও বর্তমানে খ্যাতনামা তরুণ মুহাদ্দিস, গবেষক, লেখক, শাইখ আব্দুল্লাহ মাহমুদ অনূদিত 'ফাতাওয়ায়ে আলবানী' গ্রন্থখানার পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পড়ার ও সম্পাদনাকর্মে সংশ্লিষ্ট থাকার সৌভাগ্য অর্জন হয়েছে। ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

বিংশ শতাব্দীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বখ্যাত সিরীয় আলেম ও মুহাদ্দিস আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ। যাকে বর্তমান শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। হাদীস গবেষণায় ও ইলমুল জারহ ওয়াত তাদীলে যিনি বর্তমান পৃথিবীতে আলোড়নসৃষ্টিকারী একজন মহান ব্যক্তি।

প্রবল ইচ্ছাশক্তি, অসীম সাহস, সুদৃঢ় মনোবল ও মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ তাওয়াক্কুল আর ইখলাস ভরা প্রত্যয় থাকলে সাধারণ একজন ঘড়ির মেকার হতে কীভাবে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসে পরিণত হওয়া যায়, তার জ্বলন্ত প্রমাণ হলেন, আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله। কীভাবে তিনি ইলমুল হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকে, আসমায়ে রিজালশাস্ত্রের তথা ইলমুল জারহ ওয়াত তাদীলে বিশ্বের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য বক্তিত্বে পরিণত হলেন, তা গোটা বিশ্ববাসীর জন্য এক বিরাট শিক্ষণীয় ব্যাপার। এ সব কিছুর তাওফীকদাতা কেবল মহান আল্লাহ তাআলা।

وما ذلك على الله بعزيز

তাদের জন্যই সুসংবাদ দুনিয়াবি জীবনে ও আখিরাতে। আল্লাহর বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই মহাসফলতা।[১]

---

১. সূরা ইউনুস ১০:৬৪

তিনিই হয়তো সমগ্র বিশ্বে সমকালীন অথবা বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তি। তিনি যেমন বিশ্বব্যাপী মহানন্দিত ও জনপ্রিয় তেমনি একটি বিশেষ মহলের নিকট নিন্দিত। এই মহলটি নিঃসন্দেহে হিংসুটে, কদার্য, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বিদআতী ও কিতাব-সুন্নাহর দুশমন।

তার বিরুদ্ধে বিরাট অভিযোগ যে, তার কোনো শিক্ষক ছিল না। তিনি স্বশিক্ষিত। কিন্তু অভিযোগটি নিছক মিথ্যাচার। এটা ঠিক যে, তার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি ছিল না কিন্তু তিনি যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, আদীব ও ফকীহদের নিকট হতে দারস গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন,

علامة الشام و ريحانتها محمد بهجة البيطار رحمه الله تعالى

তৎকালীন শামদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সালাফী আলেম আল্লামা মুহাম্মাদ বাহজাহ আল-বাইতার رحمه الله।

শাইখ আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله-এর পিতা আল্লামা হাজী নূহ رحمه الله নিজেই একজন প্রথম শ্রেণির আলেম ছিলেন। পিতার হাতেই শাইখের শিক্ষার হাতেখড়ি হয়েছিল। আল্লামা নূহ আলবেনিয়ায় একজন বিজ্ঞ ও খ্যাতনামা আলেম ছিলেন। তিনি তুরস্কের ইস্তাম্বুল নগরীতে শরীআহ বিষয়ে শিক্ষকতা করতেন। দ্বীনের স্বার্থে তিনি সপরিবারে শাইখ আলবানী رحمه الله-এর শৈশবকালে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে হিজরত করেন।

তার পিতা তাকে হাতেকলমে শিক্ষা দেন। শিশু আলবানীকে গড়ে তুলতে থাকেন শিক্ষা-দীক্ষায়। তিনি নিজ সন্তানের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা সিলেবাস তৈরি করেন। অনুরূপ তিনি তার একনিষ্ঠ বন্ধু আল্লামা শাইখ সাঈদ আল-বুরহানীর নিকট ছেলেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাঠান। শাইখ আলবানী رحمه الله তার নিকট হানাফী ফিকহ-এর কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। সেগুলোর মধ্য মারাকিল ফালাহ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাহুর মধ্যে পড়েন শযূরুয যাহাব। অনুরূপ তার নিকট আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং বালাগাতের কিতাবাদি পড়েন।

তা ছাড়া শাইখ আলবানী رحمه الله সে-সময় বিশ্বখ্যাত সালাফী আলেম ও সাহিত্যিক ও ফকীহ আল্লামা বাহজাহ আল-বাইতার-এর দারসে নিয়মিত বসতেন।

হানাফী শাইখ আলবানী رحمه الله কীভাবে সালাফী ইমামে পরিণত হলেন? তার পিতার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যে, ছেলে হানাফী মাযহাবের একজন রক্ষাকবচ আলেম হবেন। মুকাল্লিদদের রাহবার হবেন। কিন্তু তার তীক্ষ্ণ মেধা, আল্লামা বাহজাহ আল-বাইতারের প্রভাববিস্তারকারী দারস,

আল্লামা রশীদ রেযার মাসিক পত্রিকা 'আল-মানার'-এর প্রভাব, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া ও ইমাম ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ রাহিমাহুমুল্লাহ-এর কিতাবাদি অধ্যয়ন শাইখের ভিতরে প্রলয় সৃষ্টি করে ও তাকলীদী সমস্ত বাধার দেওয়ালকে ভেঙ্গে চুরমার করে বিশ্বনবীর হাদীসকে সকল মত ও মাযহাবের ওপর প্রাধান্য দিয়ে নিজেই সালাফিয়াতের মসনদে আসন গ্রহণ করেন।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, আল্লামা শাইখ বাহজাহ আল-বাইতার ﷺ-এর পিতা স্বয়ং কট্টর সূফীসাধক ছিলেন। সর্বেশ্বরবাদীর মতো কুফরী আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু আল্লামা বাহজাহ আল-বাইতার ﷺ তৎকালীন শামদেশের শ্রেষ্ঠ সালাফী আলেম আল্লামা জামালুদ্দীন কাসিমীর সংস্পর্শে এসে সালাফী আকীদা গ্রহণ করেন এবং সালাফীগণের ইমামে পরিণত হন। বিশ্বখ্যাত আরবী সাহিত্যিক আলী তানতাবী ﷺ এ প্রসঙ্গে বলেন,

وَمِنْ أَعْجَبِ الْعَجَبِ أَنَّ وَالِدَ الشَّيْخِ بَهْجَة كَانَ صُوْفِيًا مِنْ غُلَاةِ الصُّوْفِيَةِ الْقَائِلِيْنَ بِوَحْدَةِ الْوُجُوْدِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ عَرَبِي وَابْنِ سَبْعِيْنَ وَالْحَلَّاجِ

বড়ো বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, শাইখ বাহজাহ-এর পিতা ইবনে আরাবী, ইবন সাবঈন ও হাল্লাজের মতাদর্শ অনুযায়ী চরমপন্থি সূফী ও সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

আরও আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, শাইখ আল্লামা আলী তানতাবী ﷺ নিজেও একসময় গোঁড়া মাযহাবী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনিও সালাফী আকীদা গ্রহণ করেন। এঁরা সকলেই শামদেশ তথা বর্তমান সিরিয়ার নাগরিক ছিলেন।

বিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেও আল্লামা আলবানী ﷺ-এর কীর্তিমান জীবন ও কর্ম এতটাই অত্যুজ্জ্বল যে, যেন তিনি হাদীসের সেই স্বর্ণযুগকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। শতাধিক মূল্যবান গ্রন্থ লিখে পুরো বিশ্ববাসীকে চমকে দেন। তার প্রথম কিতাবখানাই সমগ্র পৃথিবীব্যাপী তাকে সামনে নিয়ে আসে। কিতাবখানা ছিল কবরপূজোর বিরুদ্ধে। গ্রন্থটির নাম হলো, তাহযীরুস সাজিদ মিন ইত্তিখাযিল কবূরি মাসাজিদ। পরবর্তীতে তার প্রতিটি পুস্তক মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। তার অমর রচনাবলির মধ্যে সিলসিলাতুল আহাদিসিস সাহীহাহ, সিলসিলাতুল আহাদীসিস যাঈফাহ ওয়াল মাওযুআহ, ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীসি মানারিস সাবীল, তামামুল মিন্নাহ ফিত তালীক আলা ফিকহিস সুন্নাহ, সিফাতু সলাতিন নাবী, সহীহ ও যঈফ আবূদাউদ, সহীহ ও যঈফ তিরমিযী, সহীহ ও যঈফ ইবনু মাজাহ, সহীহ ও যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব প্রভৃতি রচনাবলি।

মুসলিম উম্মাহর ইলমী উত্তরাধিকার সংরক্ষণ ও তার প্রচার-প্রসারে অসামান্য ও অভূতপূর্ব অবদান রাখায় আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله উম্মাতের কীর্তিমান পুরুষদের তালিকাভুক্ত হয়ে গেছেন। এ ধরিত্রীর বুক হতে তার নাম ও নিশানা মুছে ফেলার সাধ্য কারো নেই।

শাইখ আলবানী رحمه الله হাদীসশাস্ত্র ও তার মূলনীতিতে তথা হাদীস গ্রহণ ও বর্জনের মানদণ্ড বিষয়ে এবং হাদীসের সহীহ-যঈফ যাচাই-এর ক্ষেত্রে কিংবদন্তি তুল্য হলেও ইসলামী ফাতাওয়াতেও তার অবদান কম নয়। কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জীবনযাপনে ফাতাওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যোগ্য উত্তরসূরিগণ ও ইসলামী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও পারদর্শীগণই কেবল ফাতাওয়া প্রদানের যোগ্যতা ও বৈধতা রাখেন।

হাদীস যেহেতু নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখনিঃসৃত বাণী, কর্ম ও সম্মতি সুতরাং তা নির্ভুল ও অকাট্য। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর আলোকে প্রদত্ত ফাতাওয়া অনুরূপ ফিকহী মাসআলা-মাসাইল, এগুলো মানুষের মতামত ও গবেষণা। সুতরাং এখানে কিছু ভুলের সম্ভাবনা থেকেই যায়। কেবল নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফাতওয়াই নির্ভুল। বাকি সবার ফাতওয়া বিশ্লেষণযোগ্য। সুতরাং ফাতাওয়ার ক্ষেত্রে আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله-এরও কিছু ফাতওয়ায় ব্যতিক্রম ও ভিন্নতা পাওয়া যায়। সেসব ক্ষেত্রে তিনি হাদীসের বাহ্যিকরূপ দেখে ফাতওয়া প্রদান করেছেন। যা খুবই সীমিত। সর্বোপরি তিনি ফিকহ, ইজতিহাদ ও ফাতওয়ার ক্ষেত্রেও সমগ্র বিশ্বে প্রথমসারির একজন বিশ্ববরেণ্য আলেম।

বাংলাভাষায় গ্রহণযোগ্য ফাতাওয়ার কিতাবাদি খুবই অপ্রতুল এবং নেই বললেই চলে। এমন এক পরিবেশ-পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে শাইখ আবদুল্লাহ মাহমুদ অনূদিত 'ফাতাওয়ে আলবানী' ফাতাওয়ার ক্ষেত্রে বিরাট এক সংযোজন। শাইখ আব্দুল্লাহ মাহমুদ বিস্ময়কর প্রতিভাবান ও সম্ভাবনাময় এক তরুণ আলেম ও গবেষক। তার ভাষাজ্ঞান ও ইলমী যোগ্যতায় সত্যিই আমি ভীষণভাবে মুগ্ধ। এ ধরনের মেধাবী ও যোগ্যতর আলেমদের নিয়ে 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস' শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া رحمه الله-এর বিশ্বখ্যাত ৩৭ খণ্ডে লিখিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ ফাতাওয়াগ্রন্থ 'মাজমূউল ফাতাওয়া' বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার চিন্তা ও পরিকল্পনা করছে। মহান আল্লাহ আমাদের তাওফীক এনায়েত করুন, আমীন।

শাইখ আব্দুল্লাহ মাহমুদ অনূদিত আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله-এর 'ফাতাওয়ায়ে আলবানী' শীর্ষক এ মূল্যবান গ্রন্থখানার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার কামনা করছি। আশাবাদ ব্যক্ত করছি যে, শাইখ আলবানী رحمه الله-এর আকীদা ও মানহাজ বাংলা ভাষাভাষী

মানুষের ঘরে-ঘরে ও হৃদয়ে-হৃদয়ে প্রবেশ করুক এবং তারা নিঃশর্ত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্বনবীর হাদীস ও জীবনচরিতকে নিজেদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করুক। মহান আল্লাহ এ তাওফীক দান করুন আমাদের সকলকে। মহান লেখক, অনুবাদক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।



(আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী)

সিনিয়র কর্মকর্তা

রাজকীয় সৌদি দূতাবাস

মাদরাসাতুল হাদীস নাজির বাজার ঢাকা-এর সুযোগ্য অধ্যক্ষ, আই.ই.আর.এফ-এর সম্মানিত প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সম্মানিত সেক্রেটারি জেনারেল, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, লেখক, গবেষক **ড.আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী** হাফিযাহুল্লাহ

- এর

সুচিন্তিত অভিমত

আলহামদুলিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহী আজমাইন,

আম্মাবা'দ

বিশিষ্ট আলেম, গবেষক, মুহাদ্দিস, আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন মেধাবী ছাত্র, অতঃপর 'মাদরাসাতুল হাদীস নাজির বাজার ঢাকা'-এর সহকর্মী শাইখ আব্দুল্লাহ মাহমুদ কর্তৃক অনূদিত 'ফাতাওয়ায়ে আলবানী' গ্রন্থটি আমি পড়ে দেখেছি।

আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিসরে অত্যন্ত মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ কথা উল্লেখ করেছেন গ্রন্থের সম্পাদক, আমাদের শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক হাফিযাহুল্লাহ। তার কথাগুলোই আলবানী رحمه الله-এর বিস্তারিত জীবনী হিসেবে যথেষ্ট মনে করছি। শুধু এটুকুই বলতে চাই, ইমাম আলবানী رحمه الله বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হিসেবে যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ঠিক তেমনি আকীদা-সহ সকল শাস্ত্রে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নির্ভরযোগ্য ইমাম। বিদ্বেষ থেকে অন্ধ মুকাল্লিদরা তার ব্যাপারে অনেক কিছু বলে বেড়ালেও বাস্তবে আমরা লক্ষ করি, সবাই তার মূল্যবান গবেষণামূলক তাখরীজ ও তাহকীকী গ্রন্থসমূহ পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইমাম আলবানী رحمه الله-কে কবুল করেছেন। যার ফলে বাহ্যিকভাবে বিদ্বেষ প্রকাশ করলেও বিদ্বেষীরা আড়ালে তার গবেষণা হতে উপকৃত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে।

অপরপক্ষে যারা আহলুস সুন্নাহ-আহলুল হাদীস, ইমাম আলবানী رحمه الله তাদের কাছে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে কতটুকু ভালোবাসার পাত্র, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিংশ শতাব্দীর বিশ্বসেরা আলেম ইমাম ইবন বায رحمه الله-এর স্বীকৃতি থেকেই তা বোঝা যায়। তিনি তার ব্যাপারে বলেন, 'আসমানের নিচে আমার জীবনে হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শী হিসেবে আলবানী-এর চেয়ে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন আর কাউকে দেখিনি।'

ইমাম আলবানী رحمه الله-এর অসংখ্য গবেষণামূলক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ আরবী ভাষায় প্রকাশ হলেও কিছু গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় এমনকী বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে; হচ্ছে এবং হবে ইনশাআল্লাহ। তবে জ্ঞানপিপাসুদের অধিক প্রতীক্ষার বিষয় ছিল, আলবানী رحمه الله-এর মূল্যবান ফাতাওয়া বাংলায় অনুবাদ হোক। আলহামদুলিল্লাহ সেই কাজটি আমাদের অত্যন্ত স্নেহভাজন উদীয়মান গবেষক লেখক মুহাদ্দিস আমার সুযোগ্য মেধাবী ছাত্র অতঃপর সহকর্মী শাইখ আব্দুল্লাহ মাহমুদ হাতে নেওয়ায় আমি অত্যন্ত খুশি হই এবং আমাকে অনুবাদ সম্পাদনার অনুরোধ জানালে স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করি। যাতে আমি নিজেও ইমাম আলবানী رحمه الله-এর ফাতাওয়া হতে উপকৃত হতে পারি ।

শত ব্যস্ততার মধ্যে চেষ্টা করেছি গ্রন্থটি পড়ার। অত্যন্ত সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ হয়েছে এবং অসংখ্য ফাতাওয়া হতে পাঁচশত ফাতাওয়া নির্বাচন করে এ গ্রন্থটি প্রস্তুত করা হয়েছে। আশাকরি, কুরআন ও হাদীসের অনুসারীদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান পাথেয় হিসেবে কাজে আসবে। সেই সঙ্গে অনুবাদককে পরামর্শ দিয়েছি, যাতে ধারাবাহিকভাবে ইমাম আলবানী رحمه الله-এর ফাতাওয়াসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। আল্লাহ তাআমা গ্রন্থটির লেখক অনুবাদক ও যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকেই জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং এ অনূদিত গ্রন্থটিকে কবুল করুন, আমীন!



(ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী)
প্রিন্সিপাল
মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা

সংকলক-অনুবাদকের জবানবন্দি

ইন্নালহামদা লিল্লাহি ওয়াহদাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা মাল্লা নাবিয়্যা বা'দাহ

আল্লাহ তাআলা দ্বীন ইসলামকে অনেক বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্টমণ্ডিত করেছেন। তম্মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি দ্বীন ইসলামকে সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ আমি-ই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমি তা সংরক্ষণ করব।[২]

আল্লাহ তাআলা এ দ্বীনকে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব নিয়েছেন, তাই এ লক্ষ্যে তিনি যুগে যুগে এমন মহৎ লোকদের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন, যারা দ্বীনকে সংরক্ষণ করার নিমিত্তে নিজেদের সবকিছু বিসর্জন করে দিয়েছেন। গোটা জীবনকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুনিয়া-ত্যাগের পর ফিতনা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কিছু লোক মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, দ্বীনের অনেক কিছু বিকৃত করতে চেষ্টা করে এবং দ্বীনের মূলরূপকে পরিবর্তন করতে নীলনকশা আঁকে। সাহাবীগণ তাদের এসব হীন প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেন।

সাহাবীদের পর তাবিয়ীগণ এবং তাবিয়ীগণের পর তাবা-তাবিয়ীগণ দ্বীন সংরক্ষণের এ দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। তাদের পর মুহাদ্দিসগণ এ দায়িত্বে ব্রত হন। তারা শ্রম-সাধনা, অর্থ, সময়, জ্ঞান-সহ যাবতীয় উপায়-উপকরণ ব্যয় করে এ গুরুদায়িত্ব পালন করেন। দ্বীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে সমরে অবতীর্ণ হন।

যুগে-যুগে ইমাম শাফিয়ী, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল, ইমাম বুখারী, ইমাম ইবন আবী হাতিম, ইমাম নববী, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ, ইমাম ইবন হাজার আসকালানী, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইমাম শাওকানী, ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলাভী, ইমাম মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী, ইমাম শাহ ইসমাঈল রাহিমাহুমুল্লাহ-এর মতো মহৎপ্রাণগণের আগমন ঘটে। তারা ইসলামের জন্য সবকিছুই বিলীন করে দেন।

এরই ধারাবাহিকতায় বিংশ ও একবিংশ শতকের একজন মহৎপ্রাণের নাম হচ্ছে ইমাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী ﷺ। তাকে নতুন করে পরিচয় করানোর কিছুই নেই। বরং 'আলবানী' একটি তারকা। যে তারকা সবার কাছে পরিচিত। হাদীসশাস্ত্রে গগনস্পর্শী অবদান এবং এ

২. সূরা হিজর, আয়াত : ৯

শাস্ত্রে নতুন করে প্রাণসঞ্চার করার কারণে তিনি কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের মাঝে বেঁচে থাকবেন, ইনশাআল্লাহ।

ইমাম আলবানী ﷺ-এর অবদান শুধু হাদীসশাস্ত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং আকীদা, মানহাজ, ফিকহ ও আধুনিক নানান বিষয়ে তার অবদান ছিলো শীর্ষস্থানে। তিনি আকীদা, মানহাজ ও ফিকহ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে যে ফাতাওয়া দেন এবং জ্ঞানের সাক্ষরতা রেখে যান, তা বর্তমানে প্রায় ৪০ খণ্ডে প্রকাশিত।

ইমাম আলবানী ﷺ হাদীসশাস্ত্রে যে বিরাট অবদান রেখেছেন, তা থেকে বাংলাভাষী মুসলিমরা উপকৃত হলেও তার আকীদা, মানহাজ ও ফিকহী অবদান থেকে বঞ্চিত রয়েছে। ইমাম আলবানী ﷺ-এর হাদীসশাস্ত্রের বাইরেও অন্যান্য ইলমী ঝরনা থেকে বাংলাভাষী মুসলিমরা যেন উপকৃত হতে পারে, সে-লক্ষ্যে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ফিকহ কেন্দ্রিক 'ফাতাওয়ায়ে আলবানী' সংকলন। ইনশাআল্লাহ তার ফাতাওয়ার সংকলন সামনে আরও কয়েক খণ্ডে প্রকাশ হবে।

ইমাম আলবানী ﷺ-এর আকীদাশাস্ত্রে অবদানের সাথে বাংলাভাষীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য তার 'আল-আকীদাতুত তহাবিয়্যা' এর ব্যাখ্যার অনুবাদ শেষ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। এ ছাড়া বর্তমানে মানহাজগত যে বিচ্যুতি লক্ষ করা যাচ্ছে, তার থেকে ফিরিয়ে এনে সঠিক মানহাজের দিশাপ্রদানের অভিপ্রায়ে তার মানহাজ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর সংকলন ও অনুবাদের কাজ চলমান। এ ছাড়া 'ইসলামী ফিকহ' শীর্ষক তার একটি বই অনুবাদের ইচ্ছা আছে। ওয়ামা তাওফীকী ইল্লাবিল্লাহ।

❑ ফাতাওয়ায়ে আলবানী সংকলন ও অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি

১. 'ফাতাওয়ায়ে আলবানী'-এর অধিকাংশ ফাতাওয়া শাইখ ড.শাদী ইবন মুহাম্মাদ ইবন সালিম আলে-নুমান সংকলিত 'জামিউ তুরাসিল আল্লামা আলবানী ফিকহ' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

২. 'ফাতাওয়ায়ে আলবানী' প্রশ্নোত্তর আকারে সংকলন করা হয়েছে। অধিকাংশ প্রশ্ন আমার নিজের পক্ষ থেকে সৃষ্ট। তবে যেসব প্রশ্ন ইমাম আলবানীকে করা হয়, সেসব প্রশ্নের হুবহু অনুবাদ করা হয়েছে, নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন করা হয়নি।

৩. ইমাম আলবানী ﷺ-এর প্রশ্নের জবাব ও ফাতাওয়াগুলো কোনোরকম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা ছাড়াই অনুবাদ করা হয়েছে। তবে কোনো কোনো জায়গায় পাঠকদের সুবিধার্থে

হুবহু অনুবাদ না করে সংক্ষিপ্ত অথবা বৃদ্ধি করা হয়েছে। যেসব জায়গায় সংক্ষিপ্ত বা বৃদ্ধি করা হয়েছে, সেসব জায়গা টীকায় 'পরিমার্জিত' লিখে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে।

৪. টীকায় আয়াত ও হাদীসের যে উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে, তা আমার নিজের পক্ষ থেকে। টীকায় সকল হাদীসের হুকুম লাগানো হয়নি। কারণ, তিনি গ্রহণযোগ্য হাদীস ছাড়া দলীল গ্রহণ করতেন না। তবে দুএক জায়গায় প্রদত্ত ফাতাওয়াকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি দুর্বল হাদীস এনেছেন। সে-দুএকটি হাদীসের দুর্বলতা টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. ইমাম আলবানী رحمه الله-এর ফাতাওয়া সংকলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার ফাতাওয়া ও মতামত বাংলাভাষীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এ জন্য এখানে এমন ফাতাওয়াও উল্লেখ করা হয়েছে, যার সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে একমত নই। একমত না-হলেও আমি তার ফাতাওয়া ও মতামতের বিপরীতে কোনো টীকা লিখিনি এবং তার ফাতাওয়া খণ্ডন করিনি।

'ফাতাওয়ায়ে আলবানী' সংকলনের পেছনে যার অবদানের কথা না-বললেই নয় তিনি হলেন, দ্বীনীভাই হুসাইন বিন মোয়াজ্জেম পলাশ। মূলত তার অনুরোধ ও পীড়াপীড়িতে এ সংকলনের কাজ আরম্ভ করি। তিনি অনুরোধ ও পীড়াপীড়ি না-করলে হয়তো এ খিদমতের কথা কখনো কল্পনায়ও আসতো না। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আরও শোকর আদায় করছি ড. শাইখ আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী এবং আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. শাইখ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী হাফিযাহুমুল্লাহ-এর। তারা উভয়ে আমার মতো নগণ্য ব্যক্তির অনুরোধে সাড়া দিয়ে চরম ব্যস্ততার মাঝেও ফাতাওয়াটির আদ্যোপান্ত পড়ে সম্পাদনা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন এবং দ্বীনীকাজে খেদমত করার তাওফীক দান করুন।

আল্লাহ যেন আমার এ কাজটি গ্রহণ করেন এবং এটিকে আমার পরকালের পরিত্রাণের অবলম্বন বানান-দুআ করবেন। সাধ্যমতো এ সংকলনটি নির্ভুল রাখার চেষ্টা করেছি। তারপরও মানবীয় দুর্বলতার কারণে ভুল থাকা খুবই স্বাভাবিক। কোনো ভুল নজরে পড়লে বা কোনো সংশোধনী প্রয়োজন মনে হলে অনুগ্রহপূর্বক জানিয়ে কৃতার্থ করবেন।

আল্লাহর অনুগ্রহ ও ক্ষমাপ্রার্থী

— **আব্দুল্লাহ মাহমুদ**

৩১ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

অধ্যায় এক

তাওহীদ ও আকীদাহ

প্রশ্ন ০১: আরশ কী? আরশ দ্বারা কি ক্ষমতা ও রাজত্ব উদ্দেশ্য?

উত্তর : অনেক আয়াত ও হাদীস থেকে প্রমাণ হয়, আরশ এক বিরাট সৃষ্টি। এ কারণে আল্লাহ তাআলা আরশকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করে বলেছেন, তিনি আরশওয়ালা।[৩] আরশের অন্যতম কিছু বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

আর সেদিন তোমার রবের আরশ আটজন ফেরেশতা তাদের (নিজেদের) ওপর বহন করবে।[৪]

আরশের অবস্থান পানির ওপর। আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে, তাদের একেকজনের কানের লতি ও কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান ৭শ বছরের রাস্তার সমান। আরশের রয়েছে পায়া। তা আসলে জান্নাতুল ফিরদাউসের ছাদ। এসব বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে। এসব থেকে প্রমাণিত হয়, যারা বলেন, আরশ দ্বারা আল্লাহর ক্ষমতা ও রাজত্ব উদ্দেশ্য-তাদের এ ব্যাখ্যা বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য।[৫]

প্রশ্ন ০২: সাধারণ মানুষ এমনকী অনেক আলেমকে বলতে শোনা যায়, আল্লাহ তাআলা সর্বত্র বিরাজমান। তাদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কী হবে?

জবাব : তারা যদি উদ্দেশ্য নেন, আল্লাহ তাআলা সত্তাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান, তবে তা ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট কথা। আল্লাহ তাআলা সত্তাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান আকীদাহ ওয়াহদাতুল উজূদ তথা সর্বেশ্বরবাদ আকীদাহর অংশ। ওয়াহদাতুল উজূদ-সর্বেশ্বরবাদ মূলত চরমপন্থি সূফীদের আকীদাহ। তারা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে বিভাজন করে না। তাদের গুরুজনের মতে, 'তুমি চোখে

৩. সূরা গাফির, ৪০:১৫

৪. সূরা আল-হাক্কাহ, ৬৯:১৭

৫. আত-তালীক আলা শারহিল আকীদাতিত তহাবিয়্যাহ, পৃ. ৫৪

যা-কিছু অবলোকন করো, সবই আল্লাহ।' তারা যা বলে আল্লাহ তা থেকে অনেক উর্ধ্বে ও পবিত্র।[৬]

প্রশ্ন ০৩: ঈমান ও ইসলাম কি একই জিনিস?

জবাব: ঈমান ও ইসলাম এক জিনিস, না ভিন্ন জিনিস, তা নিয়ে আলেমদের মাঝে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশ সালাফের মতে, উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন জিনিস, এক জিনিস নয়। এ মতটি সঠিক। কেননা, এ মতের অনুকূলে স্পষ্ট আয়াত ও হাদীস রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

বেদুঈনরা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি।' বলে দিন, 'তোমরা ঈমান আনোনি। বরং বলো, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।' তোমাদের অন্তরে এখনো ঈমান প্রবেশ করেনি।[৭]

প্রসিদ্ধ হাদীসে জিবরীলে ঈমান ও ইসলামকে পৃথকভাবে উল্লেখ করে উভয়ের মাঝে পার্থক্য সূচিত করা হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ কিতাবুল ঈমানে বলেন, আমরা যদি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সমাধান গ্রহণ করি, তবে প্রমাণ হয় যে, ঈমান ও ইসলাম ভিন্ন ভিন্ন জিনিস; যদিও ব্যক্তির মাঝে উভয়টি বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। কারো মাঝে ঈমান ও ইসলাম না থাকলে সে কখনো জান্নাতী হতে পারবে না। জান্নাতে প্রবেশের জন্য মুসলিম হওয়া বাঞ্ছনীয়। হাদীসে জিবরীলে রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয়ের ব্যাপারে যা ব্যক্ত করেছেন, তা সঠিক। তিনি সেই হাদীসে দ্বীন ও দ্বীনের অনুসারীদের তিন স্তরে ভাগ করেছেন : প্রথম স্তর হলো ইসলাম, মধ্যবর্তী স্তর হলো ঈমান, আর সর্বোচ্চ স্তর হলো ইহসান। যে অপেক্ষাকৃত উঁচু স্তরে পৌঁছে যায়, সে তার নিচুস্তর স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্জন করে ফেলে। অতএব, প্রত্যেক মুহসিন মুমিন। প্রত্যেক মুমিন মুসলিম। কিন্তু প্রত্যেক মুসলিম মুমিন নাও হতে পারে।

এ ব্যাপারে তথ্যপূর্ণ ও বিশ্লেষণধর্মী বিস্তারিত আলোচনা জানতে উৎসুক ব্যক্তি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহর উল্লিখিত কিতাব অধ্যয়ন করতে পারেন। কেননা এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ এটিই।[৮]

৬. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ১০৪৬ নং হাদীসের অধীনে
৭. সূরা হুজুরাত, ৪৯:১৪
৮. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ১৫৫ নং হাদীসের অধীনে

প্রশ্ন ০৪: কুফর ও শিরকের মাঝে কি কোনো পার্থক্য রয়েছে?

জবাব: শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে কুফর ও শিরকের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। প্রত্যেক কুফর শিরক আর প্রত্যেক শিরক কুফর। সুরা কাহাফে[৯] উল্লিখিত দুই বাগানের মুমিন মালিকের কথোপকথন কুফর ও শিরকের মাঝে পার্থক্য না থাকা প্রমাণ করে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তা স্মরণে রাখা জরুরি। কারণ, এর মাধ্যমে অনেক সংশয় দূর হয়ে যাবে।[১০]

প্রশ্ন ০৫: কুরআনের মাধ্যমে কি শপথ করা যাবে?

জবাব: কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম। আল্লাহর কালাম কোনো সৃষ্টবস্তু নয়। অতএব, কুরআনের শপথ করা যাবে।[১১]

প্রশ্ন ০৬: আল্লাহর সিফাত-গুণের কি শপথ করা যায়?

জবাব: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

يُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ كَانَ بَلَاءً فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اصْبُغُوهُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيَصْبُغُونَهُ فِيهَا صَبْغَةً فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ أَوْ شَيْئًا تَكْرَهُهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَكْرَهُهُ قَطُّ

দুনিয়ায় সবচেয়ে কষ্টে দিনাতিপাত করা জান্নাতীকে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ বলবেন, তাকে তোমরা জান্নাতে সামান্য অবগাহন করো। তাকে জান্নাতে সামান্য অবগাহন করানো হবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'আদম সন্তান! তুমি কখনো কষ্টে দিনাতিপাত করেছ বা অপছন্দনীয় জিনিস কখনো অবলোকন করেছ?' সে বলবে, 'তোমার ইজ্জতের শপথ করে বলছি, আমি কখনো আমার অপছন্দনীয় জিনিস অবলোকন করিনি।'[১২]

৯. আয়াত: ৩২-৪৪

১০. আত-তা'লীক মিন শারহিল আকীদাতিত তহাবিয়্যাহ, পৃ. ৬৬

১১. কুরআনের শপথ দুধরনের হতে পারে। ক. স্বয়ং কুরআন তথা আল্লাহর কালামের শপথ করা। খ. মুসহাফের শপথ করা। কুরআন তথা আল্লাহর কালামের শপথের ব্যাপারে ইমাম আলবানী যা বলেছেন তা সঠিক। তবে এখানে ইমাম আলবানী মুসহাফের শপথের কথা আলোচনা করেননি। আর মুসহাফের শপথ করার বৈধতা-অবৈধতা আলোচনা সাপেক্ষে। কেউ যদি মুসহাফের শপথ করা দ্বারা মুসহাফে থাকা আল্লাহর কালামের শপথ করে থাকে, তাহলে তা কুরআনের শপথ করার ন্যায় জায়েয। আর কেউ যদি মুসহাফের শপথ করা দ্বারা স্বয়ং মুসহাফের, যেমন মুসহাফের পাতা, কালী ও মুসহাফে থাকা মানুষসৃষ্ট কোনো কিছুর শপথ করে থাকে, তাহলে সে-শপথ জায়েয নয় এবং এর মাধ্যমে শপথ হবে না। কারণ, সে গাইরুল্লাহর নামে শপথ করেছে। আর গাইরুল্লাহর নামে শপথ করার বিধান ওপরে আলোচনা করা হয়েছে।-সংকলক

১২. সহীহ মুসলিম, ৬৯৮১

এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয়, আল্লাহর সিফাত-গুণের শপথ করা জায়েয। ইমাম বাইহাকী তার 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন, 'আল্লাহর সিফাত-গুণসমূহ যেমন; ইজ্জত, কুদরত, মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানুভবতা, কথা, শ্রবণ ইত্যাদির শপথ সংক্রান্ত অধ্যায়।' এরপর তিনি তার স্বপক্ষে অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। উপরি-উক্ত হাদীসটির প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। এরপর ইবন মাসউদ ﷺ সহ অন্যান্য সাহাবীর আসার নিয়ে এসেছেন। সর্বশেষে বলেছেন, 'এসব থেকে প্রমাণ হয়, কুরআনের মাধ্যমে শপথ করলে,[১৩] তা শপথ হিসেবে গণ্য হবে।'[১৪]

প্রশ্ন ০৭: সর্বপ্রথম সৃষ্টি কী?

জবাব: বিখ্যাত সাহাবী ইবন আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ خَلَقَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ الْقَلَمُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَكْتُبَ كُلَّ شَيْءٍ يَكُونُ.

> আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে সবকিছু লেখার আদেশ দেন।[১৫]

অধিকাংশ মানুষের আকীদাহ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ ﷺ-এর নূর সৃষ্টি করেন। উল্লিখিত হাদীসের মাধ্যমে তাদের এ আকীদাহ বাতিল প্রমাণ হয়। তাদের এ আকীদাহর পক্ষে কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই। মুসান্নাফ আবদুর রাযযাকে এ সংক্রান্ত বর্ণিত হাদীসটির সনদ অগ্রহণযোগ্য। 'সিলসিলাতুয যঈফাহ' গ্রন্থে ঐ হাদীস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

যারা মনে করেন, সর্বপ্রথম সৃষ্টি আরশ, উল্লিখিত হাদীস তাদের এ মতকে নাকচ করে। আরশ সর্বপ্রথম সৃষ্টি হওয়ার পক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো প্রমাণ নেই। এটি ইমাম ইবন তাইমিয়াহ প্রমুখদের বিভিন্ন হাদীসের আলোকে ইজতিহাদি-গবেষণালব্ধ মত। আর স্বীকৃত মূলনীতি হচ্ছে, ব্যক্তির ইজতিহাদ ও গবেষণার ওপর স্পষ্ট দলিল প্রাধান্য পাবে। তাই 'সর্বপ্রথম সৃষ্টি কলম' এ মতটি প্রণিধানযোগ্য; কেননা, এ মতের পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান।

---

১৩. ৯নং টীকা দ্রষ্টব্য
১৪. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ১১৬৭ নং হাদীসের অধীনে
১৫. তিরমিযি, ২১৫৫; সিলসিলাতুস সহীহাহ, ১৩৩

আরশ সৃষ্টির পর সর্বপ্রথম কলমকে সৃষ্টি করা হয়েছে-এ তাবীল-ব্যাখ্যা বাতিল। কেননা এমন তাবীল-ব্যাখ্যা তখন গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যখন আরশ সর্বপ্রথম সৃষ্টি হওয়ার পক্ষে অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান থাকবে। অথচ এর পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। তাই এ তাবীল-ব্যাখ্যা সঠিক ও সিদ্ধ নয়।

'সৃষ্টবস্তু অনাদি' এ মতও উল্লিখিত হাদীসের মাধ্যমে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণ হয়। এ মতের অনুসারীরা বলেন, 'আমরা যে-ই সৃষ্টির কথা উল্লেখ করি না কেন, তার পূর্বে অন্য সৃষ্টি বিদ্যমান ছিল। এভাবে ধারাবাহিকভাবে এক সৃষ্টির পূর্বের আরেকটি সৃষ্টির কথা উল্লেখ করতে গেলে সৃষ্টির কোনো সূচনাকাল নির্ধারণ করা যায় না। তাই বলা যাবে না, অমুক জিনিস সর্বপ্রথম সৃষ্টি।' উল্লিখিত হাদীসের মাধ্যমে এ মত বাতিল প্রমাণ হয় এবং নির্ধারিত হয়ে যায় যে, সর্বপ্রথম সৃষ্টি কলম। অতএব, অকাট্যভাবে প্রমাণ হয়, কলমের পূর্বে কোনোকিছু সৃষ্টি করা হয়নি।[১৬]

প্রশ্ন ০৮: আল্লাহর সিফাত-গুণাবলি সংক্রান্ত আয়াতসমূহ কি মুতাশাবিহ- দ্ব্যর্থবোধক?

জবাব: এক দৃষ্টিকোণ মুতাশাবিহ-দ্ব্যর্থবোধক তথা গুণাবলির ধরন ও প্রকৃতি জানার দিকে থেকে তা মুতাশাবিহ-দ্ব্যর্থবোধক। কেননা, আমরা তার ধরন ও প্রকৃতি জানি না। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে মুতাশাবিহ নয় তথা অর্থ জানার দিক থেকে তা মুতাশাবিহ-দ্ব্যর্থবোধক নয়। আমরা সেসব সিফাতের অর্থ জানি। আরবী ভাষায় সেসবের অর্থ সবাই অবগত। অতএব, আমরা বলব- ধরন ও প্রকৃতির দিক থেকে তা মুতাশাবিহ-দ্ব্যর্থবোধক। আমরা আল্লাহর সত্তার ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুই জানি না। অনুরূপ তাঁর সিফাতের ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কেও কিছুই জানি না।

ইমাম খাতীব বাগদাদী বলেন, 'আল্লাহর সত্তার ব্যাপারে আমাদের অবস্থান যেমন, তাঁর সিফাত-গুণাবলির ব্যাপারেও আমাদের অবস্থান তেমন। আমরা তাঁর সত্তার ব্যাপারে তাই বলি এবং সাব্যস্ত করি, তিনি যা বলেছেন ও সাব্যস্ত করেছেন। আমরা যেমন তাঁর সত্তাকে অস্বীকার করি না, তেমনি তাঁর সিফাতসমূহকেও অস্বীকার করি না। আমরা যেমন তাঁর সত্তার কোনো ধরন ও প্রকৃতি বর্ণনা করি না, তেমনি তাঁর সিফাতেরও ধরন ও প্রকৃতি বর্ণনা করি না।'[১৭]

১৬. নাযমুল ফারাইদ মিম্মা ফী সিলসিলাতাইল আলবানী মিনাল ফাওয়াইদ, ১/২৪-২৫
১৭. ফাতাওয়াল ইমারাত, ১৭

প্রশ্ন ০৯: ওলিদের নামে কবরে জবাইকৃত প্রাণী খাওয়া কি জায়েয?

জবাব: ওলিদের নামে কবরে যেসব প্রাণী জবাই করা হয়, তা খাওয়া জায়েয নয়। কেননা, সেসব প্রাণী গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই ও উৎসর্গ করা হয়েছে। আর হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যেসব প্রাণী গাইরুল্লাহর নামে জবাই করা বা উৎসর্গ করা হয়, তা হারাম।[১৮]

প্রশ্ন ১০: গণকদের কাছে যাওয়া এবং তাদের ভবিষ্যৎবাণী বিশ্বাস করা কেন হারাম? অথচ তারা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতো বিভিন্ন উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে অদৃশ্যের খবরাখবর সম্পর্কে অবহিত হয়।

জবাব: আমরা সহীহ হাদীস থেকে গণকদের অদৃশ্যের সংবাদ প্রাপ্তির উৎস জানতে পারি। হাদীসে বলা হয়েছে, আসমানে ফেরেশতাদের মাঝে দুনিয়াবি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে (দুষ্টু) জিনেরা গোপনে কান পেতে তা শোনার চেষ্টা করে। তারা অনেক সময় সামান্য কিছু তথ্য পেয়ে যায়। তারপর যেসব মানুষ তাদের বন্ধু তাদের সাথে তারা সাক্ষাৎ করে। এরপর শোনা সেই সামান্য সত্য কথার সাথে হাজারো মিথ্যা তথ্য যুক্ত করে তাদের কাছে পেশ করে। প্রাপ্ত সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত তথ্যের সাথে সেসব মানুষ আরও মিথ্যা কথা সংযুক্ত করে।[১৯] আসমান থেকে প্রাপ্ত সামান্য সঠিক তথ্যের কারণে অনেক সময় তাদের কিছু কথা বাস্তবতায় রূপ নেয়। ফলে মানুষের মধ্যে বিশ্বাস জন্ম নেয় যে, তারা আসলেই অদৃশ্যের সংবাদ জানে। এভাবে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ গণকদের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন।[২০]

জ্যোতির্বিজ্ঞানী বা ডাক্তারদের সাথে গণকদের কোনো সাদৃশ্য নেই। কেননা, জ্যোতির্বিজ্ঞানী বা ডাক্তাররা কখনো অদৃশ্যের সংবাদ জানার দাবি করেন না। তারা তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার আলোকে তথ্য প্রদান করেন। আর সাথে সাথে এটাও বলে দেন যে, 'এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।' এভাবে তাদের অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার পরিধি যত বৃদ্ধি পায়, তাদের তথ্যের সম্ভাবনাও তত বৃদ্ধি পায়।[২১]

১৮. সূরা মায়িদাহ ৫:৩; ফাতাওয়াল ইমারাত, ৩৫।
১৯. সহীহুল বুখারী, ৩২১০, ৫৭৬২
২০. সহীহ মুসলিম, ৫৩৭, ২২৩০
২১. ফাতাওয়াল ইমারাত, ৭৫

প্রশ্ন ১১: কুরআনে বলা হয়েছে, গর্ভে কী আছে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। অথচ আধুনিক যুগে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার পূর্বেই ডাক্তাররা বলে দিতে পারেন, গর্ভে কী আছে-ছেলে না কি মেয়ে। বাহ্যিক এই দ্বৈরথের মাঝে সমন্বয় কী?

জবাব: উভয়ের মাঝে কোনো প্রকার দ্বৈরথ ও দ্বন্দ্ব নেই। কুরআনের আয়াতে যেখানে বলা হয়েছে, 'গর্ভে কী আছে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না' দ্বারা উদ্দেশ্য দুটি:

ক. আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিজ ও সত্তাগত জ্ঞানে জানেন গর্ভে কী আছে। তা জানতে তাঁর কোনো কিছু বা কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। আর ডাক্তাররা নিজেদের ও সত্তাগত জ্ঞানে তা জানেন না; বরং বিভিন্ন উপায়, মাধ্যম ও যন্ত্রের সাহায্যে জানতে চেষ্টা করেন। আর সেসব উপায়, মাধ্যম ও যন্ত্র আল্লাহ্ তাআলা তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং উদ্ভাবন-আবিষ্কারের সুযোগ করে দিয়েছেন। যেমন; বর্তমান যুগে কখন চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হবে তা পূর্বেই বলা দেওয়া যায়। তবে কোনো মাখলূক তা উপায়-উপকরণ ছাড়া বলতে সক্ষম নন। তারা উপায়-উপকরণের মাধ্যমে বলতে পারেন। আর আল্লাহ্ তাআলা সেসব উপায়-উপকরণ তাদের অধীনে করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা এভাবে অদৃশ্যের খবর কোনো-কোনো মাখলূককে অবহিত করার কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন-

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ

আল্লাহ্ অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত। তিনি তা স্বীয় অদৃশ্যের কথা কারো কাছে প্রকাশ করেন না; তবে তাঁর মনোনীত রাসূল বা দূত ব্যতীত।[২২]

আয়াতে স্পষ্টভাবে নিজ ও সত্তাগত জ্ঞানের মাধ্যমে অদৃশ্য জানার মাঝে এবং উপায়-উপকরণের মাধ্যমে জানার মাঝে পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, তিনি তা নিজ ও সত্তাগত জ্ঞানের মাধ্যমে জানেন। আর দূত বা রাসূলের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তিনি অনেক সময় অদৃশ্যের কথা জানতে পারেন; তবে তা নিজ বা সত্তাগত জ্ঞানের মাধ্যমে নয় বরং কোনো উপায়-উপকরণের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে তা অবহিত করেন। অতএব, প্রমাণ হয়, আল্লাহর সৃষ্ট কোনো উপায়-উপকরণের মাধ্যমে অদৃশ্যের কোনো কিছু জানাকে 'অদৃশ্যের-জ্ঞানী' বলা যায় না।

---

২২. সূরা জিন, ৭২:২৬-২৭

খ. 'গর্ভে কী আছে একমাত্র আল্লাহ জানেন' দ্বারা উদ্দেশ্য, গর্ভের থাকা ভ্রূণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সকল বিষয় একমাত্র তিনি জানেন। তা ছেলে হবে না মেয়ে, ভালো হবে না মন্দ, সুস্থ-সবল হবে না অঙ্গহীন ও অপূর্ণাঙ্গ হবে, কতদিন বাঁচবে, কোথায় ইন্তিকাল করবে-এসব ছাড়াও অন্যান্য যাবতীয় বিষয় একমাত্র তিনি জানেন। কোনো মাখলূকের পক্ষে এসব জানা সম্ভব নয়, তার যতই জ্ঞান থাকুক।[২৩]

প্রশ্ন ১২: কেউ কেউ নবী-রাসূলদের কাছে সাহায্য প্রার্থনার পক্ষে মেরাজের হাদীস পেশ করেন। তারা বলেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়। কিন্তু মূসা আলাইহিস সালামের সাহায্য-সহযোগিতায় তা পাঁচ ওয়াক্তে কমিয়ে আনা হয়।' তাদের এ দলিলের জবাব কী?

জবাব: তাদের দলিল গ্রহণের পদ্ধতি ভুল। মৃতব্যক্তি থেকে সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়ার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। মৃতব্যক্তি থেকে সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়া আল্লাহ তাআলা কুরআনে হারাম ঘোষণা করেছেন। তাই তাদের এ দাবি কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক।

মুহাম্মাদ ﷺ ও মূসা আলাইহিস সালামের মাঝে যে আলোচনা হয়েছিল তা গায়েবের বিষয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা যদি আমাদের না জানাতেন তাহলে আমাদের পক্ষে তা জানা কিছুতেই সম্ভব হতো না।

উক্ত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ যে উপকার লাভ করেন, তার সঙ্গে আজকে যারা মূসা আলাইহিস সালামের কাছে সাহায্য চায়, এই মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। এটা উভয়ের মাঝে সরাসরি কথোপকথন। তাই মৃতব্যক্তি বা নবী-রাসূলদের কাছে সাহায্য-সহযোগিতা তলব করার সঙ্গে মেরাজের ঘটনার ন্যূনতম সম্পর্ক নেই।

যারা মূসা বা অন্যান্য রাসূলকে ডাকতে চায়, তারা সর্বপ্রথম প্রমাণ করুক যে, তাঁদেরকে ডাকলে তাঁরা শুনতে পান। এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ, মৃতরা শুনতে পায় না।

এমন দলিলগ্রহণ করা নিশ্চয়ই তাওহীদ থেকে স্পষ্ট বিচ্যুতি। এমন দুর্বল দলিলের দিকে তাকানো কোনো মুসলিমের পক্ষে শোভনীয় হতে পারে না। এটি একটি অতি আশ্চর্যজনক বিষয় যে, আল্লাহ তাআলা যা হারাম ঘোষণা করেছেন, তা বৈধ করার পক্ষে তারা ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মৃতব্যক্তিদের থেকে সাহায্য চাওয়া সরাসরি কুরআনের নির্দেশনা পরিপন্থি

২৩. ফাতাওয়াল ইমারাত, ৭৪

এবং স্পষ্ট শিরক। আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে, তারা নিজেদেরকে মুকাল্লিদ দাবি করেন। আর মুকাল্লিদ কখনো ইজতিহাদ-গবেষণা করার যোগ্যতা ও সক্ষমতা রাখে না। ইজতিহাদ-গবেষণা মুকাল্লিদদের জন্য হারাম। অথচ তারা এমন দলিল থেকে ইজতিহাদ করে মৃতব্যক্তি বা নবী-রাসূলদের কাছে সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়া বৈধ প্রমাণ করছেন, যে ইজতিহাদ আজ পর্যন্ত কোনো মুজতাহিদ বা কোনো মুকাল্লিদ করেননি।[২৪]

প্রশ্ন ১৩: কবরস্থানে গিয়ে 'আস-সালামু আলাইকুম দারা কওমিন মুমিনীন; অর্থাৎ হে কবরের মুসলিম বাসিন্দারা, আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক!' বলা থেকে কি প্রমাণ হয় না, মৃতব্যক্তি শুনতে পায়?

জবাব: মৃতব্যক্তিকে এভাবে সালাম দেওয়া দ্বারা তাদের শুনতে পাওয়া উদ্দেশ্য নয়। আর না এ থেকে তাদের শোনা প্রমাণ হয়। আরবী ভাষায় অনুপস্থিত ব্যক্তিকেও সরাসরি সম্বোধন করার রীতি প্রচলিত। যেমন: সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় তাশাহহুদে 'আস-সালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী অর্থাৎ হে নবী! আপনার ওপর সালাম বর্ষিত হোক' বলতেন। তারা দূর-দূরান্তে অবস্থান করা সত্ত্বেও এভাবে তাশাহহুদে তাঁকে সালাম দিতেন। তার মানে এ নয় যে, তিনি তাদের সকলের সালাম শুনতে পেতেন।[২৫]

প্রশ্ন ১৪: একব্যক্তি মদীনার বাইরে থেকে নবী ﷺ-কে সালাম প্রদান করেন, আরেক ব্যক্তি তাঁর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সালাম প্রদান করেন। উভয়ের মাঝে কি কোনো পার্থক্য আছে?

জবাব: তাদের উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। আহলে বাইতের একব্যক্তির ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি দেখলেন, একব্যক্তি নবী ﷺ-এর কবরের পাশে বসে আছে। তাকে তিনি এভাবে বসে থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি বলল, 'আমি এখানে বসে থেকে তাঁর ওপর দরূদ পাঠ করছি।' তিনি বললেন, 'কোনো মুসল্লীর এখানে বসে দরূদ পাঠ করা আর অন্য আরেকজন মুসল্লীর আন্দালুসে বসে দরূদ পাঠ করার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ে সমান।'[২৬]

২৪. ফাতাওয়াল ইমারাত, ১৮
২৫. ফাতাওয়াল ইমারাত, ৮৪
২৬. ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম, ১/৩০২; মাজমূউল ফাতাওয়া, ২৭/১২২

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা হচ্ছে, যেখান থেকেই তাঁকে দরুদ ও সালাম দেওয়া হোক, তাঁর কাছে তা পৌঁছে দেওয়া হয়। তিনি বলেন,

إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ

জমিনে আল্লাহর একদল প্রদক্ষিণরত ফেরেশতা আছেন। তারা আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌঁছে দেন।[২৭]

অন্য আরেকটি হাদীস রয়েছে,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا أَبْلَغْتُهُ

যে-ব্যক্তি আমার কবরের পাশে থেকে আমার ওপর দরুদ পাঠ করে, আমি তার দরুদ শুনি। আর যে-ব্যক্তি দূর থেকে আমার ওপর দরুদ পাঠ করে, আমার কাছে তার দরুদ পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়।[২৮]

এ হাদীসটি প্রমাণিত নয়। এটি একটি বাতিল হাদীস।[২৯]

প্রশ্ন ১৫: হাদীসে কবর যিয়ারতের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত আর সাধারণ মুসলিমের কবর যিয়ারতের মাঝে কি কোনো পার্থক্য আছে? না কি নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের আলাদা মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে?

জবাব: নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের আলাদা মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তাঁর কবর যিয়ারত তেমন শরীআতসিদ্ধ, যেমন অন্যান্য মুসলিমের কবর যিয়ারত শরীআতসিদ্ধ।

তবে মনে রাখতে হবে, নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারত সবার ঐকমত্যে শরীআতসিদ্ধ হলেও, নিছক তাঁর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না। কাজেই অন্যান্য নবী বা ওলি-আউলিয়াদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার বৈধতার কোনো প্রশ্নই আসে না।

---

২৭. সুনানুন নাসায়ী, ১২৮৫, হাদীসটিকে আলবানী সহীহ বলেছেন।

২৮. আয-যুআফা লিল-উকাইলী, ৪/১৩৭; ইমাম উকাইলী বলেন, 'এ হাদীসের কোনো ভিত্তি নেই। এটি মাহফূয-সংরক্ষিত হাদীস নয়। এর আরেকটি সমর্থক সনদ রয়েছে। তবে সে সনদের বর্ণনাকারী আরও দুর্বল।' সে বর্ণনাকারী হলেন সুদ্দী। জারীর ইবন হাযিম তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। সালিহ বলেন, সে হাদীস বানাতো। বিস্তারিত জানতে দেখুন, হাদমুল মানারাহ, ৩১১-৩১৬।—সংকলক

২৯. ফাতাওয়াল ইমারাত, ৫৯

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لاَ تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، مَسْجِدِ الأَقْصَى ، وَمَسْجِدِي هَذَا.

মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং আমার মসজিদ-এই তিন মসজিদ ছাড়া তোমরা সফর করো না।[৩০]

অতএব, শরীআতসম্মত পদ্ধতিতে তাঁর কবর যিয়ারত করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির উচিত, মসজিদে নববিতে সালাত আদায়ের সওয়াব অর্জনের নিয়তে সফর করা; নিছক তাঁর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে নয়। তিনি ﷺ বলেন,

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

আমার এই মসজিদে সালাত আদায় করা, মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাজার সালাত থেকে উত্তম।[৩১]

প্রশ্ন ১৬: কবরের কাছে কি কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে?

জবাব: কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করার বৈধতার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। তবে হাদীস থেকে প্রমাণ হয়, কবর যিয়ারতের সময় কবরবাসীকে সালাম দেওয়া এবং তাকে কেন্দ্র করে আখিরাতকে স্মরণ করা বৈধ।[৩২] এটাই ছিল সালাফদের কর্মপন্থা। অতএব, কবরের পাশে কুরআন তিলাওয়াত করা ঘৃণিত বিদআত। পূর্ববর্তী অনেক ইমাম ও আলেম একে বিদআত বলেছেন, যেমন; ইমাম আবু হানীফাহ, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ।[৩৩] ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল বলেন, এর পক্ষে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বালের দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, তা মাকরূহ নয়; কেননা ইবন উমার দাফনের সময় তার কবরের পাশে সূরা বাকারার শুরু ও শেষাংশ তিলাওয়াত করার অসিয়ত করেন।

কিন্তু ইবন উমার থেকে এ অসিয়ত বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত নয়। যদি সহীহও গণ্য করা হয়, তাহলে সর্বোচ্চ শুধু দাফনের সময় তিলাওয়াত করার বৈধতা প্রমাণ হয়, সবসময় নয়।

৩০. সহীহুল বুখারী, ১১৮৯; সহীহ মুসলিম, ৩১৫২
৩১. সহীহুল বুখারী, ১১৯০; সহীহ মুসলিম, ৩২৬৫; ফাতাওয়াল ইমারাত, ৬০
৩২. সুনানু আবী দাউদ, ৩২৩৪
৩৩. যাবীদী, শারহুল ইহইয়া, ২/২৮৫

অতএব, প্রত্যেক মুসলিম সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং বিদআত পরিহার করবে; যদিও সে বিদআত লোকেরা ভালো মনে করে। কেননা, প্রত্যেক বিদআত ভ্রষ্টতা।[৩৪]

প্রশ্ন ১৭: মহিলারা কি কবর যিয়ারত করতে পারবে?

জবাব: আমার মতে, পুরুষ-মহিলা উভয়ে কবর যিয়ারত করতে পারে। কবর যিয়ারত করার ব্যাপারে পুরুষদের ক্ষেত্রে যেসব শর্ত রয়েছে, মহিলাদের ক্ষেত্রেও সেসব শর্ত প্রযোজ্য। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ কবর যিয়ারতকে দুইভাগে ভাগ করেছেন:

ক. শরীআতসম্মত যিয়ারত, খ. বিদআতী যিয়ারত।

ক. কবরবাসীকে সালাম দেওয়া এবং তার মাধ্যমে পরকালকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা শরীআতসম্মত।

খ. কবরকে সম্মান করা, সেখানে কুরআন তিলাওয়াত করা এবং কবরকেন্দ্রিক আড্ডা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা বিদআত।

শরীআতসম্মত যিয়ারত নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য বৈধ। আর বিদআতী যিয়ারত নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য অবৈধ।

ইসলামের প্রথম যুগে কবর যিয়ারত নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে তাদের অন্তরে তাওহীদ শক্তভাবে গেঁথে গেলে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করা হয়। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য নিষিদ্ধতার পরে উভয়ের জন্য অনুমতি প্রদানের বিষয়টি সহীহ মুসলিমের এক হাদীস থেকে প্রমাণ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বলেন,

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُور

'আমি তোমাদেরকে করব যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম।'[৩৫]

এখানে তিনি নির্দিষ্টভাবে পুরুষকে উদ্দেশ্য করে বলেননি; বরং উভয়কে উদ্দেশ্যে করে বলেছেন, আমি তোমাদের সবাই নিষেধ করেছিলাম। এরপর তিনি অনুমতি দিয়ে বলেন, فَزُورُوهَا 'তোমরা এখন যিয়ারত করো।' এখানেও তিনি নির্দিষ্টভাবে শুধু পুরুষদের অনুমতি

৩৪. সিলসিলাতুয যঈফাহ, ৫০ নং হাদীসের অধীনে
৩৫. সহীহ মুসলিম, ৯৭৭

দেননি; বরং পূর্বে যাদেরকে নিষেধ করেছিলেন তাদের উভয়কে এখানে অনুমতি প্রদান করেছেন। অনুমতি প্রদানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও প্রমাণ করে, কবর যিয়ারত নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শরীআতসিদ্ধ। যিয়ারত করার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে এরপর তিনি বলেন, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ। কারণ, তা আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।' শরীআতসম্মত উপায়ে আখিরাতকে স্মরণ করা যেমন পুরুষদের প্রয়োজন, নারীদেরও তেমন প্রয়োজন।

যারা নারীদের জন্য কবর যিয়ারত হারাম বলেন, তাদের দলিল হচ্ছে, لَعَنَ اللّٰهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ আল্লাহ কবর যিয়ারতকারিণীদের অভিসম্পাত করেছেন।'[৩৬] এই হাদীস আরেক শব্দে বর্ণিত হয়েছে। তা হলো, لَعَنَ اللّٰهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ 'আল্লাহ বেশি বেশি যিয়ারতকারীদের অভিসম্পাত করেছেন।'[৩৭] 'যিয়ারতকারিণী' শব্দে বর্ণিত হাদীসটি যঈফ। 'বেশি বেশি যিয়ারতকারীদের' শব্দে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ। অতএব, প্রমাণিত হয়, নারীদের যিয়ারত অবৈধ হওয়া সংক্রান্ত গ্রহণযোগ্য কোনো হাদীস নেই। কাজেই নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য কবর যিয়ারত করা বৈধ।

প্রশ্ন ১৭: মালাকুল মওত-মৃত্যুর ফেরেশতার কি অন্য আর কোনো নাম রয়েছে?

জবাব: কুরআনে মৃত্যুর ফেরেশতার নাম 'মালাকুল মওত' বলা হয়েছে। তার আরেকটি প্রচলিত নাম 'আজরাইল'। তবে এ নামের স্বপক্ষে কোনো শরয়ী ভিত্তি নেই। এটি একটি ইসরাঈলী বর্ণনা।[৩৮]

প্রশ্ন ১৯: শাফাআতের হাদীসে বলা হয়েছে, 'সূর্য অতি নিকটে চলে আসবে। এমনকী ঘাম অর্ধেক কান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। সেসময় তারা আদমের সাহায্য চাইবে। আদম বলবেন, আমি তার যোগ্য নই। এরপর মূসার...।' এ হাদীস থেকে কি প্রমাণ হয় না, মৃতব্যক্তির নিকট সাহায্য চাওয়া বৈধ?

জবাব: 'আদমের সাহায্য চাইবেন' দ্বারা উদ্দেশ্য, কিয়ামতের দিন বিচারের অপেক্ষমান মানুষেরা তার কাছে আবেদন করবে, আপনি আমাদের জন্য দুআ করুন এবং আল্লাহর কাছে শাফাআত করুন। এ ব্যাপারে বুখারী-মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৩৯] বিদআতীরা এ হাদীস দ্বারা মৃতব্যক্তির কাছে সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়ার বৈধতা প্রমাণ করতে চায়। অথচ এ হাদীস দ্বারা তা প্রমাণ হয় না। বরং এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয়, জীবিত ব্যক্তি

৩৬. সুনানুত তিরমিযী, ৩২০; সুনানুন নাসায়ী, ২০৪৭
৩৭. সুনানুত তিরমিযী, ১০৫৬; সুনানু ইবন মাজাহ, ১৫৭৪
৩৮. আত-তা'লীক আলা শারহিল আকীদাতিত তহাবিয়্যাহ, পৃ. ৭২
৩৯. সহীহুল বুখারী, ৪৭১২; সহীহ মুসলিম, ১৯৪, ১৯৫

যে-কাজের ক্ষমতা রাখে, তার থেকে সে কাজে সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়া বৈধ। কেননা, তখন আদম আলাইহিস সালাম জীবিত থাকবেন। আর জীবিত ব্যক্তির কাছে এ ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়া কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন,

فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ

তার কাছে তার দলের লোকটি শত্রুপক্ষের লোকটির বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলো।[৪০]

এটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, জীবিত ব্যক্তি কোনো কাজে অক্ষম হলে আমরা তার কাছে সাহায্য চাওয়া বৈধ মনে করি না। তাহলে একজন মৃতব্যক্তির কাছে কীভাবে সাহায্য চাওয়া বৈধ হতে পারে; অথচ সে জীবিত ব্যক্তির চেয়েও বেশি অক্ষম ও নিরুপায়। যে মৃতব্যক্তির কাছে সাহায্য চায়, সে হয় চরম আহাম্মক ও নির্বোধ অথবা ঘৃণিত মুশরিক। কেননা, তার বিশ্বাস মৃতব্যক্তি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ও সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। মৃতব্যক্তিদের ব্যাপারে এমন বিশ্বাস বড়ো শিরক। যারা আল্লাহ ব্যতীত মৃতব্যক্তির কাছে সাহায্য চায়, তাদের ক্ষেত্রে বড়ো শিরকের প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٩٤) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ.

আল্লাহ ব্যতীত যাদের তোমরা ডাকো, তারা তো তোমাদের মতোই বান্দা। অতএব, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে তাদেরকে উপাস্য হিসেবে ডাকতে থাকো, দেখো তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় কি না? তাদের কি পা আছে যা দিয়ে হাঁটতে পারে? তাদের কি হাত আছে যা দিয়ে ধরতে পারে? তাদের কি চোখ আছে যা দিয়ে শুনতে পারে? বলুন, তোমরা তোমাদের শরীকদের ডাকো, তারপর সবাই মিলে আমরা বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো, আমাকে কোনো অবকাশ দিয়ো না।[৪১]

তিনি আরও বলেন,

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ.

৪০. সূরা কাসাস, ২৮:১৫

৪১. সূরা আল-আরাফ, ৭:১৯৪-১৯৫

তোমরা তাদের ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শোনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শরীক করাকে অস্বীকার করবে। আর মহাবিজ্ঞ আল্লাহর ন্যায় কেউ তোমাকে অবহিত করবে না।[৪২]

প্রশ্ন ২০: আমরা কীভাবে পরিপূর্ণভাবে শিরক মুক্ত হতে পারব?

জবাব: তিন প্রকার শিরক থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে শিরক থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত থাকা সম্ভব।

প্রথম প্রকার: তাওহীদুর রুবুবিয়্যায় শিরক থেকে। তাওহীদুর রুবুবিয়্যায় শিরক হচ্ছে, সৃষ্টির কাজে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। যেমন; অগ্নিপূজকরা বিশ্বাস করে, খারাপ ও ক্ষতিকর জিনিসের স্রষ্টা আল্লাহ নন, অন্য কেউ। আলহামদুলিল্লাহ, মুসলিম উম্মাহর মাঝে এমন বিশ্বাসী লোক খুব কম। তবে মুতাযিলারা অগ্নিপূজকদের কাছাকাছি। তারা বিশ্বাস করে, খারাপ ও ক্ষতিকর জিনিস মানুষের সৃষ্টি। অগ্নিপূজকদের সাথে মুতাযিলাদের এই মিলের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ

কাদারিয়া সম্প্রদায় এই উম্মাতের অগ্নিপূজক।[৪৩]

'সহীহুল জামিইস সগীর ওয়া যিয়াদাতিহ'[৪৪] গ্রন্থে এ হাদীস নিয়ে আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় প্রকার: তাওহীদুল উলূহিয়ায় শিরক থেকে। তাওহীদুল উলূহিয়্যায় শিরক হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো নবী ও সৎ বান্দার ইবাদত করা, যেমন; বিপদাপদে তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া, তাদেরকে ডাকা। পরিতাপের বিষয়, এ প্রকার শিরক মুসলিমদের মাঝে সবচেয়ে বেশি। এর জন্য দায়ী কিছু পীর-মাশাইখ। তারা 'অসিলার' নাম দিয়ে এ প্রকার শিরক প্রচার-প্রসার করছে। মূলত তারা শিরকের নামকে অসিলার নামে পালটে ফেলে মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে।

তৃতীয় প্রকার: তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতে শিরক থেকে। তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতে শিরক হচ্ছে, আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা অথবা তার মাঝে সে-গুণ ও বৈশিষ্ট্য আছে বলে দাবি করা। যেমন; কারো ক্ষেত্রে গায়েব জানার দাবি করা। এ প্রকার শিরক সূফীদের মাঝে সবচেয়ে বেশি বিদ্যমান।

---

৪২. সূরা ফাতির, ৩৫:১৪; সিলসিলাতুস সহীহাহ, ২৪৬০ নং হাদীসের অধীনে

৪৩. সুনানু আবী দাউদ, ৪৬৯১

৪৪. সহীহুল জামি, ৭৮৯২

যে-ব্যক্তি এ তিন প্রকার শিরক থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হবে; আল্লাহর সত্তা, তাঁর ইবাদত ও তাঁর গুণাবলিতে তাওহীদের ঘোষণা দেবে-সে তাওহীদপন্থি। নির্ভেজাল তাওহীদপন্থিদের জন্য যেসব মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও নেয়ামত রয়েছে, সে তার অধিকারী হবে। আর কেউ যদি তিন প্রকার শিরকের কোনো এক প্রকারে জড়িয়ে যায়, তার ক্ষেত্রে আল্লাহর এ আয়াত প্রযোজ্য হবে-

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ .

যদি তুমি শিরক করো, তবে তোমার আমল বাতিল হয়ে যাবে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।[৪৫]

তাই এ বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে স্মরণে রাখতে হবে। এগুলো আকীদাহর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।[৪৬]

প্রশ্ন ২১: 'আল্লাহর ও তোমার ইচ্ছা', 'আল্লাহ ও তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই', 'আল্লাহর ও তোমার ওপর ভরসা করে আছি', 'আল্লাহর ও দেশের নামে', 'আল্লাহ ও জাতীয়তার নামে'-যারা এসব বাক্য বলে তাদের হুকুম কী?

জবাব: 'আল্লাহর ও তোমার ইচ্ছা' বলা শিরক। এটি একটি শিরকী বাক্য। দুই ইচ্ছাকে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়ার মাধ্যমে বান্দার ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার সমপর্যায়ে উন্নীত করা হয়। সাধারণ মানুষদেরকে এমনকী নামধারী জ্ঞানীদেরকেও বলতে শোনা যায়, 'আল্লাহ ও তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই', 'আল্লাহর ও তোমার ওপর ভরসা করে আছি'। আবার অনেক উপস্থাপক 'আল্লাহর ও দেশের নামে', 'আল্লাহ ও জাতীয়তার নামে' বলে উপস্থাপনা শুরু করে। এগুলো সব শিরকী বাক্য। এসব বাক্য বলা থেকে দূরে থাকতে হবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।[৪৭]

প্রশ্ন ২২: নবী ﷺ-এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে আইয়ামে জাহিলিয়াতে যারা ইন্তিকাল করেছে, তারা কি তাদের শিরক ও কুফরের কারণে শাস্তি পাবে?

জবাব: নবী ﷺ-এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে আইয়ামে জাহিলিয়াতে যারা ইন্তিকাল করেছে, তারা তাদের শিরক ও কুফরের কারণে শাস্তি পাবে। তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যাদের কাছে কোনো নবীর দাওয়াত পৌঁছেনি। অথচ পরবর্তী যুগের কেউ কেউ মনে করেন, 'তারা শাস্তি

৪৫. সূরা যুমার, ৩৯:৬৫

৪৬. আত-তা'লীক আলা শারহিল আকীদাতিত তহাবিয়্যাহ, পৃ. ৩১

৪৭. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ১৩৯ নং হাদীসের অধীনে

পাবে না; বরং তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদের কাছে কোনো নবীর দাওয়াত পৌঁছেনি। আর যারা কোনো নবীর দাওয়াত পাননি, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا.

আমরা রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত (কাউকে) শাস্তি দেই না।[৪৮]

'এক ব্যক্তি প্রশ্ন করে, হে আল্লাহর রাসূল, আমার বাবা কোথায়? তিনি বলেন, তোমার বাবা জাহান্নামে...।'[৪৯] —এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলেন, এ হাদীস প্রমাণ করে, যে-ব্যক্তি কুফরী অবস্থায় মারা গেছে, সে জাহান্নামী। সে ব্যক্তি কোনো ভালো ও সৎ মানুষের আত্মীয় হলেও পরকালে নাজাত পাবে না। আরও প্রমাণ হয়, নবী ﷺ-এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে আইয়ামে জাহিলিয়াতে আরবদের মাঝে প্রচলিত মূর্তিপূজার ধর্মের ওপর যারা ইন্তিকাল করেছে, তারা জাহান্নামী। তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যাদের কাছে কোনো নবীর দাওয়াত পৌঁছেনি। কেননা, তাদের কাছে ইবরাহীমসহ অন্যান্য নবীর দাওয়াত পৌঁছেছিল।[৫০]

প্রশ্ন ২৩: কোনো কাফির যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে পূর্বের ভালো আমল কি তার আমলনামায় যুক্ত হবে?

জবাব: কোনো কাফির যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে কুফরী অবস্থায় সে যেসব ভালো কাজ করেছে, তা তার আমলনামায় যুক্ত হবে। কিয়ামতের দিন সেসব ভালো কাজের প্রতিদানও পাবে। সেসব ভালো কাজ কুফরী অবস্থায় করেছে বলে তা বাতিল করা হবে না। এর স্বপক্ষে অনেক হাদীস পাওয়া যায়। যেমন; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا وَمُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا

বান্দা উত্তমরূপে ইসলাম গ্রহণ করলে, আল্লাহ তার বিগত ভালো কাজকে আমলনামায় লিখে দেন আর খারাপ কাজকে মুছে দেন।[৫১]

---

৪৮. সূরা বনী ইসরাইল, ১৭:১৫

৪৯. সহীহ মুসলিম, ৩৮৮

৫০. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ১৫৯ নং হাদীসের অধীনে

৫১. সুনানুন নাসায়ী, ৪৯৯৭; সিলসিলাতুস সহীহাহ, ৫৩ নং হাদীসের অধীনে

প্রশ্ন ২৪: আহলে কিতাবদের কি মুশরিক বলা যাবে?

জবাব: আহলে কিতাবদেরকেও মুশরিক বলা যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

মুশরিকদের আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করে দিয়ো।[৫২]

এই হাদীসে মুশরিক দ্বারা আহলে কিতাবদের বোঝানো হয়েছে। অতএব, প্রমাণ হয়, তাদেরকে মুশরিক বলা যাবে।[৫৩]

প্রশ্ন ২৫: অনেক সময় শয়তানের কুমন্ত্রণাবশত মনে প্রশ্ন জাগে, 'আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন?' এ কুমন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

জবাব: সহীহ হাদীসে শয়তানের এ ওয়াসওয়াসা থেকে পরিত্রাণ ও উত্তরণের পথ দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে-সময় একজন মুসলিমের করণীয় কী, তাও অবহিত করা হয়েছে। তাই ভিন্ন কোনো উপায় ও পদ্ধতিতে শয়তানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক না করে হাদীস নির্দেশিত পন্থা অবলম্বন করে তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। প্রথমে বলতে হবে:

آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ. اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

'আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের ওপর ঈমান এনেছি। আল্লাহ এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকে জন্ম দেওয়া হয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।'

এরপর বামদিকে তিনবার থুথু ফেলতে হবে এবং আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে পরিত্রাণ ও পানাহ চাইতে হবে। তারপর ওয়াসওয়াস ও কুমন্ত্রণা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি, কেউ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শিক্ষা ও নির্দেশিত পন্থার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে বিশুদ্ধ অন্তরে এ পদ্ধতি গ্রহণ করে, তাহলে সে শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে পারবে। শয়তান ও শয়তানের চক্রান্ত তার কাছে পর্যুদস্ত হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

'যে এ পদ্ধতি গ্রহণ করবে, তার থেকে কুমন্ত্রণা বিদায় নেবে।'[৫৪]

---

৫২. সহীহুল বুখারী, ৩০৫৩; সহীহ মুসলিম, ৪১২৪

৫৩. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ১১৩৩ নং হাদীসের অধীনে

৫৪. মুসনাদ আহমাদ, ২৬২০৩; সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১৬১০, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

তর্কবিতর্ক, বিজ্ঞানের দোহাই, বিবেকপ্রসূত জবাবসহ অন্যান্য পদ্ধতি থেকে এ পদ্ধতি সর্বাধিক ফলপ্রসূ, উপকারী ও কার্যকরী। অন্য যে-কোনো উপায়ে সেই কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়; বরং আরও বিভিন্ন ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা ভিড় জমায়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, অধুনা অধিকাংশ মানুষ রাসূল-নির্দেশিত এ শিক্ষা ও পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। তারা এ ফলপ্রসূ, উপকারী, কার্যকরী উপায়ের ব্যাপারে অসচেতন ও অজ্ঞ। কাজেই মুসলিমদের প্রতি আমার আহ্বান, আপনারা আপনাদের নবীর সুন্নাত ভালোভাবে জানুন ও রপ্ত করুন। সে দিকে ফিরে আসুন। তা জীবনে বাস্তবায়ন করুন। তাতেই রয়েছে আপনাদের সকল সংশয়-সন্দেহ, ওয়াসওয়াস ও কুমন্ত্রণার প্রতিষেধক।[৫৫]

প্রশ্ন ২৬: ভালো নিয়তে খারাপ কাজ করলে কি কোনো লাভ আছে?

জবাব: ভালো নিয়তের কারণে খারাপ কাজ ভালো কাজে পরিণত হয় না। 'প্রত্যেক আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল' হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'প্রত্যেক ভালো আমল বিশুদ্ধ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।' শরীআত পরিপন্থি আমল ও কাজ ভালো নিয়তের কারণে কোনোভাবেই ভালো ও শরীআতসম্মত আমল ও কাজে রূপান্তরিত হতে পাবে না। এ ধরনের কথা একমাত্র জাহিল ও স্বার্থান্বেষী লোকদের মুখ থেকে বের হতে পারে। ভালোভাবে জেনে রাখুন, কোনো ব্যক্তি যদি কবরকে সামনে রেখে সালাতও আদায় করে, তবুও তা জঘন্য আমল বলে গণ্য হবে। কেননা, অনেক হাদীসে কবরকে সামনে রেখে সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে।[৫৬] এমন নিষেধাজ্ঞার পরও কোনো বিবেকবান ব্যক্তি কি বলতে পাবে, 'সে তো খারাপ নিয়তে কবরকে সামনে রেখে সালাত আদায় করেনি। অতএব, তার আমল শরীআত সম্মত!?' তার ভালো নিয়তের কারণে কক্ষনোই তার সালাত শরীআতসম্মত হতে পারে না। অনুরূপভাবে বিপদাপদের সময় যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে গাইরুল্লাহর দ্বারস্থ হয়, গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য-সহযোগিতা তলব করে, তাদের নিয়ত কখনোই ভালো হতে পারে না। তাই তাদের কাজ ভালো হওয়ার প্রশ্নই আসে না। তারা জেনেবুঝে এমন ঘৃণিত ও নোংরা কাজে জড়িত থাকে।[৫৭]

প্রশ্ন ২৭: নজর বা মানত মানার বিধান কী?

জবাব: হাদীসে বলা হয়েছে,

৫৫. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ১১৮ নং হাদীসের অধীনে
৫৬. সহীহ মুসলিম, ৫২৯; ৫৩০; সুনানু আবী দাউদ, ১০৫০
৫৭. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ১৩৯ নং হাদীসের অধীনে

لَا يَأْتِي النَّذْرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ بِشَيْءٍ لَمْ أُقَدِّرْهُ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مَا لَا يُؤْتِينِي عَلَى الْبُخْلِ

নজর আদম সন্তানের এমন কিছু করতে পারে না, যা আমি তার ভাগ্যে নির্ধারণ করিনি। তবে এর মাধ্যমে আমি কৃপণদের থেকে কিছু বের করে নিই। এ কারণে আমার উদ্দেশ্যে দান করে, যা সে কৃপণ অবস্থায় দান করত না।[৫৮]

এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয়, নজর শরীআতসম্মত নয়; মাকরূহ। হাদীসের বাহ্যিকতা থেকে হারাম প্রমাণিত হয়। এ কারণে একদল আলেম তা হারাম বলেছেন। 'তবে এর মাধ্যমে আমি কৃপণদের থেকে কিছু বের করে নিই।'-হাদীসের এ অংশ থেকে বোঝা যায়, যে নজর শর্তাধীন অর্থাৎ বলা হয়, অমুক হলে বা অমুক পেলে বা অমুক রোগ ভালো হলে অমুক জিনিস নজর করলাম-এমন নজর মাকরূহ বা হারাম। শর্তহীনভাবে কোনো ভালো কাজ করার নজর করা বা দান-সাদকার নিয়ত করা, যেমন বলা, আমি সিয়াম পালনের নজর করলাম বা অমুক জিনিস দান করার নজর করলাম-এমন নজর হারাম বা মাকরূহ নয়; বরং আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের মাধ্যম। এ ধরনের নজর ভালো উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। এ ধরনের নজর পূর্ণ করলে সুন্নাত নয় বরং ওয়াজিব পালনের সওয়াব পাওয়া যাবে। يُوفُونَ بِالنَّذْرِ 'তারা নজর পূর্ণ করে'[৫৯] আয়াত দ্বারা এ ধরনের নজর উদ্দেশ্য; প্রথম প্রকারের শর্তাধীন নজর উদ্দেশ্য নয়।

হাফিয ইবন হাজার আসকালানী ফাতহুল বারীতে বলেন, يُوفُونَ بِالنَّذْرِ 'তারা নজর পূর্ণ করে'[৬০] আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী কাতাদাহ থেকে সহীহ সনদে উল্লেখ করেছেন, কাতাদাহ বলেন, তারা সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ ও উমরার মতো আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজের নজর করে। তা ছাড়া তারা তাদের ওপর ফরজ বিধানেরও নজর করে। এ কারণে আল্লাহ তাদেরকে পুণ্যবান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ আয়াত থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ হয়, শর্তাধীন নজর ছাড়া অন্য নজর প্রশংসনীয়।

ইবন হাজার আসকালানী আরও বলেন, "কুরতবী 'আল-মুফহিম' গ্রন্থে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে উল্লেখ করেছেন যে, "নজর বা মানত মানা নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীসসমূহ শর্তাধীন নজরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিনি বলেন, এই নিষেধাজ্ঞা মূলত সেসব নজরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন; কেউ বলে, 'আল্লাহ যদি আমাকে সুস্থ করেন তবে আমি অমুক বস্তু সাদকাহ করব।' এ ধরনের

৫৮. সহীহুল বুখারী, ৬৬০৯
৫৯. সূরা ইনসান, ৭৬:৭
৬০. সূরা ইনসান, ৭৬:৭

নজর মাকরূহ হওয়ার কারণ হচ্ছে, তাতে খালিসভাবে আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের নিয়ত থাকে না; বরং যে শর্তে নজর করেছে তা প্রাপ্তি ও অর্জনের নিয়ত থাকে। যেন সে আল্লাহর সঙ্গে বিনিময় করতে চাচ্ছে যে, আল্লাহ যদি সুস্থ না করেন, তবে সাদকাহ করব না। এটা মূলত কৃপণ লোকদের স্বভাব। তারা তখনই খরচ করে, যখন খরচের চেয়ে লাভের পরিমাণ বেশি হয়। হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ কৃপণ লোকদের এ স্বভাব তুলে ধরতে চেয়েছেন। এ ধরনের নজর মাকরূহ হওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে, তার মনে ঘৃণিত বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে পড়ে যে, নজর তার উদ্দেশ্য সাধন করে বা নজরের কারণেই আল্লাহ তার উদ্দেশ্য পূরণ করেন। এ দিকে ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নজর আল্লাহর তাকদীর পরিবর্তন করতে পারে না। প্রথম বিনিময়-অবস্থা কুফরী আর দ্বিতীয় দশা ঘৃণিত বিশ্বাস, যা স্পষ্ট ভুল। আমার মতে, যাদের মাঝে এমন বিশ্বাস ও আকীদাহ বদ্ধমূল রয়েছে, তাদের জন্য এধরনের নজর হারাম। আর যাদের মাঝে এমন বিশ্বাস ও আকীদাহ বদ্ধমূল নেই, তাদের জন্য এধরনের নজর মাকরূহ।" এটি একটি চমৎকার সিদ্ধান্ত ও মত। শর্তাধীন নজর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী ইবন উমারের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা এ সিদ্ধান্তকে বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী করে।"

ইবন হাজার আসকালানী যে ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন সে ঘটনাটি হলো, বনী কাব গোত্রের মাসউদ ইবন আমর নামক এক ব্যক্তি ইবন উমারকে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আবু আবদুর রহমান! পারস্যে উমার ইবন উবাইদুল্লাহর কাছে আমার এক ছেলে থাকত। আর এদিকে বসরায় ভয়াবহ আকারে মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। আমি মহামারির কথা জানতে পারলে 'নজর' করে বসি যে, আল্লাহ যদি আমার সন্তানকে আমার কোলে ফিরিয়ে দেন, তবে কাবায় হেঁটে যাব। পরে আমার ছেলে অসুস্থ অবস্থায় ফিরে আসে এবং মারা যায়। আমি কি নজর পূর্ণ করব? ইবন উমার ﷺ বলেন, নজর থেকে আপনাদের কি নিষেধ করা হয়নি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> 'নজর কোনো জিনিসকে ত্বরান্বিত করতে পারে না বা বিলম্বিতও করতে পারে না। তা শুধু কৃপণদের থেকে কিছু বের করে আনে।'

মোটকথা: হাদীসে শর্তাধীন নজর থেকে মুসলিমদের অনুৎসাহিত করা হয়েছে এবং তা থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। সবার উচিত এ ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা রাখা। অন্যথা ভালো কাজ ও সৎ আমল মনে করে এই নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে পড়বে।[৬১]

---

৬১. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ৪৭৮ নং হাদীসের অধীনে

প্রশ্ন ২৮: নজর পূর্ণ করার বিধান কী?

জবাব: আল্লাহর আনুগত্যমূলক নজর করে থাকলে, পূর্ণ করা ওয়াজিব। পূর্ণ করাটাই কাফফারা। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللّٰهَ فَلاَ يَعْصِهِ

> যে-ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের নজর করে সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করে। আর যে আল্লাহর নাফরমানির নজর করে সে যেন তাঁর নাফরমানি না করে।[৬২]

আল্লাহর নাফরমানি ও অবাধ্যতামূলক এবং শয়তানের আনুগত্যমূলক নজর পূর্ণ করা জায়েয নয়। এধরনের নজর পূর্ণ না করে শপথ ভঙ্গের কাফফারা আদায় করতে হবে। আর মাকরূহ বা মুবাহ কাজে নজরের কাফফারা আদায় করা আরও যুক্তিযুক্ত ও উত্তম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যাপকভাবে বলেছেন, كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ নজরের কাফফারা শপথের কাফফারার মতোই।[৬৩]

আল্লাহর আনুগত্যমূলক এবং মাকরূহ ও মুবাহমূলক নজরের কাফফারা আদায় করার ব্যাপারে সবাই একমত। তবে আল্লাহর নাফরমানিমূলক নজরের কাফফারার আবশ্যকতা নিয়ে আলেমদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে রয়েছেন ইমাম আহমাদ ও ইসহাক, যেমনটি ইমাম তিরমিযী উল্লেখ করেছেন।[৬৪] হানাফী মাযহাব মতেও কাফফারা ওয়াজিব। আর এটাই সঠিক মত।[৬৫]

প্রশ্ন ২৯: অনেক দাঈকে দেখা যায়, তারা আকীদাহর দাওয়াত দেন না। আকীদাহর বিষয়কে এড়িয়ে যান। এ ব্যাপারে আপনার নসীহত কী?

জবাব: মুসলিমদের ঐক্যের মূল কেন্দ্র হচ্ছে আকীদাহ। তাদের মাঝে যদি আকীদায় বিভাজন ও অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়, তবে অন্যান্য বিষয়ে আরও ভয়াবহ বিভাজন ও অনৈক্য প্রকটভাবে সম্ভাব্য। আকীদাহগত বিভাজন ও বিরোধ সবচেয়ে ভয়ানক ও ক্ষতিকর। শাখাগত ফিকহী মাসআলায় মতপার্থক্য ও বিরোধ তেমন ক্ষতিকর নয়, যদি সবার উদ্দেশ্য হয় হকের অনুসরণ করা। দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, অধুনা দুনিয়ার অধিকাংশ দাঈ সঠিক আকীদাহর দাওয়াত দেওয়া

৬২. সহীহুল বুখারী, ৬৬৯৬
৬৩. সহীহ মুসলিম, ৪১৪৫; সুনানু আবী দাউদ, ৩৩২৩
৬৪. তিরমিযী, ১৫২৫ নং হাদীসের আলোচনা দ্রষ্টব্য
৬৫. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ৪৭৯ নং হাদীসের অধীনে

থেকে উদাসীন। তারা মানুষদের সঠিক ও বিশুদ্ধ আকীদাহর দাওয়াত দেন না। এটা দাঈ ও আলেমদের দুর্বলতা ও উদাসীনতা। এই দুর্বলতা ও উদাসীনতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং আকীদাহর দাওয়াতের ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দিতে হবে।[৬৬]

প্রশ্ন ৩০: খারাপ ও পাপিষ্ঠ মুসলিমের পেছনে কি সালাত শুদ্ধ হবে?

জবাব: খারাপ ও পাপিষ্ঠ মুসলিমের পেছনে কেউ সালাত আদায় করলে, তার সালাত শুদ্ধ হবে। তার সালাত বাতিল হবে না। সাহাবীগণ খারাপ ও পাপিষ্ঠ মুসলিমের পেছনে সালাত আদায় করতেন। তাদের আমলই দলিল হিসেবে যথেষ্ট। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

তারা তোমাদের ইমামতি করবে। তারা যদি সঠিক করে, তবে তোমরা সওয়াব পাবে। আর যদি ভুল করে, তবুও তোমরা সওয়াব পাবে কিন্তু তারা তাদের গুনাহর ভার বহন করবে।[৬৭]

পাপিষ্ঠ ও খারাপ ব্যক্তির পেছনে সালাত শুদ্ধ না হওয়ার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।

اجْعَلُوا أَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ

'তোমরা তোমাদের উত্তম ব্যক্তিদের ইমাম হিসেবে নির্ধারণ করো' হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। সিলসিলাতুয যঈফাহ গ্রন্থে[৬৮] এ হাদীস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। হাদীসটি সহীহ হলেও সর্বোচ্চ প্রমাণ হয়, উত্তম ও ভালো ব্যক্তিদের ইমাম হিসেবে নির্ধারণ করা ওয়াজিব; তা থেকে সালাত বাতিল প্রমাণ হয় না। কেননা উত্তম ও ভালো ব্যক্তিকে ইমাম হিসেবে নির্ধারণ করা এক বিষয় আর পাপিষ্ঠ ও খারাপ ব্যক্তিদের পেছনে সালাত বাতিল হওয়া ভিন্ন বিষয়; বিশেষ করে তিনি যদি সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ইমাম হন। أَلَا وَلَا يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا. 'সাবধান, পাপিষ্ঠ ব্যক্তি মুমিনের ইমামতি করবে না' হাদীসটি সহীহ হলে খারাপ ও পাপিষ্ঠ ইমামের পেছনে সালাত বাতিল হওয়ার প্রমাণ হতো। কিন্তু হাদীসটি সহীহ নয়। ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থে[৬৯] এ হাদীস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[৭০]

---

৬৬. তুরাসুল আলবানী ফিল আকীদাহ, ১/১৭০
৬৭. সহীহুল বুখারী, ৬৯৪
৬৮. সিলসিলাতুয যঈফাহ, ১৮২২
৬৯. ইরওয়াউল গালীল, ৫৯১
৭০. আত-তালীক মিন শারহিল আকীদাতিত তহাবিয়্যাহ, পৃ. ৬৭

প্রশ্ন ৩১: পতাকার সামনে এবং জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সময় নীরবতা পালন করা এবং কোনোরকম নড়াচড়া করা ছাড়াই দাঁড়ানোর বিধান কী?

জবাব: নিঃসন্দেহে এটা কাফিরদের অনুসরণ ও অনুকরণ। আর তাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। তাই কাফিরদের অনুকরণ করে কোনো কিছু প্রচলন করা কোনো মুসলিম দেশের জন্য জায়েয নয়। নিঃসন্দেহে দুনিয়াতে মুসলিম শাসকের তুলনায় শ্রেষ্ঠ কোনো শাসক নেই। মুসলিম শাসকরাই পারেন, কাফিরদের এসব অনুকরণ ও প্রচলনকে ইসলামের অনুকরণ ও প্রচলনের মাধ্যমে পরিবর্তন করতে।

তবে সরকারি কর্মকর্তা ও সেনাবাহিনী, যাদের এসব ইসলামপরিপন্থি নিয়মনীতি মানা ছাড়া কোনো পথ নেই, তাদের অবস্থা কয়েক রকম হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্তর ও অবস্থা ভাগ করে বলেন, 'তোমাদের যে ব্যক্তি কোনো খারাপ কাজ দেখবে সে যেন তা তার হাত দ্বারা পরিবর্তন করে। তাতে সে সক্ষম না-হলে সে যেন কথার মাধ্যমে তা পরিবর্তন করে। তাতে সে সক্ষম না-হলে সে যেন তা তার অন্তর দিয়ে করে। আর এটাই ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল অবস্থা।'[৭১]

আমরা সবাই অবগত আছি যে, অনেক মুসলিম দেশ এ সব সমস্যায় জর্জরিত। এসব বিদেশিদের অনুকরণ। যেমন কিছু আরব ইসলামী দেশের নিয়ম হচ্ছে, কোনো সৈনিক দাড়ি রাখতে পারবে না। আমরা হাদীসে দেখলাম, এসব ইসলামপরিপন্থি বিষয়ে মানুষদের কয়েকটি স্তর রয়েছে। অধিকাংশ সৈনিক এ কারণে দাড়ি কেটে ফেলে। আরেক শ্রেণি আছে যারা নিজেরা দাড়ি কেটে ফেলে না কিন্তু সেনাবাহিনীর লোকেরা তাদের দাড়ি কেটে নেয়। আরেকদল আছে যারা কোনো অবস্থায় দাড়ি কাটে না আবার কাটতেও দেয় না। এদের সংখ্যা খুবই কম। জর্দান, সিরিয়াতে এ শ্রেণির কিছু সৈনিকের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তারা দাড়ির জন্য অনেক ধৈর্যধারণ করে, এমনকি তাদেরকে জেলেও যেতে হয়। পরবর্তীতে তাদের ওপর আল্লাহর সাহায্য নেমে আসে। দেখা যায়, দাড়িওয়ালা ও দাড়িহীন সৈনিকদের মাঝে বন্ধুত্ব গড়ে উঠে।

অতএব, এ বিষয়টির সাথে ঈমান কম-বেশির সম্পর্ক রয়েছে। পতাকার সামনে নীরবতা পালন করার মতো অনৈসলামিক রীতি পালনের দায়িত্ব যার কাঁধে চলে আসে, সে চাইলে তা পালন নাও করতে পারে। কিন্তু সে জানে যে, এ জন্য হয়তো তাকে জেল বা শাস্তি বা অজানা কোনো বিষয়ের মুখোমুখি হতে পারে। একজন শক্তিশালী মুমিন এসব জানার পরও ধৈর্যধারণ করে। আর ধৈর্যধারণ করার কারণে পরবর্তীতে তার ওপর আল্লাহর সাহায্য নেমে আসে। আল্লাহ

৭১. সহীহ মুসলিম, ৮১; সুনানু আবী দাউদ, ১১৪০

তাআলা মুমিন বান্দাদের এমনটাই হতে বলেছেন।

আরেক শ্রেণি আছে যারা ধৈর্যধারণ করে না বরং পতাকাকে অভিবাদন জানায়। তবে এমন অভিবাদনকে সে অন্তর থেকে ঘৃণা করে। আমাদের মনে রাখতে হবে, এমন কাজকে অন্তর থেকে ঘৃণা করা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি পতাকার সামনে দাঁড়াতে বাধ্য, কমপক্ষে সে অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করবে। কমপক্ষে অন্তর দ্বারা ঘৃণা না করলে তার মাঝে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকে না, যেমনটি কিছু সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়।[৭২]

প্রশ্নকারী: কেবল পতাকার সামনে দাঁড়ালেই তাওহীদ ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যাবে?

শাইখ: অবশ্যই এর মাধ্যমে ইসলাম, শরীআত ও ইসলামী আদব ত্রুটিপূর্ণ হয়। আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

যে-দিন মানুষেরা জগৎসমূহের রবের সামনে দাঁড়াবে।[৭৩]

পতাকাকে এমন সম্মান করা মূর্তিকে সম্মান করার সদৃশ। কারণ, পতাকা একটুকরো কাপড়ের মাধ্যমে বানানো হয়। হায়, এসব ইউরোপীয়দের অন্ধ অনুকরণ![৭৪]

৭২. সহীহ মুসলিম, ৮১; সুনানু আবী দাউদ, ১১৪০

৭৩. সূরা মুতাফ্‌ফিফীন, ৬

৭৪. তুরাসুল আলবানী ফিল মানহাজ, ৩/৪৭৬

অধ্যায় দুই

মানহাজ

প্রশ্ন ৩২: সালাফী-আহলুল হাদীসরা কি মাযহাব ত্যাগের দাওয়াত দেয়?

জবাব: সুন্নাহপন্থি দাঈদের ব্যাপারে এটি একটি মিথ্যা ধারণা এবং বাস্তবতা পরিপন্থি অপবাদ। তাদের ব্যাপারে এমন কুধারণা ও জঘন্য অপবাদ অপনোদন করা উচিত। তাই মাযহাবের ব্যাপারে অবস্থান সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরছি।

আলেমগণ অবগত আছেন যে, চার মাযহাবসহ অন্যান্য মাযহাবের সমস্ত মাসআলা ঐকমত্যপূর্ণ নয়। বরং তা তিন প্রকার:

১. কিছু মাসআলায় সবাই একমত, যেমন; কাফিরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম।

২. কিছু মাসআলায় তাদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে সে মতপার্থক্য 'ইখতিলাফুত তানাউ'-এর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ সব মতই দলিলসম্মত। যেমন; সালাত শুরুর দুআ ও তাশাহহুদ।

৩. কিছু মাসআলা এমন বিরোধপূর্ণ ও পরস্পর বিরোধী যে, সেগুলোর মাঝে কোনোভাবেই সমন্বয় করা সম্ভব নয়। যেমন; নারীদের স্পর্শ করার কারণে অজু নষ্ট হওয়া, না হওয়ার মাসআলা। এ ব্যাপারে তিনটি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে;

ক. অজু নষ্ট হয়ে যাবে,

খ. অজু নষ্ট হবে না,

গ. কামভাব সহকারে স্পর্শ করলে অজু নষ্ট হবে; আর কামভাব না থাকলে নষ্ট হবে না।

যখন মাসআলা-মাসাইলের এ অবস্থা তখন কীভাবে সুন্নাহর দাঈগণ মাযহাব ত্যাগের দাওয়াত দিতে পারেন! তারা মাযহাব ত্যাগের দাওয়াত দিলে তো প্রথম দুই প্রকার মাসআলাও তারা বর্জন করতেন। আর তারা প্রথম দুই প্রকার মাসআলা বর্জন করলে হক থেকে নিঃসন্দেহে বিচ্যুত হয়ে যাবেন।

বরং তারা সকল মাযহাবের মাঝে থেকেই হক তালাশ করেন। তারা নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবকে অপরিহার্য করে নেন না। হক তালাশ করতে গিয়ে তাদের সামনে মাযহাবের ইমামদের মর্যাদা, তাদের জ্ঞানের গভীরতা, কুরআন-সুন্নাহ বোঝার ক্ষেত্রে তাদের সূক্ষ্মদর্শিতা ও বিজ্ঞত্ব প্রতিভাত হয়ে ওঠে। ফলে তারা তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্মদর্শিতা থেকে উপকৃত হতে চেষ্টা করেন।

তারা তৃতীয় প্রকার মাসআলায় নির্দিষ্ট মাযহাব মানেন না। কারণ, তৃতীয় প্রকারের মাসআলায় সকল সঠিক মত নির্দিষ্ট কোনো এক মাযহাবের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সকল মাযহাবে ছড়িয়ে থাকে। দেখা যায়, এ মাসআলায় হানাফী মাযহাব সঠিক। আরেক মাসআলায় মালিকী মাযহাব সঠিক। অন্য মাসআলায় শাফিয়ী মাযহাব সঠিক। চতুর্থ মাসআলায় হাম্বালী মাযহাব সঠিক। এ প্রকার মাসআলায় তারা যদি একটি মাযহাবকে আঁকড়ে ধরতেন, তবে বাকি মাযহাবের সঠিক মত থেকে তারা বঞ্চিত থাকতেন। আর জেনেশুনে সঠিক মত থেকে দূরে থাকা বৈধ নয়।[৭৫]

প্রশ্ন ৩৩: সালাফী অভিধা ব্যবহারকারী কিছু যুবককে দেখতে পাওয়া যায়, তারা আলেমদের বিশেষ করে সৌদি আলেমদের ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করে। তাদের ব্যাপারে অপপ্রচার চালায়। বলে, আমরা তাদের ওপর আস্থা রাখি না। তারা দরবারি আলেম। তারা তাগুতের দালাল। শাইখ! তাদের এমন দাবি কতটুকু সঠিক?

জবাব: আপনার উদ্ধৃতিতে যেমন শুনলাম, আমি নিজেও সরাসরি অনেকের মুখে আলেমদের ব্যাপারে এমন মন্তব্য শুনেছি। যারা আলেমদের শানে এমন অশোভনীয় আচরণ করে, আলেমদের তাগুতের দালাল বলে এবং বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করে, তারা মূলত যুবক শ্রেণি। এসব যুবকদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা খারাপ মন্তব্য করতে পারি না। আমরা তাদের ইলম-জ্ঞানের ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করতে পারি। তাদের ইলমী সংকীর্ণতা রয়েছে। সঠিক ইসলামী ফিকহ ও ইসলামী আদর্শের ব্যাপারে তারা মিসকীন। অথচ মুসলিম যুবকের অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য হচ্ছে, সঠিক ইসলামী ফিকহ ও ইসলামী আদর্শে নিজেদের সুসজ্জিত করা। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, অধুনা যুবাশ্রেণি তা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত।

সঠিক কথা হচ্ছে, বর্তমানে এক চেতনা ও জাগরণ গড়ে উঠেছে যাকে বলা হচ্ছে, ইসলামী চেতনা ও জাগরণ। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, সেই চেতনা ও জাগরণ ইসলামী চেতনা ও জাগরণের

৭৫. মাকালাতুল আলবানী, পৃ.৩৮-৪০, সারাংশ

সর্বোচ্চ তোরণে পৌঁছেছে মাত্র। হেরেমে পৌঁছা তো দূরের কথা, মধ্যরাস্তায় পৌঁছতেই এখনো সক্ষম হয়নি। দ্বিতীয়ত, এই জ্ঞানগত মনস্তাত্ত্বিক চেতনা ও জাগরণের সাথে ইসলামী আদর্শিক চেতনা ও জাগরণের কোনো সম্পর্ক নেই।

এ কারণে আমরা যুবকদের পরামর্শ দেব, তারা যেন প্রথমে জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য জ্ঞানার্জন অব্যাহত রাখে। এরপর নিজেদের সংশোধন করে, আত্মশুদ্ধির পথ অবলম্বন করে এবং ইসলামী আদর্শ নিজেদের মধ্যে লালন করে। তারা নিজেদের এভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হলে আলেম তো দূরের কথা, সাধারণ মানুষের চরিত্র নিয়েই কথা বলারও সাহস পাবে না। তাদের সমালোচনায় কালক্ষেপণ করার ফুরসতও পাবে না।[৭৬]

প্রশ্ন ৩৪: শাইখ, আপনার ব্যাপারে বলা হয়, আপনার মতে মুতাযিলা, আশায়িরা, শিআ ইত্যাদি ফিরকাদের কাফির বলা যাবে না; এমনকী তাদেরকে বিভ্রান্ত পর্যন্ত বলা যাবে না। এ ব্যাপারে আপনার মত কী? কখন তাদের কাফির বলা যাবে?

জবাব: এটা আমার ব্যাপারে ভুল প্রচারণা। আমি কোনোদিন বলিনি তাদেরকে বিভ্রান্ত বলা যাবে না। আমি বলি, তাদেরকে আমরা সরাসরি কাফির বলব না। তাদেরকে বিভ্রান্ত বলার ব্যাপারে আমার স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, যারা ইসলামের সহজ-সরল পথ তথা সিরাতুল মুস্তাকীম থেকে সরে গিয়েছে, তারা বিভ্রান্ত; তাতে তারা স্বীকার করুক বা না করুক। আমি তাদেরকে সবসময় বিভ্রান্ত ফিরকা বলি। কেননা, হাদীস মতে মুক্তিপ্রাপ্ত দল হচ্ছে একটি; বাকি সমস্ত ফিরকা বিভ্রান্ত। তবে আমরা তাদেরকে কাফির বলার ব্যাপারে সংযমতা অবলম্বন করি। অনেকে বলে, অমুক ফিরকা কাফির। আমরা এভাবে বলি না। কেননা তাদের মাঝে এমনও লোক থাকে যারা সত্যিকারার্থে হকের অনুসন্ধান করে। সিরাতুল মুস্তাকীমের পথে চলতে প্রাণান্তকর চেষ্টা করে। এতকিছুর পরও তারা হকের পথ চিনতে বিভ্রমের শিকার হয়। তাই আমরা তাদেরকে বিভ্রান্ত বলতে কোনোরকমের সংকোচবোধ করি না; তবে কাফির বলি না। 'বিভ্রান্ত' বলা আর 'কাফির' বলার মাঝে আমরা পার্থক্য করি; উভয়কে এক পাল্লায় মাপি না। অতএব, যারা আমার ব্যাপারে এমন কথা বলে, তারা মুলত সঠিক তথ্য প্রদান করেনি। আমরা কখনোই বলিনি তাদের বিভ্রান্ত বলব না। তাদেরকে বিভ্রান্ত বলা বৈধ না হলে এমন বিশৃঙ্খল ও ভয়াবহ অবস্থায় পরিণত হবে যার কোনো সীমা-পরিসীমা থাকবে না। তাই যারা কিতাব ও সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে তাদের আমরা বিভ্রান্ত বলি, যদিও তারা নিজেদের সুন্নাহপন্থি দাবি করে। কিন্তু কাফির বলি না।[৭৭]

৭৬. তুরাসুল আলবানী ফিল মানহাজ, ৭/১৩৭-১৩৮
৭৭. তুরাসুল আলবানী ফিল মানহাজ, ১২/৭

প্রশ্ন ৩৫: যারা পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখে না তারা কি বিদআতীদের সাথে মুনাযারা-বিতর্ক করতে পারবে?

জবাব: আমরা আমাদের ভাইদের পরামর্শ দেব, বিদআতীদের সাথে কেবল তারাই মুনাযারা-বিতর্ক করবে, কিতাব ও সহীহ সুন্নাহর ব্যাপারে যারা পূর্ণ জ্ঞান রাখে। বিদআতীরা প্রবৃত্তিপূজারি। তারা বিভিন্ন সংশয়-সন্দেহ উত্থাপনে বিশেষভাবে পারদর্শী। তাই অপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে তাদের সাথে মুনাযারা-বিতর্ক করলে আশঙ্কা রয়েছে, তারা তাকে পর্যুদস্ত করে ফেলবে। তারা জ্ঞানগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণের মাধ্যমে তাকে প্রভাবিত করতে পারে। ফলে সে তাদের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে তাদের আকীদাহ-বিশ্বাস গ্রহণ করে নেওয়ার প্রবল আশঙ্কা থেকে যায়। এ কারণে সালাফগণ বিদআতী ও প্রবৃত্তিপূজারিদের মজলিসে উপস্থিত হতে এবং তাদের সঙ্গ দিতে জোরালোভাবে নিষেধ করতেন।

প্রশ্ন ৩৬: এমন অনেক ছাত্র দেখতে পাওয়া যায়, যারা আশআরী বা অন্যান্য বিদআতী শিক্ষকের কাছে আকীদাহ ছাড়া নাহু-সরফ বা অন্যান্য আরবী ব্যাকরণ পড়ে। এভাবে তাদের কাছে কি পড়া যাবে?

জবাব: যদি সে ছাত্র আকীদায় পারদর্শী হয় এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখে, তাহলে তাদের কাছে পড়াশোনা করা যেতে পারে। আর যদি সে আকীদায় তেমন জ্ঞান না রাখে এবং পারদর্শী না হয়, তাহলে পড়াশোনা করা যাবে না।

প্রশ্ন ৩৭: যারা বলে, 'এ মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐক্য। তাই কুরআন ও সুন্নাহর দাওয়াতের চেয়ে ঐক্যের দাওয়াতকে প্রাধান্য দিতে হবে।' তাদের ব্যাপারে আপনার মত কী?

জবাব: হাদীস থেকে বোঝা যায়, ফিরকাবন্দি মানেই নিন্দনীয়-এমনটা ভাবার কোনো অবকাশ নেই। কুরআন ও সুন্নাহর দাওয়াত দিলে একদল লোক চটে যায়। কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী আমল ও বিদআত পরিহার করার প্রতি মানুষকে আহ্বান করলে, তারা তাতে ভীষণ রকমের আপত্তি তোলে। বিশৃঙ্খল সৃষ্টিকারী, ঐক্য বিনষ্টকারীর তকমা তার গায়ে লাগিয়ে দেয়। 'ঐক্য গেল', 'ঐক্য গেল' বলে রব তোলে।

তারা মনে করে, বর্তমানে মুসলিমদের সব থেকে বড়ো প্রয়োজন, ঐক্য ও সংহতি। এমন শোচনীয় মুহূর্তে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কুরআন

ও সুন্নাহ পরিপন্থি আমল ও বিদআতের ব্যাপারে মুখ খোলার এখন মোক্ষম সময় নয়। এতে মুসলিমদের মাঝে বিরোধ ও বিভক্তি আরও শানিত হবে।

দাওয়াতের মূলনীতির ব্যাপারে তাদের এটি একটি বড়ো ধরনের মূর্খতা। তারা হয়তো জানে না যে, হকপন্থি ও বাতিলপন্থিদের মাঝে দ্বৈরথ চিরন্তন। হকের দাওয়াতের বিরোধিতায় সর্বদা একদল ছিল এবং থাকবে। এর মাধ্যমে হকপন্থি ও বাতিলপন্থি দুটি দল দৃশ্যমান হবে। এটাই আল্লাহর নীতি। আল্লাহর নীতির কোনো পরিবর্তন নেই। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ

তোমার প্রতিপালক চাইলে মানুষকে অবশ্যই এক জাতি করতে পারতেন; কিন্তু তারা বিভেদ করতেই থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক যাদের ওপর দয়া করবেন, তারা ব্যতীত। (সূরা হুদ, ১১: ১১৮-১১৯)[৭৮]

প্রশ্ন ৩৮: অনেকে বলে, 'চার মাযহাবের বিপরীতে মতপ্রদান করা কুফরী।' এ কারণে তারা তালাকের মাসআলায় শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহকে কাফির বলে। এ ব্যাপারে আপনার মত কী?

জবাব: কেউ কোনো আপত্তি করলে বা অপপ্রচার চালালেই সত্যি হয়ে যায় না। এমন কোনো আলেম নেই যিনি বলেছেন, যে-ব্যক্তি চার মাযহাবের বিপরীতে মতপ্রদান করবে, সে কুফরী করবে। তাই আজকে কেউ এমন দাবি করলে বা এমন কথা বললে তার ওপর করুণা করা ছাড়া আর কি করা যেতে পারে![৭৯] [৮০]

প্রশ্ন ৩৯: ইজতিহাদী মাসআলায় সাধারণ ব্যক্তি কি আলেমের কাছে দলিল চাইতে বাধ্য?

জবাব: সাধারণ ব্যক্তি যদি দলিল বোঝে তবে চাইবে আর যদি দলিল না বোঝে তবে চাইবে না।[৮১]

---

৭৮. সিলসিলাহ সহীহাহ, ৬/৭৮১

৭৯. নবী ﷺ বলেন, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম লোক। অতপর তাদের পরের যুগ। অতপর তাদের পরের যুগ। (সহীহুল বুখারী, ২৬৫৩; সহীহ মুসলিম, ৬৩৬৬) নবী ﷺ-এর ভাষ্যমতে প্রথম তিন যুগ উত্তম যুগ। অথচ এ উক্ত তিন স্বর্ণযুগে কোনো মাযহাব ছিলো না। – সম্পাদক (সালাফী)

৮০. তুরাসুল আলবানী ফিল মানহাজ, ৬/৪৫।

৮১. তুরাসুল আলবানী ফিল মানহাজ, ৬/১৬৬

প্রশ্ন ৪০ : একজন তালিবে ইলমের জন্য কোন মাযহাব সর্বাধিক উত্তম ও উপযোগী?

জবাব: একজন তালিবে ইলমের জন্য শাফিয়ী ও হাম্বালী মাযহাব সর্বাধিক উত্তম ও উপযোগী। এই দুই মাযহাব সুন্নাহর সবচেয়ে কাছাকাছি। কেননা, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল সুন্নাহর ব্যাপারে সবার চেয়ে বেশি পাণ্ডিত্য রাখতেন-সুন্নাহর গবেষক মাত্রই একথা স্বীকার করতে বাধ্য। আর ইমাম শাফিয়ী সুন্নাহর ব্যাপারে একজন বিজ্ঞ ইমাম হওয়ার পাশাপাশি আরবী সাহিত্য, ভাষায় ও ফিকহের মূলনীতিতে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল থেকে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম ফিকহের মূলনীতি নিয়ে গ্রন্থ সংকলন করেন। তার সেই সংকলিত গ্রন্থ 'আর-রিসালাহ' নামে সমাদৃত। এ কারণে একজন তালিবে ইলম ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বালের সুন্নাহ আর ইমাম শাফিয়ীর আরবী সাহিত্য, ভাষা ও ফিকহের মূলনীতি থেকে নিজেকে সমৃদ্ধ করবে। এভাবে দুইজন ইমামের দুই ইলমী-নির্ঝর তার মাঝে প্রবাহিত হবে। ইমাম শাফিয়ী থেকে প্রমাণিত আছে, তিনি ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বালকে বলেন, 'আহমাদ! তুমি হাদীসশাস্ত্রে আমার থেকে বেশি জ্ঞান রাখো। হিজাযী বা শামী কিংবা মিসরী কারো থেকে যদি তুমি কোনো হাদীস পাও, আমাকে জানাবে।' এ ঘটনা থেকে যেমন প্রমাণ হয়, ইমামদের ইনসাফ, মর্যাদা ও আল্লাহভীতি; তেমনি প্রমাণ হয় ইমাম শাফিয়ী ইমামু দারিল হিজরাহ ইমাম মালিকের তাকলীদ করতেন না। কেননা, ইমাম মালিক হিজাযীদের হাদীসকে অন্যান্য এলাকার হাদীসের ওপর প্রাধান্য দিতেন। ইমাম মালিক অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এ মত পোষণ করতেন। তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, হিজাযে সাহাবীদের সবচেয়ে বেশি বসবাস। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় শেষের জীবন কাটান। বিজ্ঞ ও বড়ো বড়ো সাহাবীগণ এখানে অবস্থান করেন। আবু বাকর, উমার, উসমানের মতো তাদের অনেকেই এখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তবে এ কথা ঠিক যে, অনেক সাহাবী হিজায ছেড়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তারা যা কিছু অর্জন করেন, তারা তা বুকে ধারণ করেই সেসব দেশে পাড়ি জমান। তাদের বুকে ধারণকৃত সেসব জ্ঞানকে অবহেলা ও অবজ্ঞা করার কোনো সুযোগ নেই। এ কারণে ইমাম শাফিয়ী ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বালকে বলেছিলেন, 'তুমি হাদীসশাস্ত্রে আমার থেকে বেশি জ্ঞান রাখো।' তিনি কেন এমন মন্তব্য করেছিলেন?

কারণ, ইমাম শাফিয়ী মক্কায় ছিলেন। এরপর মিশর সফর করেন। মিশরে তিনি এমন অভিনব জ্ঞান দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করেন যা ইতঃপূর্বে তার ছিল না। ফলে তার নতুন ও পুরাতন নামে দুটি মাযহাব হয়ে পড়ে। কেবল এক নতুন অঞ্চলে সফর করার কারণে তাদের জ্ঞানের পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং দুই মাযহাবে পরিণত হয়। তাহলে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বালের

ব্যাপারে কী বলা যেতে পারে, যিনি আলেমদের থেকে সরাসরি জ্ঞানার্জন এবং হাদীস শেখার জন্য পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণের অসংখ্য অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়েছেন?

তবে যারা ইমাম শাফিয়ীর জীবনচরিত অধ্যয়ন করেছেন তারা সবাই একথার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন যে, মাসআলা উদঘাটন এবং কুরআন-সুন্নাহর দলিল বোঝা ও উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে তিনি ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল থেকে বেশি দক্ষ ছিলেন। অতএব, একজন তালিবে ইলম এক্ষেত্রে ইমাম শাফিয়ী ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বালের মাযহাব গ্রহণ করতে পারে এবং সেইসঙ্গে অধ্যয়নও করতে পারে।

এখানে আরেকটি বিষয় হচ্ছে, শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারীদের একটি অনবদ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যা অন্য মাযহাবের অনুসারীদের মাঝে তেমন পাওয়া যায় না-তারা তাদের ইমামের 'কোনো হাদীস সহীহ প্রমাণিত হলে তা আমার মাযহাব' এই উক্তি ও মূলনীতির সর্বাধিক অনুগামী। শাফিয়ী মাযহাবের এমন অনেক অনুসারী আছেন যারা ইমাম শাফিয়ীর অসংখ্য মাসআলার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। অথচ হানাফী বা মালিকী মাযহাবে এমন লোক খুবই কম পাওয়া যায়, যারা উক্ত মূলনীতি এবং উক্তির অনুসরণার্থে তাদের ইমামের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে, হানাফী মাযহাবের তুলনায় শাফিয়ী মাযহাবে মুহাদ্দিসদের সংখ্যাধিক্য অনেক বেশি। হানাফী মাযহাবের এমন ইমামদের সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকজন যারা মুহাদ্দিস ছিলেন। অথচ শাফিয়ী মাযহাবে মুহাদ্দিসদের সংখ্যা অনেক বেশি। হাদীসের তাখরীজ নিয়ে শাফিয়ী মাযহাবে অনেক গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। এর বিপরীতে হানাফী মাযহাবে এ নিয়ে মাত্র একটি বই রয়েছে, তা হলো 'নাসবুর রায়াহ লি আহাদীসিল হিদায়াহ'।[৮২]

প্রশ্ন ৪১: সালাফ থেকে কোনো মত প্রমাণিত হলে সেই মত কি সমসময় আমলযোগ্য?

জবাব: এ ব্যাপারে সবসময়ের জন্য প্রযোজ্য কোনো মূলনীতি নেই। তবে আমরা এ সংক্রান্ত কিছু মূলনীতি উল্লেখ করতে পারি।

যেমন: যদি কোনো মত সাহাবী থেকে পাওয়া যায় আর সে মত কুরআন বা হাদীসের কোনো স্পষ্ট দলিল পরিপন্থি না হয় এবং সেই মতটি সাহাবীদের মাঝে প্রচলিত ছিল অথচ কোনো সাহাবী বিরোধিতা করেছেন বলে জানা না যায়-তাহলে সেই সাহাবীর উক্ত মত বা আমল গ্রহণ করার ব্যাপারে অন্তর প্রশান্তি পায়।

৮২. তুরাসুল আলবানী ফিল মানহাজ, ৬/২০৪

কতক লোক বাড়াবাড়ি করে বলে, 'তারাও মানুষ, আমরাও মানুষ। তাই এই সাহাবী যদি একে হালাল মনে করতে পারে, তাহলে আমি তা হারাম মনে করতে পারি।' আমরা এমন ব্যক্তিদের বলব, ভাই আমার, আপনি সাহাবীদের তুলনায় কে? আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীসের ব্যাপারে আপনার জ্ঞান কতটুকু, আপনার ফিকহের পরিধি কতটুকু?

তাই আমাদের ওপর ওয়াজিব হচ্ছে, বুঝেশুনে সামনে চলব, আমরা নিজের খাস মতামতের ধোঁকায় পড়ব না। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, সত্যিকারার্থে সালাফী হওয়া। আমরা সালাফদের অনুসরণ করব, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব। আমরা তাদের বিরোধিতা করব না; তবে শুধু তখন করব যখন আমাদের কাছে কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত কোনো কিছু থাকবে।[৮৩]

প্রশ্ন ৪২: কারো ব্যাপারে সতর্ক করার পূর্বে তাকে নসীহত করা কি শর্ত? আবার কেউ কেউ বলেন, কারো বিরুদ্ধে কিতাব লিখলে সেই কিতাব প্রকাশ করার পূর্বে তার কাছে পাঠানো শর্ত। প্রশ্ন হলো, এটা কি সালাফদের মানহাজ ছিল?

জবাব: এটা শর্ত নয়। তবে বিষয়টা জনসম্মুখে প্রচারের পূর্বে উভয়ে কাছাকাছি হওয়া নিঃসন্দেহে ভালো বিষয়। কিন্তু প্রথমত একে শর্ত বলা এবং দ্বিতীয়ত একে সবসময়ের জন্য শর্ত আখ্যা দেওয়া, কোনো প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নয়। আপনারা জানেন, মানুষ একধরনের খনি; স্বর্ণ-রৌপ্যের খনির ন্যায়। যার ব্যাপারে আপনি জানতে পারবেন, সে আমাদের মানহাজ ও পদ্ধতির অনুসারী এবং তাকে নসীহত করলে নসীহত গ্রহণ করে-তাহলে তার ভুলগুলো জনসম্মুখে প্রচার করার পূর্বে তার কাছে লিখে পাঠালে ভালো হয়। তবে এটা শর্ত নয়। আর এটা শর্ত হলেও বাস্তবায়নযোগ্য নয়। আপনি কোথায় তার ঠিকানা পাবেন? কোথায় তার ডাক পাবেন? তার পক্ষ থেকে প্রতিউত্তর পাবেন না কি পাবেন না? এসব বিষয় ধারণাপ্রসূত। এ শর্ত বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তাই একে শর্ত গণ্য করা যাবে না।[৮৪]

প্রশ্ন ৪৩: যে শাসক আল্লাহর বিধানকে বাতিল করে দেয়, তার ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কী হবে?

জবাব: শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করা আজকাল একটা রীতিতে পরিণত হয়েছে; বিশেষ করে যুবকেরা এদিক থেকে বেশ এগিয়ে। একদল সত্যিকারার্থে এ বিষয়টি জানার চেষ্টা করে এবং আলেমদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে, সে অনুযায়ী চলার

৮৩. ফাতাওয়াল মাদীনাহ, ২১
৮৪. সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, ক্যাসেট নং, ৬৩৮

চেষ্টা করে। আরেকদল জানার চেষ্টা না করেই শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে। পরবর্তীতে তাদের দ্বারা আর কিছুই হয়ে ওঠে না।

শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয; এমনকী কখনো ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে শর্ত হচ্ছে, শাসককে একেবারেই স্পষ্ট কুফরীতে জড়িত হতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, অতিমাত্রায় রক্তপাত ছাড়াই সেই শাসককে অপসারণ করে তার স্থানে আরেকজনকে বসানোর ক্ষমতা থাকতে হবে।

তবে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই যে, কোনো দলের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা সম্ভব নয়। কারণ, শাসকগণ বিভিন্ন শক্তি ও অস্ত্রের বলয়ে নিজেদের সংরক্ষিত করে রাখে। তারা শক্তি ও অস্ত্র এমনভাবে প্রস্তুত করে রাখে যে, কোনো গোষ্ঠী বা দল বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তাদের প্রতিরোধ ও প্রতিহত করতে তারা সক্ষম।

তাই আমাকে যদি বিদ্রোহ করার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, তবে আমার উত্তর হবে: হ্যাঁ, তা বৈধ। তবে আমি বলব, বিদ্রোহ করা বৈধ হলেও বর্তমান যুগে এটি প্রশ্ন করার বিষয় নয়। কেননা, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মতো জনবল নেই। কোনো গোষ্ঠীকে যদি দেখি তারা শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সক্ষমতা রাখে, তবে তাদের বলব, শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আগে কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হোন।

অতএব, এ নিয়ে প্রশ্ন করা নিষ্ফল। শাসক যদি প্রকাশ্য কুফরীতে লিপ্ত হয় তবে শরীআত তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অনুমতি প্রদান করে। বড়ো আফসোসের বিষয়, কোনো কোনো রাষ্ট্রে এমন শাসকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তবে সেখানে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদেরকে অপসারণ করে অন্য কাউকে ক্ষমতায় বসাতে সামর্থ্য রাখে এমন কোনো গোষ্ঠী পাওয়া যায় না।

এ জন্য আমি ইসলামী দল ও গোষ্ঠীগুলোকে পরামর্শ দিব, তারা যেন যথাসাধ্য সঠিক ও স্বচ্ছ ইসলাম শিখতে ও জানতে সচেষ্ট হয়। তারপর নিজেদেরকে সঠিক ইসলামের ওপর বেড়ে ওঠার এবং অটল রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। শাসক কাফির ও নাস্তিক হলেও এসব কাজ করা সম্ভব। অতএব, তারা যেন এমন তৎপরতা না দেখায় এবং এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে যা তাদের ক্ষমতা ও সাধ্যের মধ্যে নয়।[৮৫]

৮৫. তুরাসুল আলবানী ফিল মানহাজ, ৬/২৬০

প্রশ্ন ৪৪: কোনো কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পতিতালয় খোলা হয়। খোদ সরকারই তাদেরকে লাইসেন্স প্রদান করে। বিনিময়ে রাষ্ট্র তাদের থেকে ট্যাক্স গ্রহণ করে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ এ থেকে নিষেধ করেছেন। এমন শাসক কি কাফির? এমন শাসকের ব্যাপারে আপনার মতামত ও দিকনির্দেশনা কী?

জবাব: আহ! নিঃসন্দেহে এটি একটি কুফর।

কুফর দুই প্রকার;

ক. আকীদাহ-বিশ্বাসগত কুফর,
খ. আমল-কর্মগত কুফর।

যদি পতিতালয়কে বৈধ ও মুবাহ বিশ্বাস করে অনুমতি প্রদান করা হয়, তবে তা এমন কুফর বলে গণ্য হবে, যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

আর যদি নিজেদেরকে পাপী মনে অনুমতি প্রদান করা হয়, তবে তারা কাফির হবে না। অর্থাৎ অনুমতি প্রদান করার সময় বিশ্বাস করবে যে, চুরি করলে বা সুদ খেলে বা অন্যান্য হারাম উপায়ে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করলে যেমন গুনাহগার ও অপরাধী হয়, তেমন পতিতালয়ের লাইলেন্স দিলে সে নিজে গুনাহগার ও অপরাধী হবে।

কেননা এসব জিনিস হারাম। আর যারা হারামকে হালাল মনে করবে, শরীআত কর্তৃক ঘোষিত হারামকে না মানবে, তারা দ্বীনত্যাগী কাফির। আর যারা শরীআত কর্তৃক ঘোষিত হারামকে হারাম বলে বিশ্বাস করবে এবং মনে করবে তারা শরীআত বিরোধী কাজে লিপ্ত রয়েছে, এরপরও সেই হারামে জড়িয়ে পড়বে-তারা অনেকটা তার মতো, যে চুরি করে বা অন্যান্য হারাম কাজে জড়িত থাকে। এসব অবাধ্যতা ও পাপে জড়িত থাকার কারণে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে না, যতদিন ইসলামী ফয়সালা ও বিধানকে সে বিশ্বাস করবে। আর যেদিন ইসলামী ফয়সালা ও বিধানকে বিশ্বাস করবে না, সেদিন কাফির হয়ে যাবে।[৮৬]

প্রশ্ন ৪৫: শাইখ, আইন অনুষদে ভর্তি হওয়া কি জায়েয? কেননা তাতে মানবরচিত আইনকানুন পড়ানো হয়ে থাকে।

জবাব: যদি সেখানে [নারী-পুরুষের] সহশিক্ষা না থাকে; তবে আফসোসের বিষয় তা সহশিক্ষা

৮৬. তুরাসুল আলবানী ফিল মানহাজ, ৬/২৬৫

মুক্ত হবার কথা নয়। সেইসঙ্গে ছাত্র যেন শরয়ী আইনকানুন সম্পর্কে অবগত থাকে; বিশেষ করে লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত আইনকানুন নিয়ে খুব ভালোভাবে জানাশোনা থাকতে হবে। তবে সেই মানবরচিত আইন জানতে, তাদের কার্যক্রম সম্পর্ক অভিজ্ঞতা সঞ্চার করতে এবং তাদের দেশ পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হতে আইন অনুষদে ভর্তি হওয়া যেতে পারে। অন্যথা ভর্তি হওয়া যাবে না।

প্রশ্ন ৪৬: শাইখ, আমি জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অনুষদে পড়তে চাই। এ ব্যাপারে আপনার দিকনির্দেশনা কী?

জবাব: আমি আপনাকে নসীহত করব, আপনি আইন অনুষদে পড়বেন না। আপনি বরং শরীআহ অনুষদে পড়ুন।

প্রশ্ন ৪৭: বিচার বা আইনজীবী পেশায় নিয়োজিত হওয়া কতটুকু বৈধ? কারণ, বিচারব্যবস্থাগুলো কুরআন-সুন্নাহর আইন দ্বারা পরিচালিত হয় না; বরং পাশ্চাত্যের মানবরচিত আইন মোতাবেক পরিচালনা করা হয়।

জবাব: প্রশ্নে উল্লিখিত কারণসমূহের কারণে আমার মতে, আধুনিক সময়ে এ পেশায় নিয়োজিত হওয়া বৈধ হবে না। এরপরও কেউ নিয়োজিত হতে চাইলে তার জন্য গোটা অবস্থা খুবই কঠিন হয়ে পড়বে। আমার মতে, কারো মাঝে যদি নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি বৈশিষ্ট্য থাকে, কেবল সেই এ পেশায় নিয়োজিত হতে পারে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য: বিচারক বা আইনজীবীর যেমন দেশিয় আইনকানুন নিয়ে গভীর পড়াশোনা থাকবে, অনুরূপ শরয়ী আইনকানুন নিয়েও গভীর জানাশোনা থাকবে। আর আমার দৃষ্টিতে এ চাকরি নিষেধ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট। কেননা তাদের মাঝে এ বৈশিষ্ট্য পাওয়া প্রায় একেবারেই অসম্ভব। কারণ, এসব বিচারক ও আইনজীবী সারাটা জীবন দেশিয় মানবরচিত আইনকানুন জানার পেছনেই ব্যয় করে ফেলেন। বাড়তি করে তাদের শরয়ী আইনকানুন নিয়ে পড়াশোনা করার সময় কোথায়?

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য: প্রথম বৈশিষ্ট্যের মতো এটাও খুব দুষ্প্রাপ্য বৈশিষ্ট্য। আমরা কল্পনা করতে পারি না যে, আইনজীবী নিজের নিষ্কলুষতা অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হবে। ধরুন, একজন ব্যক্তি এসে তাকে তার পক্ষে থেকে ওকালতি করার অনুরোধ করল, তার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তার সহযোগিতা কামনা করল। এক্ষেত্রে আইনজীবী শরয়ী আইন ও দেশিয় আইনের

আলোকে তার অধিকার বিশ্লেষণ এবং তদানুসারে চিন্তা করবেন। বিশ্লেষণ ও চিন্তা করার পর যদি দেখেন, তার অধিকার আদায় করতে হলে দেশিয় আইনের আশ্রয় নিতে হবে, আর তা শরয়ী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না-তাহলে তিনি তার পক্ষ থেকে ওকালতি করতে পারবেন। তবে আমার মনে হয়, এভাবে একজন আইনজীবী বড়োজোর এক-দুই বছর টিকে থাকতে সক্ষম হবেন। এরপর প্রবৃত্তি তাকে স্খলন করে ফেলবে। ফলে তিনি বাদী বা বিবাদীর অধিকার আদায়ের দৃঢ় বাসনা থেকে গুটিয়ে যাবেন এবং বস্তুবাদি ধ্যান-ধারণা লাভের পেছনে ছুটবেন। আদতে এটা অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ একটা ব্যাপার। এ কারণেই আমি বলি, আধুনিক যুগে মানবরচিত আইনের অধীনে আইনজীবী হওয়া বৈধ নয়।[৮৭]

প্রশ্ন ৪৮: হাদীসে জালেম শাসকের সহযোগী এবং পুলিশ হতে নিষেধ করা হয়েছে। এ হাদীসের ব্যাখ্যা কী? আর আজকাল এ হাদীস কীভাবে প্রয়োগ হবে?

জবাব: আমি হাদীসটি যেভাবে বুঝি, তা হলো: এসব চাকরিতে যোগদান করা মানে তাদেরকে সহযোগিতা করা। এসব চাকরিতে যোগদান করা মানে জালেম শাসকদেরকে তাদের জুলুমের কাজে সহায়তা করা। যদি চাকরি করার কারণে এমনটাই হয়ে থাকে, তবে এ হাদীসের ব্যাখ্যা করার আর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। অতএব, প্রতিটি মুসলিমের উচিত তাদের কর্মচারী না হওয়া, তাদের চাকরি না করা। আর যদি চাকরি করার মাধ্যমে জুলুমে সহযোগিতা করতে না হয়, কোনো প্রকার অত্যাচারের পৃষ্ঠপোষক হতে না হয়, তাহলে এই হাদীস চাকরি করতে নিষেধ করেনি; তখন তাদের চাকরি করা যাবে। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এসব চাকরি করে কারো পক্ষে জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকা সম্ভবপর নয়।[৮৮]

প্রশ্ন ৪৯: নবী ﷺ-এর থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়। তিনি বলেছেন, 'আমার উম্মতের ইখতিলাফ রহমত।' আসলেই কি ইখতিলাফ রহমত?

জবাব: নবী ﷺ-এর থেকে যে হাদীস উদ্ধৃত করা হয়, তার কোনো ভিত্তি নেই।[৮৯] এ হাদীসকে কেন্দ্র করে অনেক মুসলিম চার মাযহাবের মাঝে বিদ্যমান চরম মতানৈক্যকে স্বীকৃতি প্রদান করে। তারা সেসব মতানৈক্য সমাধানের জন্য কিতাব ও সহীহ সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের কোনো চিন্তাই করে না। অথচ তাদের ইমামগণ প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকী তারা এসব ইমামদের মাযহাবকে ভিন্ন-ভিন্ন একাধিক শরীআত মনে করে। অথচ তারা জানে যে,

---

৮৭. তুরাসুল আলবানী ফিল মানহাজ, ৬/৩৫৭
৮৮. তুরাসুল আলবানী ফিল মানহাজ, ৬/৩৫৫
৮৯. হাদীসটির ব্যাপারে বিস্তারিত পড়ুন: সিলসিলাহ যঈফাহ, ৫৭

তাদের মাঝে বিদ্যমান মতপার্থক্য ও মতদ্বৈধ দূর করার একমাত্র উপায় হচ্ছে, দলিলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে দলিলের সাথে সামঞ্জস্য বিধানকে গ্রহণ করা আর অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিধানকে বর্জন করা। কিন্তু তারা এসব করবে না। তাদের মাঝে বিদ্যমান মতপার্থক্যকে ভিন্ন-ভিন্ন একাধিক শরীআত আখ্যা দেওয়ার মাধ্যমে তারা শরীআতকে অসঙ্গতিপূর্ণ ও পরস্পরবিরোধী হিসেবে চিত্রায়িত করেছে। আর এটাই প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট যে, তাদের এমন দাবি আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। তারা যদি কুরআনের ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা নিয়ে ভেবে দেখত-

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

> তারা কি কুরআন নিয়ে ভেবে দেখে না? কুরআন যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হতো, তবে নিঃসন্দেহে তারা তাতে অনেক বিরোধ পেত।[৯০]

এ আয়াত দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করছে যে, মতপার্থক্য বা ইখতিলাফ আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। তাহলে কীভাবে ইখতিলাফ অনুসরণীয় শরীআত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ রহমত হতে পারে!?

এ জাতীয় হাদীসের কারণে চার ইমামের পর থেকে শুরু করে আজ অবধি অধিকাংশ মুসলিম আকীদাহ ও আমলী অনেক মাসআলায় পরস্পরের মাঝে বিরোধ ও ইখতিলাফকে জিইয়ে রাখছে। অথচ তারা যদি মনে করত ইখতিলাফ বা মতপার্থক্য খারাপ ও অকল্যাণকর, যেমনটি ইবন আব্বাস প্রমুখ বলেছেন এবং অনেক আয়াত ও হাদীসে ইখতিলাফ বা মতপার্থক্যের নিন্দা করা হয়েছে-তাহলে তারা ইখতিলাফ বা মতপার্থক্য দূরে করে ঐকমত্যের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাত। এসব মতবিরোধপূর্ণ অধিকাংশ মাসআলায় দলিলের আলোকে তারা জানতে সক্ষম হতো কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল, কোনটা হক আর কোনটা বাতিল। এরপর তারা সেইসব মাসআলায় পরস্পরের সুধারণা পোষণ করত এবং ওজর খুঁজে বের করত। কিন্তু তাদের এসব করার কোনো প্রশ্নই আসে না। কারণ, তারা মনে করে ইখতিলাফই তো রহমত আর মাযহাবগুলোর মতপার্থক্য যেন ভিন্ন-ভিন্ন একাধিক শরীআত। তাদের মাযহাব কেন্দ্রিক মতপার্থক্যের প্রভাব ও পরিণাম কী তা দেখার জন্য কিছু মসজিদ ঘুরে আসুন। দেখবেন চার মাযহাবের লোকদের ভিন্ন-ভিন্নভাবে সালাত আদায়ের জন্যে সেসব মসজিদে চারটি মেহরাব প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

প্রত্যেক মাযহাব আলাদা আলাদা জামাআত করে। তারা তাদের মাযহাবের ইমামের পেছনে সালাত আদায় করার জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনে। দেখে মনে হয়, তারা যেন এক ধর্মের অনুসারী

৯০. সূরা নিসা, ৪:৮২

নয়, চার ধর্মের অনুসারী। আর তারা এমনটা তো করবেই। কারণ, তাদের আলেমগণই বলে দিয়েছেন, তাদের মাযহাবসমূহ ভিন্ন-ভিন্ন শরীআতের ন্যায়। তারা হরহামেশা এভাবে সালাত আদায় করেই চলেছে অথচ তারা জানে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

সালাতের ইকামত হয়ে গেলে ফরয সালাত ব্যতীত কোনো সালাত নেই।[৯১]

তারা মাযহাব রক্ষার্থে এসব হাদীসের বিরোধিতা করার অনুমতি দিয়ে রেখেছে। যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের তুলনায় তাদের মাযহাব বেশি আরাধ্য এবং অধিক সংরক্ষিত ও সঠিক।

মোটকথা, ইখতিলাফ বা মতবিরোধ ইসলামী শরীআতে নিন্দনীয়। অতএব, তা থেকে বেরিয়ে আসতে অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ওয়াজিব। কেননা তা মুসলিম উম্মাহ দুর্বল ও ভীতবিহ্বল জাতিতে পরিণত করার উপজীব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

তোমরা নিজেদের মাঝে বিরোধ করো না। অন্যথা তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে।[৯২]

তাই ইখতিলাফ ও মতবিরোধ নিয়ে হর্ষ-তৃপ্ত থাকা এবং তাকে রহমত অভিধা দেওয়া, সেসব আয়াতের বিরোধিতা করা, যেসব আয়াতে স্পষ্টভাবে তাকে নিন্দা করা হয়েছে। আর 'রহমত' অভিধা ব্যবহার করার পক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ ভিত্তিহীন হাদীস ছাড়া কোনো প্রমাণ নেই।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, সাহাবীগণ ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানব। অথচ তারা পরস্পর মতবিরোধ করেছেন। তাদের ক্ষেত্রেও কি উল্লিখিত নিন্দা প্রযোজ্য?

ইমাম ইবন হাযম রাহিমাহুল্লাহ এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, "সাহাবীদের ক্ষেত্রে হাদীসে উল্লিখিত নিন্দা কোনোভাবেই প্রযোজ্য নয়। তারা ছিলেন আল্লাহর রাস্তা এবং হক অনুসন্ধিৎসু। কল্যাণ অনুসন্ধিৎসু আর উত্তম নিয়তের বদৌলতে ভুল করলেও তারা এক নেকি পাবেন। তাদের ভুলের গুনাহ আল্লাহ তাদের থেকে অপসারণ করে নিয়েছেন। কেননা তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ও জেনেশুনে ভুল করেননি এবং হকের তালাশে সামান্য কসুর করেননি।

৯১. সহীহ মুসলিম, ১৫২৯
৯২. সূরা আনফাল, ৮:৪৬

ফলে তারা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে দ্বিগুণ নেকি পাবেন।”[৯৩] আর এ বিধান শুধু সাহাবীদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নয়; বরং কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুসলিমের জন্য প্রযোজ্য যাদের কাছে দ্বীনের কোনো কিছু অস্পষ্ট থাকবে। হাদীসের উল্লিখিত নিন্দা ও শাস্তি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের কাছে আল্লাহর রশি-কুরআন ও নবী ﷺ-এর বাণী-সুন্নাহ পৌঁছার পরও তা বর্জন করে এবং অমুক অমুককে আঁকড়ে ধরে; তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, যারা এসব করে অন্ধ তাকলীদকে অবলম্বন বানিয়ে ইখতিলাফ বা মতবিরোধকে ইচ্ছাকৃতভাবে জিইয়ে রাখে; গোঁড়ামি ও জাহিলিয়্যাতি অহমিকাকে প্রচার করে, ফিরকাবাজির অভিলাষে এবং কুরআন ও সুন্নাহর দাওয়াতকে বাধাগ্রস্ত করে। তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যাদের নীতি হচ্ছে, দলিল তাদের অনুকূলে হলে সে-দলিল গ্রহণ করা আর প্রতিকূলে জাহিলিয়্যাতকে আঁকড়ে ধরে কুরআন ও সুন্নাহকে পেছনে নিক্ষেপ করা। আর এরাই সেসব মতবিরোধকারী যাদের কুরআনে নিন্দা করা হয়েছে।

এখানে আরেক শ্রেণি রয়েছে যাদের দ্বীন এতটাই দুর্বল হয়ে গেছে এবং তাকওয়া এতটাই কমে গেছে যে, তাদের প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশির অনুকূলে হলে, তারা যে কারো মত ও ফাতাওয়া আনন্দচিত্তে গ্রহণ করে। কোনো আলেমের ফাতাওয়া ও মতে তারা সহজতা ও ছাড় পেলে তারা সেই ফাতাওয়া ও মত গ্রহণ করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কী বিধান দিয়েছেন, তারা তা জানার চেষ্টাও করে না।

ইমাম ইবন হাযম আলোচনার শেষে ফকীহদের কাছে পরিচিত অভিধা ‘আত-তালফীক’ নিয়ে আলোকপাত করেছেন। ‘আত-তালফীক’ হলো, প্রবৃত্তির তাড়নায় এবং ছাড় অনুসন্ধানের নিমিত্তে দলিল জানা ব্যতিরেকে কোনো আলেমের মত ও ফাতাওয়াকে গ্রহণ করা। ‘আত-তালফীক’-এর বৈধতার ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতদ্বৈধ থাকলেও বিভিন্ন কারণে নিঃসন্দেহে তা হারাম। সেসব কারণ এখানে আলোচনা করা সংগত নয়। যারা একে বৈধ বলেন, তারা একটি হাদীসকে নিজেদের অবলম্বন হিসেবে পেশ করেন। হাদীসটি হলো, ‘যে-ব্যক্তি কোনো আলেমের তাকলীদ করবে সে নিরাপদে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সমর্থ হবে।’ এ হাদীস দুর্বল।[৯৪] অতএব, যেদিন কোনো মাল ও সন্তানসন্তুতি কাজে আসবে না স্রেফ নিরাপদ ও বিশুদ্ধ অন্তর ছাড়া, সেদিন নাজাত-পরিত্রাণ পেতে চাইলে এসব হাদীস থেকে সতর্ক-সাবধান থাকুন।[৯৫]

---

৯৩. সহীহুল বুখারী, ৭৩৫২; সহীহ মুসলিম, ১৭১৬

৯৪. সিলসিলাহ যঈফাহ, ৫৫১; হাদীসটি মূলত ভিত্তিহীন।

৯৫. তুরাসুল আলবানী ফিল মানহাজ, ৬/৩৮৯-৩৯২

প্রশ্ন ৫০: আল্লাহ তাআলার অযুত প্রশংসা যে, অধুনা ইলমী পুনর্জাগরণের যুগ। বিশেষ করে যুবকদের মাঝে এ পুনর্জাগরণের ঢেউ উঠেছে। তবে এখানে একটি সমস্যাও পরিলক্ষিত হচ্ছে-একটি মাসআলাকে কেন্দ্র করে আলেমগণ একাধিক মতামত প্রদান করেন। ফলে যুবকেরা যেমন একদিকে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে, অপরদিকে তারা সিদ্ধান্তহীনতায়ও ভুগছে। এক্ষেত্রে যুবকদের অবস্থান কেমন হওয়া উচিত?

জবাব: বর্তমানে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অবস্থা ও সময়ের পরিবর্তনের ফলে বারবার এ প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। এর আগের সফরেও একাধিকবার এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি। এ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেসব যুবক, যাদের মাঝে এখনো ইবন আব্বাস, মুজাহিদ, মালিক প্রমুখ সালাফ থেকে প্রমাণিত সঠিক ইলমী মানহাজের ভিত রচিত হয়নি। সেই ইলমী মানহাজের ভিত হচ্ছে, 'নবী ﷺ-এর ব্যতীত কেউ নিঃশর্ত অনুসরণযোগ্য নয়; সবার কথা যেমন গ্রহণ করা যায় তেমন বর্জন করাও যায়।' আমাদের যেসব মুসলিম যুবক সঠিক জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী, তাদেরকে এ বাস্তবসম্মত মানহাজের কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে। মননে একথা শক্তভাবে গেঁথে নিতে হবে যে, শিরোধার্য তাই, যা আল্লাহ কিংবা তাঁর রাসূল বলেছেন।

সালাফদের মানহাজ প্রসঙ্গ আলোচনায় আমি বারবার এ বিষয়টি উল্লেখ করি। আল্লাহ তাআলার এ অমোঘ ঘোষণাও হৃদয়তন্ত্রীতে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। তিনি বলেন,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ

যদি তোমার রব ইচ্ছে করতেন তবে মানুষকে এক উম্মতে পরিণত করতেন। কিন্তু তোমার রব যার ওপর দয়া করবেন সে ব্যতীত তারা মতবিরোধ করতেই থাকবে। এ জন্যই তাদের তিনি সৃষ্টি করেছেন।[১৬]

তাই মতবিরোধ, চিন্তা-প্রতিচিন্তা ও মতপার্থক্য হবেই। এ থেকে বাঁচার ও পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। সৃষ্টিকুলের মাঝে এটাই আল্লাহর অমোঘ নীতি। আর আল্লাহর নীতির কোনো পরিবর্তন নেই। তবে হ্যাঁ, কোনো কোনো মতপার্থক্য ও মতদ্বৈধ নিন্দনীয় আর কোনো কোনো মতপার্থক্য ও মতদ্বৈধ নিন্দনীয় নয়। যেসব মতপার্থক্য ও মতদ্বৈধ নিন্দনীয় নয়, সেসব মতপার্থক্য ও মতদ্বৈধ আমাদের মেনে নিতে হবে। এ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

১৬. সূরা হূদ, ১১:১১৮-১১৯

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً

যদি তোমার রর ইচ্ছে করতেন তবে মানুষকে এক উম্মতে পরিণত করতেন।[৯৭]

আমাদের রব চাইলে সকল মানুষকে এক মানহাজের অনুসারী বানাতে পারতেন, সকলের বুঝ ও সমঝকে অভিন্ন করে দিতেন। এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সাহাবীগণ ছিলেন এর সবচেয়ে যোগ্য। কেননা তারা ছিলেন মানুষের মাঝে সর্বোত্তম দল, যেমনটি মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু আল্লাহর মহান কর্মকুশলতার কারণে তারাও মতবিরোধ করেছেন। অতএব, মতবিরোধ আল্লাহর অমোঘ বিধান। তবে কোনো মাসআলাকে কেন্দ্র করে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে মনোমালিন্য, মতবিরোধ ও তর্কাতর্কিতে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ। সালাফগণ এ থেকে অযুত মাইল দূরে ছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, পরবর্তীরা এতেই জড়িয়ে পড়েছে।

যুবকেরা যদি আল্লাহর এ অমোঘ নীতির কথা স্মরণে রাখে, তবে আলেমদের মতবিরোধ অবলোকন করে বিচলিত ও দ্বিধাগ্রস্ত হবে না। আর তারা যদি সঠিক মানহাজ; সালাফদের বুঝের আলোকে কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা-এ মানহাজের অনুসারী হয়, তবে বিচলিত ও দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। একে কেন্দ্র করে তারা ভুল বোঝাবুঝিরও মুখোমুখি হবে না। তারা মনে করবে এটাই আল্লাহর নীতি। সৃষ্টিকুলের মাঝে তা কার্যকর হবেই। অতএব, তারা যদি এ থেকে মুক্ত হতে চায়, তাহলে তারা যেন আহলুল ইলম-জ্ঞানীদের পথ ও মানহাজের অনুসরণ করে। আহলুল ইলম-জ্ঞানীদের পথ ও মানহাজের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন,

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তোমাদের প্রমাণ পেশ করো।[৯৮]

যুবকেরা যখন কোনো মাসআলায় সম্মানিত আলেমদের পরস্পর বিরোধী একাধিক মত ও ফাতাওয়ার সম্মুখীন হয় এবং মনে করে তারা জ্ঞান ও মর্যাদায় সমপর্যায়ের, তখন তারা বিচলিত ও হয়রান হয়ে পড়ে। তবে হ্যাঁ, যারা তেমন জ্ঞান রাখে না, তাদের বিচলিত ও হয়রান হওয়া কোনো অবাক করা বিষয় নয়। তাই বলে বিচলিত ও হয়রান অবস্থায় তাদের চলার কোনো সুযোগ নেই। এ সময় তাদের দায়িত্ব হচ্ছে, সরাসরি অথবা চিঠি বা মোবাইল কিংবা অন্য যে-কোনো মাধ্যমে সেসব আলেম থেকে স্ব-স্ব মতের পক্ষে দলিল চাইবে। তাদের থেকে

৯৭. প্রাগুক্ত
৯৮. সূরা বাকারাহ, ২:১১১

দলিল শোনার ও জানার পর দলিলবিহীনভাবে যাইদকে আমরের ওপর বা আমরকে যাইদের ওপর প্রাধান্য দেবে না। বরং দলিল জানার পর যার দলিলের প্রতি দুর্বলতা আসবে; যার দলিলে হৃদয়ে শীতলতা, প্রশান্তি অনুভব করবে, তার ফাতাওয়া ও মতের অনুসরণ করবে। এ জন্যই হয়তো নবী ﷺ বলেছেন,

اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ

তুমি তোমার অন্তরের কাছে ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করো, যদিও মানুষ তোমাকে ফাতাওয়া দেয়।[৯৯]

অতএব, সম্মানিত দুইজন আলেম থেকে দুইটি ফাতাওয়া ও মত পাওয়া গেলে তাদের থেকে দলিল জানার পর অন্তরের কাছে ফাতাওয়া তলব করতে হবে। অন্তর যে মত ও ফাতাওয়ার প্রতি দুর্বলতা অনুভব করবে, সে মত ও ফাতাওয়া গ্রহণ করলে আল্লাহর কাছে নিন্দনীয় হতে হবে না। এ নীতির বিপরীতে দলিলবিহীনভাবে কোনো ব্যক্তির পক্ষে গোঁড়ামি করা মুকাল্লিদদের পথ ও মানহাজ। আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদেরকে তাদের পথ ও মানহাজ থেকে পরিত্রাণ ও মুক্তি দিয়ে সিরাতুল মুস্তাকীমে অবিচল থাকার তাওফীক দেন। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন।[১০০]

প্রশ্ন ৫১: সহীহ হাদীসে এসেছে, প্রতি একশো বছরের মাথায় একজন মুজাদ্দিদের আগমন ঘটবে যিনি এই উম্মতের জন্য দ্বীনকে সংস্কার করবেন। (সুনানু আবী দাউদ, ৪২৯১) প্রশ্ন হচ্ছে, মুজাদ্দিদ হওয়ার জন্য কি শর্ত যে তাকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারী হতে হবে?

জবাব: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারী হওয়া অবশ্যই মৌলিক শর্ত। আমার কাছে এই প্রশ্নটা ঠিক তেমন, যেমন কেউ প্রশ্ন করল, 'মুজাদ্দিদ হওয়ার জন্য কি শর্ত যে তাকে মুসলিম হতে হবে?' যদিও আমি মনে করি, কেউ এমন প্রশ্ন করবে না। আমার বিশ্বাস এমন উদ্ভট প্রশ্ন কারো চিন্তায় উদয়ই হবে না।

মুজাদ্দিদ হওয়ার জন্য কি শর্ত যে তাকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারী হতে হবে?-এ প্রশ্ন কারো কারো মনে উদয় হয়েছে বলেই আজকে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। জবাব হচ্ছে, হ্যাঁ, অবশ্যই তাকে আহলুস সুন্নাহর অনুসারী হতে হবে। আমি বলছি না, তাকে

৯৯. সুনানুদ দারেমী, ২৫৭৫; সহীহুত তারগীব, ১৭৩৪
১০০. তুরাসুল আলবানী ফিল মানহাজ, ৬/৪২৭-৪২৯

আহলুস সুন্নাহর একজন আলেম হতে হবে। তিনি হবেন, আহলুস সুন্নাহ মানহাজের পথিক। আমাদের সালাফগণ যে পথ ও পদ্ধতিতে চলেছেন, তিনি সে পথ ও পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হবেন না। যদিও প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়নি তারপরও প্রাসঙ্গিকভাবে একথা বলে দেওয়া ভালো যে, স্রেফ তাকে দ্বীনের মুজাদ্দিদ হতে হবে-এটি শর্ত নয়। বরং মুসলিমদের জন্য যা কল্যাণকর তাতেই একজন ব্যক্তি মুজাদ্দিদ হতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, কেউ ইতিহাসশাস্ত্রে মুজাদ্দিদ হতে পারেন। আবার কেউ চিকিৎসাবিজ্ঞানে মুজাদ্দিদ হতে পারেন। তবে শর্ত হচ্ছে, তাকে অবশ্যই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারী হতে হবে।

অতএব, শেষে আমরা বলতে পারি, একযুগেই একাধিক মুজাদ্দিদ হতে পারেন। আমরা যদি মুজাদ্দিদ শব্দটিকে এমন বিস্তৃত অর্থে গ্রহণ করি, তাহলে বলতে পারি যে, একই যুগে ও একই শতাব্দীতে বিভিন্ন শাস্ত্রে একাধিক মুজাদ্দিদের আবির্ভাব ঘটা খুবই সম্ভব।[১০১]

প্রশ্ন ৫২: আমরা এমন কিছু যুবক দেখতে পাই, যারা কোনো একজন আলেম থেকে দ্বীন শেখে। আরেক শ্রেণির যুবককে দেখা যায়, তারা অন্য কোনো আলেম থেকে দ্বীন শেখে। পরবর্তীতে দেখা যায় তারা দল ও ফিরকায় পরিণত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রেণি তাদের নির্দিষ্ট আলেমকে নিয়ে দল বানিয়ে ফেলে। তারা শত্রুতা-মিত্রতা মানদণ্ড হিসেবে তার নির্ধারণ করে সেই আলেমকে। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কী?

জবাব: অবশ্যই এ ধরনের কর্মকাণ্ড ইসলামে বৈধ নয়। আমরা সবসময় বলে আসছি, ইসলামে দলাদলির কোনো স্থান নেই। এমন গোঁড়ামি ও পক্ষাবলম্বন ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। কেননা এর মাধ্যমে একদল অমুক আলেমের ব্যক্তিমতামতকে আঁকড়ে ধরে, অন্যদল তমুক আলেমের ব্যক্তিমতামতকে আঁকড়ে ধরে। নবী-রাসূলদের মতো অমুক বা তমুক আলেম নির্ভুল নন। এজন্য মুসলিম সমাজ হবে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও হিতাকাঙ্ক্ষী মানসের। তারা দুনিয়ার কোনো ব্যক্তির অন্ধ অনুসারী হবে না, করবে না কারো পক্ষে গোঁড়ামি। অন্ধ অনুসরণ ও গোঁড়ামির একমাত্র অধিকারী ও যোগ্য হলেন মুহাম্মাদ ﷺ। আলেমের ব্যাপারে একজন মুসলিমের অবস্থান হবে এমন-সে দুনিয়াবিমুখ ও অদরবারি আলেমের ইলমের ওপর আস্থা রাখবে। কেননা দুনিয়া ও দরবার আলেমকে তার দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত করে ফেলে। অতএব, যে-কেউ দেখবে এ আলেম অমুক আলেম থেকে বেশি জ্ঞানী ও মুত্তাকী, তখন তার থেকে দ্বীন শিখতে ও তার মত গ্রহণ করতে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। তবে এ আলেমের কারণে অন্য কোনো আলেমকে বা অন্য কোনো আলেমের অনুসারীকে খারাপ বলা যাবে না, কোনো ধরনের কটু

১০১. তুরাসুল আলবানী ফিল মানহাজ, ৬/৪৭৫-৪৭৬

মন্তব্য করা যাবে না। তারা হবে একে-অপরের হিতাকাঙ্ক্ষী ও কল্যাণকামী। একজন মুসলিম অন্যজন মুসলিমের কল্যাণ কামনা করবে। যদি দেখে একজন আলেম অন্য আলেমের তুলনায় বেশি জ্ঞান রাখেন, বেশি দলিল-প্রমাণ নির্ভর কথা বলেন, দলিল-আদিল্লাকে বেশি প্রাধান্য দেন-তারপরও দুজনের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার করবে, কারো সাথে শত্রুতা করবে না। মনে রাখতে হবে, ইসলাম স্পষ্টভাবে দলাদলি ও হিযবিয়্যাতকে হারাম ঘোষণা করেছে। আলেম কেন্দ্রিক যুবকদের এমন অবস্থান ফিরকা, শত্রুতা ও বিদ্বেষকে উসকে দেয়। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣١) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٣٢)

তোমরা মুশরিকদের মতো হয়ো না, যারা নিজেদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দল নিজেদের মত নিয়ে আনন্দিত।[১০২]

সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা পরস্পরে বিদ্বেষপোষণ করো না, পরস্পরের দোষ অন্বেষণ করো না বরং আল্লাহর আদেশমতো ভাই ভাই হিসেবে বসবাস করো।[১০৩] প্রত্যেক মুসলিমকে এভাবে বসবাস করতে হবে; বিশেষ করে সেই সমাজে, যে সমাজ মুসলিমদেরকে নিজেদের দ্বীন ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে বদ্ধ পরিকর।[১০৪]

প্রশ্ন ৫৩: অশ্লীল ছবি, মিথ্যা সংবাদ কিংবা ফাসিকদের প্রশংসা করা হয় এমন পত্রপত্রিকা বিক্রি করা যাবে কি? অথবা এমন বই বিক্রি করা যাবে কি, যে বইয়ে সালাফদের পরিপন্থি ও ভ্রান্ত আকীদাহর উল্লেখ রয়েছে?

জবাব: যেসব পত্রপত্রিকায় অশ্লীল ছবি থাকে সেসব পত্রপত্রিকা বিক্রি করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকা জায়েয নয়। এমন পত্রিকা বিক্রি করা হারাম। আর অন্যান্য মতাদর্শ ফিকহের কিতাবের হুকুম হচ্ছে, যে-ব্যক্তি শরীআতের সীমা জানতে চায়, তাকে সেসব কিতাবে যে মতাদর্শ, বিধান ও চিন্তাচেতনা আছে, তা জানা ওয়াজিব। অতএব, অধিকাংশের ওপর ভিত্তি করে হুকুম অর্পিত হবে। যদি সেসব কিতাবের অধিকাংশ সঠিক থাকে তাহলে বিক্রি করা যাবে, অন্যথা ব্যাপকভাবে বিক্রি করার কথা বলা যাবে না। আল্লাহর কিতাব ছাড়া মুসলিম ব্যক্তি এমন কোনো কিতাব পাবে না যাতে কোনো ভুল নেই। তাই যদি বলা হয়, যে কিতাবে

১০২. সূরা রূম, ৩০:৩১-৩২
১০৩. সহীহ মুসলিম, ৬৪২০
১০৪. তুরাসুল আলবানী ফিল মানহাজ, ৭/১৩৫-১৩৬

ভুল রয়েছে সে কিতাব বিক্রি করা যাবে না, তখন কোনো কিতাবই বিক্রি করা যাবে না। তাই বিষয়টা অধিকাংশের দৃষ্টিতে দেখতে হবে।[১০৫]

প্রশ্ন ৫৪: ইন্টারভিউ কিংবা পরীক্ষায় অনেক সময় আহলুস সুন্নাহর আকীদাহ পরিপন্থি প্রশ্ন করা হয়। এক্ষেত্রে করণীয় কী?

জবাব: আহলুস সুন্নাহর আকীদাহ তুলে ধরতে হবে। বাতিল আকীদাহ উল্লেখ করা যাবে না। এক্ষেত্রে আমাদের আদর্শ বিলাল ﷺ। তিনি জীবনমরণ সন্ধিক্ষণেও বাতিল আকীদাহ মুখে উচ্চারণ করেননি; বরং আল্লাহর একত্বের ঘোষণা দিয়ে গেছেন। স্মরণ রাখতে হবে, কর্মক্ষেত্র ও জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর হাতে। বাতিল আকীদাহ উল্লেখ করলেই যে কর্মক্ষেত্র ও জীবিকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে, তা নিশ্চিত নয়। মানুষকে চেষ্টা করতে হবে। 'চেষ্টা করা' কেবল একটি মাধ্যম। সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

যে-ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহই তার পথ খুলে দেন এবং তাকে তার অকল্পনীয় পদ্ধতিতে জীবিকার ব্যবস্থা করে দেন[১০৬]।[১০৭]

---

১০৫. মাজাল্লাতুত তাওহীদ, দশম সংখ্যা, ১৪২০
১০৬. সূরা তালাক, ৬৫:২-৩
১০৭. তুরাসুল আলবানী ফিল আকীদাহ, ১/২০৭

অধ্যায়: তিন

পবিত্রতা

প্রশ্ন ৫৫: কতটুকু নাপাকি লাগলে তা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব?

জবাব: একটি হাদীসে রয়েছে, 'এক দিরহাম পরিমাণ রক্ত লাগলে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে।' এই হাদীস হানাফীদের দলিল। তারা এ হাদীসের কারণে বলে এক দিরহাম পরিমাণ নাপাকি লাগলে তা নাপাক বলে গণ্য হবে। তবে এটি একটি জাল হাদীস। অতএব, এক দিরহাম পরিমাণ শর্ত করা অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল। কাজেই এক দিরহামের কম নাপাকি লাগলেও তা দূর করা ওয়াজিব। কেননা, যেসব হাদীসে নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জনের আদেশ দেওয়া হয়েছে সেসব হাদীসে এমন কোনো শর্ত করা হয়নি।[১০৮]

প্রশ্ন ৫৬: আবু হুরাইরাহ ﷺ এক বা দুই ফোঁটা রক্ত বের হলে কিছু মনে করতেন না। এ আসার থেকে কি প্রমাণ হয় না, সালাত অবস্থায় বেশি রক্ত বের হলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে?

জবাব: এ আসারটি দুর্বল। তা ছাড়া তা আবু হুরাইরাহ ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত অন্য আরেকটি আসার বিরোধী। আবু হুরাইরাহ ﷺ বলেন, [হাদাস ছাড়া অন্য কিছুতে] অজু নষ্ট হয়ে যাওয়া ব্যতীত কোনো অজু নেই। [বুখারী, ১৭৬ এর আগে] এ আসারটি ইমাম বুখারী মুআল্লাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর ইসমাঈল কাযী মুত্তাসিল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি ইবন হাজার আসকালানী উল্লেখ করেছেন। মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বায়ুর আওয়াজ অথবা গন্ধ পাওয়া ছাড়া অজু নেই।[১০৯]

এ ছাড়া উল্লিখিত আসারটি এক আনসার সাহাবীর ঘটনার সাথে সাংঘর্ষিক। ঘটনাটি হচ্ছে, এক আনসার সাহাবী রাতের সালাতে দাঁড়ান। এক মুশরিক তাকে লক্ষ্য করে তির ছুড়ে। তিরটি তার দেহে বিদ্ধ হয়। তিনি তা বের করে নেন। এভাবে সেই মুশরিক তাকে তিনটি তির ছুড়ে মারে। এরপরও তিনি রুকু, সিজদাহ ও সালাতের অন্যান্য কার্যাবলি অব্যাহত রাখেন অথচ

১০৮. সিলসিলাতুয যঈফাহ, ১৪৯

১০৯. সহীহুল বুখারী, ১৭৭; সহীহ মুসলিম, ৩৬১, ৩৬২

ফিনকি দিয়ে তখনো তার রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল।[১১০] এটি হুকুমগত মারফূ হাদীস। কেননা নবী ﷺ এ ঘটনা জানবেন না, তা হতেই পারে না। অতএব, বেশি রক্ত বের হওয়ার কারণে অজু নষ্ট হয়ে গেলে নবী ﷺ তাকে অবহিত করতেন। কারণ, ফিকহী মূলনীতি হচ্ছে, প্রয়োজনের সময় বিধান না জানানো বৈধ নয়।

আমরা যদি মেনেও নিই তিনি ঘটনাটি জানতেন না, তবু তো আল্লাহর কাছে অজানা ছিল না। আসমান ও জমিনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় তাঁর অজানা নয়। যদি রক্তের কারণে অজু ভেঙে যেত বা নাপাক হয়ে যেত, তাহলে তিনি অবশ্যই তাঁর নবীর কাছে ওহী করে জানিয়ে দিতেন। এ বিষয়টি কারো কাছে গোপন থাকার কথা নয়।

রক্তের কারণে অজু ভাঙবে না এটি ইমাম বুখারীর মত, যা মুআল্লাক সূত্রে কিছু আসার থেকে প্রমাণিত হয়। এমনটি দাবি করেছেন ইবন হাজার আসকালানী তার 'ফাতহুল বারী'তে। ইমাম ইবন হাযমেরও একই মত।[১১১]

প্রশ্ন ৫৭: মদ কি নাপাক, না নাপাক নয়?

জবাব: কুরআন ও সুন্নাহর এমন কোনো দলিল পাওয়া যায় না, যা প্রমাণ করে, মদ নাপাক। এ কারণে একদল আলেমের মতে মদ পবিত্র বস্তু। কেননা কোনো বস্তু খাওয়া হারাম হলেই তা নাপাক হয়ে যায় না। এ মতের পক্ষে রয়েছেন লাইস ইবন সা'দ, রবীআতুর রায় প্রমুখগণ। ইমাম কুরতুবী তার তাফসীরে আরও অনেকের নাম উল্লেখ করেছেন যাদের মতে মদ নাপাক নয়। এটাই ইমাম শাওকানীর মত। অতএব, কোথাও মদ লাগলে তা ধোয়া আবশ্যক নয়।[১১২]

প্রশ্ন ৫৮: মৃতপ্রাণীর চামড়া পবিত্র না অপবিত্র?

জবাব: মৃতপ্রাণীর চামড়া অপবিত্র হওয়ার পক্ষে প্রসিদ্ধ অনেক হাদীস রয়েছে। যেমন, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ

চামড়া পাকানো বা প্রক্রিয়াজাত করা হলে পবিত্র হয়ে যায়।[১১৩]

১১০. সুনানু আবী দাউদ, ১৯৮
১১১. তামামুল মিন্নাহ, পৃ. ৫১
১১২. সিলসিলাতুয যঈফাহ, ১২৮৯
১১৩. সহীহ মুসলিম, ৬৯৮

এ প্রসঙ্গে মায়মুনা ﷺ'র দাসীর একটি ছাগলের ঘটনা উল্লেখ করা হয়। ঘটনাটি ইবন আব্বাস ﷺ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

هَلَّا أَخَذُوْا إِهَابَهَا فَدَبَغُوْهُ فَانْتَفَعُوْا بِهِ

তারা কেন তার চামড়া নিয়ে পাকিয়ে বা প্রক্রিয়াজাত করে উপকৃত হলো না![১১৪]

এ হাদীস থেকে প্রতিভাত হয় যে, চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পূর্বে ব্যবহার করা যাবে না। প্রক্রিয়াজাত করার পর ব্যবহার করা বৈধ।[১১৫]

প্রশ্ন ৫৯: বমি কি সর্বসম্মতিক্রমে অপবিত্র বস্তু?

জবাব: ইমাম ইবন হাযমের মতে, বমি অপবিত্র নয়। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, মুসলিমদের বমি পবিত্র। বিস্তারিত জানতে দেখুন 'আল-মুহাল্লা'। ইমাম শাওকানী তদীয় 'আদ-দুরারুল বাহিয়্যাহ' ও ইমাম সিদ্দীক হাসান খান তদীয় 'রওজাতুন নাদিয়্যাহ' গ্রন্থে পবিত্র হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। তারা বমিকে অপবিত্র বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করেননি। আর এটি গ্রহণযোগ্য মত। তারা উভয়ে বলেন, 'বমি পবিত্র হওয়া, না হওয়া নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।' এরপর তারা পবিত্র হওয়ার মতকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন, 'মূলনীতি হচ্ছে মৌলিকভাবে সবকিছু পবিত্র, যতক্ষণ না নাপাক হওয়ার পক্ষে প্রমাণ থাকে। অতএব, বমি পবিত্র হিসেবে গণ্য হবে যতক্ষণ না নাপাক হওয়ার পক্ষে সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায়।'[১১৬]

প্রশ্ন ৬০: কেউ যদি কোনো পানি অজু বা ফরজ গোসলে ব্যবহার করে, তাহলে তার ব্যবহৃত পানি পবিত্র থাকবে না কি অপবিত্র হয়ে যাবে?

জবাব: ব্যবহৃত পানি অপবিত্র হয় না; বরং ব্যবহারের পরও তা পবিত্র থাকে। এ প্রসঙ্গে অনেক হাদীস এসেছে। যেমন, জাবির ﷺ বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَعُودُنِى وَأَنَا مَرِيضٌ لاَ أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَىَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ

আমি অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখতে আসেন। তখন আমার জ্ঞান ছিল না। তিনি

১১৪. সহীহ মুসলিম, ৬৯৫
১১৫. তামামুল মিন্নাহ, পৃ. ৫০
১১৬. তামামুল মিন্নাহ, পৃ. ৫৩

অজু করে তাঁর অজুর পানি আমার ওপর ছিটিয়ে দেন। ফলে (মুহূর্তেই) আমার জ্ঞান ফিরে আসে।[১১৭]

হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনায় আমরা দেখতে পাই, সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কফ ফেলামাত্রই সাহাবীগণ হাতের তালুতে তা নিয়ে নিতেন এবং তাদের চেহারা ও মুখে মেখে নিতেন। অনুরূপভাবে তিনি অজু করলে তাঁর অজুর পানি নেওয়ার জন্য তারা প্রতিযোগিতা করতেন এবং এতে লড়াই লাগার পর্যায়ে উপনীত হতেন।

হুযাইফাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ

একজন মুসলিম নাপাক হয় না।[১১৮]

এ ছাড়া আরও বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা ﷺ'র অতিরিক্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন। ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, একটি বড়ো পাত্রে নবী ﷺ-এর কোনো এক স্ত্রী গোসল করেন। তিনি সেই পানিতে অজু করতে চাইলেন। তা দেখে সেই স্ত্রী বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো অপবিত্র ছিলাম। জবাবে নবীজি বলেন, পানি অপবিত্র হয় না[১১৯]।[১২০]

প্রশ্ন ৬১: কেমিক্যাল মিশ্রিত প্রবাহিত পানি অথবা খেতখামারে প্রবাহিত পানি কাপড়ে লাগলে কি কাপড় নাপাক হয়ে যাবে? এরূপ পানিতে অজু করা কি বৈধ?

জবাব: পানি তখন নাপাক হয়, যখন তাতে কিছু মিশ্রণের ফলে তার মৌলিক অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়। স্বাদ, ঘ্রাণ ও রং-পানির এ তিন মৌলিক অবস্থার কোনো অবস্থা পবির্তন হলে পানি নাপাক হয়। কোনো পানির স্বাদ বা ঘ্রাণ বা রং পরিবর্তন নাহলে সেই পানি পবিত্র বলে গণ্য হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

পানি পবিত্র। পানিকে কোনো কিছু অপবিত্র করতে পারে না।[১২১]

---

১১৭. সহীহুল বুখারী, ১৯৪; সহীহ মুসলিম, ৪০৪০
১১৮. সহীহ মুসলিম, ৩৭২
১১৯. সুনানু আবী দাউদ, ৬৮; সুনানুত তিরমিযী, ৬৫, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
১২০. আস-সামারুল মুস্তাতাব, ১/৫
১২১. সুনানু আবী দাউদ, ৬৬, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন

এই হাদীসটি 'দুই কুল্লা'[১২২] সংক্রান্ত হাদীসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অতএব, পানি দুই কুল্লার কমও হলে আর তাতে অপবিত্র কোনো কিছু মিশ্রিত হওয়ার পরও যদি পানির তিন অবস্থার কোনো পরিবর্তন না হয়, তবে সেই পানি পবিত্র থাকবে, নাপাক হবে না। অনুরূপভাবে দুই কুল্লার বেশি পানিতেও নাপাক কোনো কিছু মিশ্রণের ফলে পানির কোনো অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেলে সেই পানি নাপাক হয়ে যাবে।[১২৩]

প্রশ্ন ৬২: খোলা জায়গায় কিংবা প্রাচীরের ভেতরে কিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করার বিধান কী?

জবাব: প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে, খোলা জায়গা অথবা প্রাচীরের ভেতর, কোনো অবস্থায়ই কিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করা যাবে না।[১২৪] আবু আইউব আনসারী ﷺ থেকে বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী ﷺ বলেন,

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى

তোমরা প্রয়োজন পূরণের জন্য গেলে কিবলাকে সামনে ও পেছনে করবে না; বরং পূর্ব-পশ্চিমে করবে। আবু আইউব ﷺ বলেন, আমরা সিরিয়া এসে দেখলাম পায়খানাগুলো কিবলামুখী করে নির্মিত। তখন আমরা পরিবর্তন করে বসি এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।[১২৫]

উল্লিখিত হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু আইউব আনসারী ﷺ। আর তিনি বুঝেছেন, এই হাদীস খোলা বা প্রাচীর বেষ্টিত সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ কারণে তিনি বলেন, 'আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।'

এ ছাড়াও আরও দলিল রয়েছে যা এই মতকে শক্তিশালী করে। হাদীসে নবী ﷺ কিবলার দিকে থুথু ফেলতে নিষেধ করেছেন।[১২৬] এক ব্যক্তি কিবলার দিকে থুথু ফেললে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তা থেকে নিষেধ করেন। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সেই ব্যক্তি প্রাচীর বেষ্টিত জায়গায় সালাত

---

১২২. ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পানির কলস বা মটকাকে 'কুল্লা' বলা হয়। যাতে পানি রেখে, তা পান করা হয়। তিরমিযি, ৬৭ নং হাদীসের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১২৩. ফাতাওয়াল ইমারাত, ৫৯-৬০

১২৪ এটা ইমাম আহমাদের মত। যেমনটা ইমাম তিরমিযি উল্লেখ করেছেন। সুনানুত তিরমিযী, ৮নং হাদীসের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১২৫. সহীহুল বুখারী, ৩৯৪

১২৬. সহীহুল বুখারী, ৪০৫; সহীহ মুসলিম, ৫৪৭, ৫৫০; সুনানু আবী দাউদ, ৩৮২৪

আদায় করছিল। আর এ কথা প্রত্যেক বিচক্ষণ ও সমঝদার ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, কিবলার দিকে পেশাব-পায়খানা করার চেয়ে থুথু ফেলা অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর অন্যায়। তিনি কিবলার দিকে থুথু ফেলতে নিষেধ করলে কিবলার দিকে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করবেন না, তা হতে পারে না।[১২৭]

প্রশ্ন ৬৩: আয়েশাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন অথচ অন্য হাদীসে আমরা পাই, স্বয়ং তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন! উভয়ের হাদীসের মাঝে সমন্বয় কী?

জবাব: আয়েশাহ ﷺ বা অন্য কারো থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। সুনানু ইবন মাজাহতে ইবন উমার ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لاَ تَبُلْ قَائِمًا

তুমি দাঁড়িয়ে পেশাব করবে না।[১২৮]

কিন্তু এ হাদীসটি দুর্বল। আর আয়েশাহ ﷺ'র হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক কোনো নিষেধাজ্ঞার কথা পাওয়া যায় না। সেই হাদীসে রয়েছে, আয়েশাহ ﷺ বলেন,

مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقْهُ

যে-ব্যক্তি তোমাকে বলবে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, তুমি তাকে বিশ্বাস করবে না।[১২৯]

এই হাদীস থেকে সর্বোচ্চ বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাঁড়িয়ে পেশাব করার কথা আয়েশাহ ﷺ জানতেন না। তিনি যা জানতেন তাই বর্ণনা করেছেন।

হুযাইফাহ ﷺ থেকে বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত,

أَتَى رَسُولُ اللهِ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক গোত্রের ময়লার স্তুপের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন।[১৩০]

১২৭. ফাতাওয়ার ইমারাত, ৬০-৬১
১২৮. সুনানু ইবন মাজাহ, ৩০৮
১২৯. সুনানুত তিরমিযী, ১২; সুনানু ইবন মাজাহ, ৩০৭, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন
১৩০. সহীহুল বুখারী, ২২৪; সহীহ মুসলিম, ২৭৩

এরূপ দুটি হাদীস বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী হলে তার সমন্বয় পদ্ধতি সম্পর্কে ফকীহগণ বলেন, 'যদি দুটি দলিল পরস্পর বিরোধী হয় যার একটি হ্যাঁ-বোধক আর অন্যটি না-বোধক, তাহলে না-বোধকের ওপর হ্যাঁ-বোধক প্রাধান্য পাবে। কেননা নাকচকারী যা জানে না, সাব্যস্তকারী তা জানে বলেই সাব্যস্ত করে।'

তাহলে দাঁড়িয়ে পেশাব করার বিধান কী? পেশাব দাঁড়িয়ে করা উত্তম না কি বসে, এ ব্যাপারে শরীআতে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। পেশাব সংক্রান্ত যা পাওয়া যায় তা হলো, কেউ পেশাব করলে পেশাব পতিত হওয়ার স্থান থেকে যেন সে দূরত্ব বজায় রাখে; যাতে পেশাবের ছিঁটা তার গায়ে-কাপড়ে না লাগে। এখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করা উত্তম না কি বসে, তার নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি। যে ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হলো, তোমরা পেশাব থেকে বেঁচে থাকো। অর্থাৎ পেশাবের সময় তোমরা এমন পদ্ধতি অবলম্বন করো যেন তোমরা পেশাবের ছিঁটা থেকে পরিত্রাণ পাও।[১৩১]

আর উল্লিখিত ঘটনা ছাড়া আমরা এমন কোনো সাহাবী পাইনি যিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন-এর মানে এই নয় যে, তিনি আর কখনো দাঁড়িয়ে পেশাব করেননি। কেননা তিনি কীভাবে পেশাব করছেন তা জানতে উদগ্রীব থাকা কোনো সাহাবীর জন্য মানানসই নয়। অতএব, আমরা বলব, হুযাইফাহ ﵁'র হাদীস থেকে প্রমাণ হয় তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। এ হাদীস থেকে যেমন প্রমাণ হয় না, তিনি এ পদ্ধতিতে আরেকবার পেশাব করেছেন, তেমন প্রমাণ হয় না এ পদ্ধতিতে কিংবা অন্য পদ্ধতিতে তিনি আর পেশাব করেননি।[১৩২]

প্রশ্ন ৬৪ : কাপড়ে বীর্য বা মাযী[১৩৩] বা ওয়াদী[১৩৪] লাগলে সেই কাপড়ে সালাত হবে কি?

জবাব: বীর্য অপবিত্র হওয়ার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। ইমাম ইবনুল কাইয়িম 'ইলামুল মুওয়াক্কিঈন' গ্রন্থে এ মাসআলা নিয়ে লম্বা আলোচনা করেছেন। যারা একে অপবিত্র বলে তিনি তাদের সমালোচনা করেছেন এবং তাদের মতের ব্যবচ্ছেদ করেছেন। যারা বলেছেন, বীর্য পবিত্র তাদের মত প্রাধান্যযোগ্য এবং দলিল নির্ভর। অতএব, কোনো কাপড়ে বীর্য লাগলে সেই কাপড়ে সালাত আদায় বৈধ ও শুদ্ধ হবে। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাস্তব আমলের অনুসরণ বেশি উত্তম। তাঁর আমল ছিল, কোনো কাপড়ে বীর্য লেগে শুকিয়ে গেলে তা আঙুল দিয়ে

১৩১. সহীহুল বুখারী, ২১৬; সহীহ মুসলিম, ২৯২

১৩২. ফাতাওয়াল ইমারাহ, ৬১-৬৩

১৩৩. সঙ্গমচিন্তা বা উত্তেজনাকর যৌন মেলামেশার সময় লিঙ্গাগ্র দিয়ে নির্গত আঠালো পানিকে মাযী বলা হয়।—সংকলক

১৩৪. প্রস্রাবের আগে-পরে লিঙ্গাগ্র দিয়ে নির্গত শুভ্র বর্ণের গাঢ় ঘোলাটে পানিকে ওয়াদী বলা হয়।—সংকলক

উঠিয়ে ফেলে সেই কাপড়ে সালাত আদায় করতেন।[১৩৫] আর তা ভেজা ও তরল থাকলে ঘাস জাতীয় কোনো কিছু দিয়ে ঘষে ফেলতেন।[১৩৬]

তবে মাযী ও ওয়াদী নাপাক। তাই পেশাবের মতো উভয়কে পবিত্র করা ওয়াজিব।[১৩৭]

প্রশ্ন ৬৫: কেউ ঘুম থেকে জাগার পর যদি কাপড় ভেজা অবস্থায় পায় কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ না হয়, তাহলে তার ওপর কি গোসল ওয়াজিব?

জবাব: কেউ যদি ঘুম থেকে জাগার পর বীর্য-এর মাধ্যমে কাপড় ভেজা পায়, তাহলে গোসল করা ওয়াজিব; স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ হোক বা না হোক।[১৩৮]

প্রশ্ন ৬৬: 'পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কুরআন স্পর্শ করবে না'-একথা দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ কী বুঝিয়েছেন?

জবাব: এ হাদীস আমি 'সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। একাধিক সনদের ভিত্তিতে এ হাদীসটি সহীহ।[১৩৯]

সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত আছে, একদিন রাসূলুল্লাল্লাহ ﷺ কিছু সাহাবীর নিকট আসেন। তাদের একজন ছিলেন আবু হুরাইরাহ ﷺ। অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, হুযাইফাহ ﷺ-ও ছিলেন তাদের মাঝে। একপর্যায়ে আবু হুরাইরাহ মজলিস থেকে বেরিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর আবার মজলিসে আগমন করেন। সে-সময় তার মাথা দিয়ে পানি পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এভাবে মজলিস থেকে চলে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করেন। জবাবে তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি অপবিত্র ছিলাম।' আবু হুরাইরাহ ﷺ বোঝাতে চেয়েছিলেন, অপবিত্র অবস্থায় আপনার মজলিসে বসা এবং আপনার সঙ্গে মুসাফাহা করা আমার জন্য ছিল ভীতিকর। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'সুবহানাল্লাহ! মুমিন কখনো নাপাক হয় না।'[১৪০]

'পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কুরআন স্পর্শ করবে না'-একথা দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝিয়েছেন, শুধু মুমিন ব্যক্তি কুরআন স্পর্শ করবে, তাতে সে ছোটো অপবিত্র অবস্থায় থাকুক অথবা বড়ো অপবিত্র

১৩৫. সহীহ মুসলিম, ২৮৮, ২৮৯
১৩৬. সুনানুত তিরমিযী, ১১৭ নং হাদীসের আলোচনা দ্রষ্টব্য
১৩৭. ফাতাওয়াল ইমারাহ, ৬৭
১৩৮. সুনানুত তিরমিযী, ১১৩; ফাতাওয়াল ইমারাহ, ৯০
১৩৯. ইরওয়াউল গালীল, ১২২
১৪০. সহীহুল বুখারী, ২৮৩; সহীহ মুসলিম, ৭১০

অবস্থায় থাকুক। এমন কোনো স্পষ্ট দলিল পাওয়া যায় না, যাতে ছোটো বা বড়ো অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।[১৪১]

প্রশ্ন ৬৭: অজু ছাড়া নারী-পুরুষ কি কুরআন স্পর্শ করতে ও তিলাওয়াত করতে পারবে?

জবাব: অজু ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয। অজু ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে না মর্মে কুরআন ও সুন্নাহর কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই। আর এক্ষেত্রে নারী পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। অজু ও অজুবিহীন পুরুষ কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে, অনুরূপ হায়েয ও হায়েযবিহীন নারী কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে। এর প্রমাণ হচ্ছে, আয়েশাহ ﷺ থেকে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস,

.كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

নবী ﷺ সর্বক্ষণ আল্লাহর যিকির করতেন।[১৪২]

হায়েযওয়ালী মহিলার ক্ষেত্রে শরীআতের বিধান হচ্ছে, সে সালাত আদায় করবে না। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত শরীআত। এর পেছনে হিকমত ও উদ্দেশ্য কী, তা আমরা ওয়াকিবহাল নই। যেহেতু কুরআন তিলাওয়াত করতে শরীআত নিষেধ করেনি, তাই তা নিষেধ করে তাদের ইবাদতের সীমা সংকীর্ণ করা আমাদের জন্য জায়েয নয়। আল্লাহ যেহেতু ছাড় দিয়েছেন এবং প্রশস্ততা প্রদান করেছেন, তাই আমাদেরকেও ছাড় দিতে হবে এবং প্রশস্ততা প্রদান করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে অনেকে আয়েশাহ ﷺ'র ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি নবী ﷺ-এর সাথে হজে বের হন। মক্কার অদূরে 'সারাফ' নামক স্থানে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখেন আয়েশাহ ﷺ হায়েযের কারণে কাঁদছে। তিনি আয়েশাহ ﷺ-কে বলেন,

وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلاَ تُصَلِّي

একজন হাজী যা করে তুমিও তাই করবে; তবে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করবে না এবং সালাত আদায় করবে না।[১৪৩]

---

১৪১. ফাতাওয়াল ইমারাহ, ৭৭
১৪২. সহীহ মুসলিম, ৩৭৩
১৪৩. সুনানু আবী দাউদ, ১৭৮৬, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

এখানে কিন্তু নবী ﷺ তাকে কুরআন তিলাওয়াত করতে এবং মসজিদে হারামে প্রবেশ করতে নিষেধ করেননি।[১৪৪]

প্রশ্ন ৬৮: কেউ যদি সূর্য উদিত হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে অপবিত্র অবস্থায় জাগ্রত হয়। গোসল করতে গেলে সূর্য উদিত হয়ে ফজরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সে কি তায়াম্মুম করতে পারবে?

জবাব: আমি মনে করি, এটি একটি সূক্ষ্ম প্রশ্ন। ঐ ব্যক্তি প্রথমে গোসল করবে, যদিও গোসল করতে গিয়ে সূর্য উদিত হয়ে যায়। সূর্য উদিত হয়ে গেলেও সে পাপী বলে গণ্য হবে না। তবে তার ব্যাপারটি ভিন্ন, যে সূর্য উদিত হওয়ার আধঘণ্টা আগে জাগ্রত হয়েছে। তারপর এটা-সেটা করতে গিয়ে কালক্ষেপণ করতে করতে সূর্য উদয়ের আর মাত্র পাঁচ মিনিটি বাকি আছে। এরপর তার গোসল করতে গিয়ে সূর্য উদয় হয়ে যায়।

এ কারণে আমি বললাম, আপনার প্রশ্নটি বেশ সূক্ষ্ম। তো অবহেলাবশত না হলে গোসল করবে, যদিও সূর্য উদিত হয়ে যায়। সেসময় ঐ ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজের মধ্যেই থাকবে। এ ক্ষেত্রে আবু বাকর ﷺ'র হাদীসটি খুব প্রাসঙ্গিক। তিনি তার খিলাফতকালে একদিন ফজর সালাতের ইমামতি করছিলেন। তিনি লম্বা তিলাওয়াত করলেন। সালাম ফিরালে তাকে বলা হলো, 'আবু বাকর! আপনি এমন লম্বা তিলাওয়াত করলেন যে, যেন সূর্য উঠেই গেছে।' তিনি বললেন, 'যদি সূর্য উঠেও, তবুও আমাদের গাফিল অবস্থায় উঠবে না।'[১৪৫]

প্রশ্ন ৬৯: অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে কি?

জবাব: একটি হাদীসে পাওয়া যায়, আলী ﷺ থেকে বর্ণিত, জানাবাতের অপবিত্রতা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো কিছু কুরআন থেকে বিরত রাখতে পারত না।[১৪৬]

এ হাদীসটি যঈফ। দলিলযোগ্য নয়।

অন্য আরেকটি হাদীস আলী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম অজু করলেন তারপর কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করলেন। এরপর বললেন, 'এভাবে তিলাওয়াত সেই ব্যক্তি করতে পারবে, যে অপবিত্র নয়। অপবিত্র ব্যক্তি তিলাওয়াত করতে

---

১৪৪. ফাতাওয়াল ইমারাহ, ৫৯
১৪৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/৪০৮
১৪৬. সুনানু আবী দাউদ, ২২৯

পারবে না।' হাদীসটি আহমাদ ও আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন। হাইসামী বলেন, বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

এই হাদীসের সনদে দুটি সমস্যা আছে, ক. দুর্বলতা, খ. মওকূফ।

অতএব, যখন তিলাওয়াত হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ নেই, তখন মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর মূল হচ্ছে, তিলাওয়াত করা বৈধ। এটাই দাউদ যাহিরী এবং তার অনুসারীদের মত। ইবন হাযম এ মতের পক্ষে দলিলও পেশ করেছেন। দেখুন আল-মুহাল্লা ১/৭৭-৮০। তিনি এ মতটি ইবন আব্বাস, সাঈদ ইবন মুসাইয়াব ও সাঈদ ইবন জুবাইর থেকে উদ্ধৃত করেছেন। সাঈদ ইবন জুবাইরের সনদ উত্তম। সাঈদ ইবন জুবাইর থেকে বর্ণনা করেন হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান। হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান বলেন, আমি সাঈদ ইবন জুবাইরকে অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি তাতে সমস্যা মনে করেননি। তিনি বলেন, 'তার ভেতরে কি কুরআন নেই!' ইমাম বাগাবী 'শারহুস সুন্নাহ' ২/৪৩ গ্রন্থে যারা অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত জায়েয বলেছেন, ইকরিমাকে তাদের দলভুক্ত করেছেন। তবে অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত বৈধ হলেও তা মাকরূহ। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমি পবিত্র অবস্থা ছাড়া আল্লাহকে স্মরণ করতে অপছন্দ করি।' দেখুন সহীহাহ ৮৩৪।[১৪৭]

প্রশ্ন ৭০: সুনানু ইবন মাজাহর একটি হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অজু শেষে লজ্জাস্থানের আশেপাশে পানি ছিটিয়ে দিতেন (হা.৪৬১)। এভাবে পানি ছিটানোর রহস্য কী?

জবাব: নবী ﷺ মূলত শয়তানের ওয়াসওয়াসা দূর করার জন্য এভাবে পানি ছিটাতেন। যেন পেশাব-পায়খানা করার পর লজ্জাস্থানের আশপাশ ভেজা দেখে শয়তান সন্দেহ সৃষ্টি করতে না পারে যে, এটা পেশাব। মনে যেন এমন চিন্তা না আসে যে, এই দেখো পেশাবের কারণে ভেজা ভেজা অনুভব করছো। পেশাব-পায়খানার পর পানি ছিটিয়ে দিলে শয়তান এমন ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করতে চাইলে তার ওয়াসওয়াসার পিঠে একথা বলা যাবে যে, এটা পেশাবের আর্দ্রতা নয় বরং আমি যে পানি ছিটিয়েছি তার আর্দ্রতা। এভাবে এই কাজ হয়, শয়তানের ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা থেকে নিস্তারের মাধ্যম। আর এমন কাজ করার পেছনে আসলে নাপাকি দূর করার কোনো উদ্দেশ্যেই নিহিত ছিল না।[১৪৮]

১৪৭. তামামুল মিন্নাহ, ১১৬
১৪৮. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/২০৮

প্রশ্ন ৭১: জুনুব বা অপবিত্র অবস্থায় থাকার বিধান কী?

জবাব: ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন,

ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ : اَلْجُنُبُ وُ السَّكْرَانُ وَ الْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوْقِ

> ফেরেশতা তিন শ্রেণি লোকের নিকটবর্তী হয় না; জুনুব-অপবিত্র, নেশাগ্রস্ত ও জাফরান ব্যবহারকারী।[১৪৯]

জাফরান নিষেধ করা হয়েছে কারণ, তা মহিলাদের সুঘ্রাণ। জুনুব-অপবিত্র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মিলন বা বীর্যস্খলনের কারণে যাদের ওপর গোসল ওয়াজিব হয়েছে। আর আমার কাছে মনে হয়, ফেরেশতা সেইসব জুনুব-অপবিত্র ব্যক্তির নিকটবর্তী হয় না, যারা গোসল না করে অপবিত্র থাকাকে নিয়ম ও অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে। যারা সিংহভাগ সময় অপবিত্র অবস্থায় থাকে। এমনটা তারাই করতে পারে যাদের দ্বীনদারিত্ব কম এবং যাদের ভেতর কলুষ ও কালিমায় ভরপুর। অন্যথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতেন। কেননা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, [আয়িশাহ ﷺ বলেন] তিনি পানি স্পর্শ করা ব্যতীত অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতেন, যেমনটি আমি সহীহ আবু দাউদের ২২৩ নং হাদীসে তাহকীক করেছি।[১৫০]

প্রশ্ন ৭২: পেশাব-পায়খানার সময় কথা বলার বিধান কী?

জবাব: জাবির ইবন আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একদিন পেশাব করছিলেন। সেই সময় এক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে সে তাঁকে সালাম দেয়। নবী ﷺ বলেন,

.إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ، فَلاَ تُسَلِّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ

> আমাকে এই অবস্থায় দেখলে সালাম দেবে না। এমনটা তুমি করলে আমি তোমার সালামের জবাব দেব না।[১৫১]

হাদীস থেকে বোঝা যায়, তিনি পেশাবরত অবস্থায় সেই সাহাবীকে উক্ত কথা বলেন। অতএব, প্রমাণ হয়, পেশাব-পায়খানা অবস্থায় কথা বলা বৈধ। আর যে হাদীসে বলা হয়েছে, পেশাবা-পায়খানা অবস্থায় কথা বললে আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন, প্রথমত সেই হাদীসের সনদ সহীহ নয়,

---

১৪৯. মুসনাদ বাযযার, ৪৪৪৬; সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২৩৭৪, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

১৫০. মূল আবূ দাউদ, ২২৮; নাযমুল ফারাইদ, ১/২৭২

১৫১. সুনানু ইবন মাজাহ, ৩৫২, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

দ্বিতীয়ত সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়নি শুধু কথা বলার কারণে ক্রোধান্বিত হন। হাদীসটি হচ্ছে,

لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ عَلَى غَائِطِهِمَا ، يَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ.

পেশাব-পায়খানা অবস্থায় দুজন যেন চুপিচুপি কথা না বলে, একজন অন্যজনের লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়। কেননা আল্লাহ এ কারণে ক্রোধান্বিত হন।[১৫২]

পরে আমি এ হাদীসের আরেকটি সনদের কথা জানতে পারি। তা সিলসিলাতুস সহীহাহর ৩১২০ নং হাদীসে উল্লেখ করেছি।[১৫৩] হাদীস থেকে প্রমাণ হয়, আল্লাহ তখন ক্রোধান্বিত হন, যখন উভয়ে আলাপচারিতা ও কথা বলার পাশাপাশি একজন অন্যজনের লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টি দেয়। শুধু আলাপ করলে বা কথা বললে এ হাদীস প্রযোজ্য হবে না; যদিও আলাপকারীর কাছে পেশাব-পায়খানা অবস্থায় কথা বলা জঘন্য কাজ মনে হয়। অতএব, শুধু কথা বলা হারাম বলতে হলে হারামের পক্ষে দলিল থাকা অত্যাবশ্যক। আর আমি হারামের পক্ষে কোনো দলিল পাইনি। তবে হ্যাঁ, একজন অন্যজনের লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হারাম। তা একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।[১৫৪] [১৫৫]

প্রশ্ন ৭৩: ইস্তিনজার জন্য সর্বনিম্ন কতটি পাথর বা ঢিলা ব্যবহার করতে হবে?

জবাব: আবু হুরাইরাহ ﷺ'র সূত্রে উল্লেখ করা হয়, নবী ﷺ বলেন,

مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَا لاَكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ

যে সুরমা লাগায়, সে যেন বেজোড় সংখ্যায় সুরমা লাগায়। এরূপ করলে ভালো, আর না

১৫২. সুনানু ইবন মাজাহ, ৩৪২, আলবানী হাদীসটিকে সুনানু ইবন মাজাহতে দুর্বল বললেও পরবর্তীকালে তিনি নিজের মত পরিবর্তন করে সহীহ বলেন।

১৫৩. পরবর্তীকালে আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেন।

১৫৪. নাযমুল ফারাইদ, ১/২৪৬

১৫৫. এ বিধান জরুরি অবস্থায় হতে পারে। যথাসম্ভব কুরআনের পবিত্রতা রক্ষার্থে বাথরুমে কুরআন বা মুসহাফ নিয়ে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করতে হবে।—সম্পাদক (সালাফী)

করলে অসুবিধা নেই। যে ঢিলা ব্যবহার করে, সে যেন বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার করে। এরূপ করলে ভালো, আর না করলে অসুবিধা নেই। খাওয়ার পর খিলাল করলে যদি কিছু বের হয়, সে যেন তা ফেলে দেয় আর জিহ্বায় লেগে থাকলে গিলে ফেলে। এরূপ করলে ভালো, আর না করলে অসুবিধা নেই। যে পায়খানায় যায় সে যেন আড়াল করে। আড়াল করার মতো বালুর স্তূপ ছাড়া কোনো কিছু না পেলে সে যেন স্তূপকে পেছনে করে। কেননা শয়তান আদম সন্তানের পেছন নিয়ে খেলা করে। এরূপ করলে ভালো, আর না করলে অসুবিধা নেই।[১৫৬]

প্রথমত এই হাদীসটি যঈফ। আর এ হাদীসটিকে সহীহ গণ্য করা হলেও এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তিনটি পাথর ব্যবহার করার পর বেজোড় পাথর ব্যবহার করা ভালো। কেননা একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তিনটি পাথর ব্যবহার করা ওয়াজিব। তিনের কম পাথর ব্যবহার করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। সালমান ﷺ বলেন,

لَقَدْ نَهَانَا -صلى الله عليه وسلم- أَنْ لاَ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তিনটি পাথরের কমে ইস্তিনজা করতে বারণ করেছেন।[১৫৭]

এমন সহীহ ও স্পষ্ট হাদীস থাকতেও অনেকেই প্রথম উল্লিখিত দুর্বল হাদীসের কারণে বলে থাকেন, বেজোড় ঢিলা বা পাথর ব্যবহার করা না করা ঐচ্ছিক ও একান্ত নিজস্ব ব্যাপার এবং তিনের কম পাথর দ্বারা ইস্তিনজা করা বৈধ। অথচ আমরা প্রথম হাদীসকে সহীহ গণ্য করলেও দুটি হাদীসের মাঝে এভাবে সমন্বয় করা সম্ভব; তিনটি পাথরের পরে বেজোড় পাথর ব্যবহার করা ভালো।

ইবনুত তুরকমানী দুই হাদীসের মাঝে সমন্বয়কে এভাবে প্রত্যাখ্যান করতে চান যে, 'আপনাদের সমন্বয় অনুযায়ী মল পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরও তিনের অতিরিক্ত বেজোড় পাথর ব্যবহার করা মুস্তাহাব। অথচ আপনারা বলেন, পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর তিনের অতিরিক্ত পাথর ব্যবহার করা বিদআত।' আমরা তার জবাবে বলব, 'হ্যাঁ, তিনটি পাথরে পরিষ্কার হয়ে গেলে তিনের অতিরিক্ত পাথর ব্যবহার করা বিদআত। আমরা যঈফ হাদীসটিকে তিনটি পাথরে পরিষ্কার না হওয়ার ওপর প্রয়োগ করি। অর্থাৎ কারো যদি তিনটি পাথরে পরিষ্কার না হয় বরং চারটি পাথরে পরিষ্কার হয়, তাহলে চারের পর বেজোড় পাথর ব্যবহার করা মুস্তাহাব ও ঐচ্ছিক

১৫৬. সুনানু আবী দাউদ, ৩৫; সুনানু ইবন মাজাহ, ৩৩৭
১৫৭. সহীহ মুসলিম, ২৬২

ব্যাপার। কিন্তু দুটি পাথর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেলেও সালমান ﷺ'র হাদীসের কারণে তিনটি পাথর ব্যবহার করা ওয়াজিব।'[১৫৮]

প্রশ্ন ৭৪: একসঙ্গে পানি ও ঢিলা ব্যবহার করা যাবে কি?

জবাব: একসঙ্গে পানি ও ঢিলা ব্যবহার করা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়। তাই আমার আশঙ্কা, একসঙ্গে উভয়টি ব্যবহার করা দ্বীনে বাড়াবাড়ির শামিল। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ সুন্নাত ও দিকনির্দেশনা হচ্ছে, উভয়ের যে-কোনো একটি ব্যবহার করা। আর তাঁর দিকনির্দেশনা সর্বোত্তম দিকনির্দেশনা; অন্যদিকে সর্বনিকৃষ্ট জিনিস হচ্ছে বিদআত।

কুবাবাসীদের ক্ষেত্রে যে হাদীসে বলা হয়েছে, তারা একসঙ্গে পানি ও পাথর ব্যবহার করত, সে হাদীসের সনদ দুর্বল। সে হাদীস দলিলযোগ্য নয়। নববী ও ইবন হাজার প্রমুখগণ সে হাদীসকে দুর্বল বলেছেন।[১৫৯]

প্রশ্ন ৭৫: বাথরুমে কুরআন বা মুসহাফ নিয়ে প্রবেশ করা যাবে কি?

জবাব: কুরআন বা মুসহাফ যদি দৃশ্যমান না থাকে; বরং জ্যাকেট বা অন্যান্য পোশাক বা ব্যাগের ভেতর পকেটে থাকে, তাহলে সমস্যা নেই।[১৬০]

প্রশ্ন ৭৬: পেশাব-পায়খানার সময় নিষিদ্ধ কাজগুলো কী কী?

জবাব: খোলা জায়গায় হোক বা চার দেয়ালের ভেতর হোক, কিবলাকে সামনে বা পেছনে করা যাবে না।[১৬১]

- ডান হাতে ইস্তিনজা করা যাবে না। [পুরুষাঙ্গ ডান হাত দিয়ে ধরা যাবে না।][১৬২]
- হাড় বা পশুর মল ইস্তিনজা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।[১৬৩]
- মানুষের চলাচলের রাস্তায় বা যেখানে মানুষ বিশ্রাম করে সেখানে পেশাব-পায়খানা করা যাবে না।[১৬৪]

---

১৫৮. সিলসিলাতুয যঈফাহ, ৩/৯৮-১০০
১৫৯. তামামুল মিন্নাহ, ৬৫
১৬০. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/১৩৮
১৬১. সহীহুল বুখারী, ৩৯৪; সহীহ মুসলিম, ২৬২, ২৬৪
১৬২. সহীহুল বুখারী, ১৫৩, ১৫৪; সহীহ মুসলিম, ২৬২, ২৬৭
১৬৩. সহীহ মুসলিম, ২৬২, ২৬৩
১৬৪. সহীহ মুসলিম, ২৬৯

- নদী বা পুকুরের ঘাটে পেশাব-পায়খানা করা যাবে না।[১৬৫]
- ছিদ্রে বা গর্তে পেশাব করা যাবে না।[১৬৬]
- আবদ্ধ ও প্রবাহিত পানিতে পেশাব-পায়খানা করা যাবে না।[১৬৭]
- গোসলখানায় পেশাব-পায়খানা করা যাবে না।[১৬৮]
- তিনটি পাথর বা ঢিলার কমে ইস্তিনজা করা যাবে না।[১৬৯]
- কাপড়ে বা পোশাকে যেন পেশাব না লাগে সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।[১৭০]
- নবী ﷺ কখনো পানি দ্বারা ইস্তিনজা করতেন আবার কখনো পাথর দ্বারা করতেন।[১৭১]

প্রশ্ন ৭৭: যেসব প্রাণী খাওয়া হালাল, সেসব প্রাণীর মলমূত্র কি পবিত্র?

জবাব: প্রথম কথা হচ্ছে, আমাদের জেনে রাখা আবশ্যক যে, যেসব প্রাণী খাওয়া বৈধ সেসব প্রাণীর মলমূত্র পবিত্র। কিন্তু প্রত্যেক পবিত্র জিনিস কি রুচিসম্মত ও ভক্ষণযোগ্য? যেমন, কোনো ব্যক্তি পানিতে থুথু ফেলল। ওই ব্যক্তি কি নিজের থুথুমিশ্রিত পানি পান করবে? সেই পানি তার রুচিতে ধরবে না। সে তা পান করবে না। কিন্তু থুথুমিশ্রিত সে পানি পবিত্র না অপবিত্র? অবশ্যই পবিত্র।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যারা গরু বা ছাগল পালন করেন, তাদেরকে আমরা বলব, আপনারা দুধ দোহনের সময় সতর্ক থাকবেন। দুধে যেন গরু-ছাগলের মলমূত্রের মতো অরুচিকর বস্তু না পড়ে যায়। তবে আমি আবার মলমূত্রকে নাপাক বলছি না। বরং বলছি যেহেতু এগুলো অরুচিশীল বস্তু, তাই তা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। এরপরও দুধে তা মিশে গেলে দুধ পবিত্র থাকবে।[১৭২]

প্রশ্ন ৭৮: গাড়িতে কুকুরের লালা লেগে গেলে পবিত্র করার পদ্ধতি কী?

জবাব: কুকুরের লালা যদি গাড়ির লোহা জাতীয় কোনো স্থানে লাগে, তবে মুছে নিলেই যথেষ্ট।

১৬৫. সুনানু আবী দাউদ, ২৬
১৬৬. সুনানু আবী দাউদ, ২৯। আলবানী হাদীসটির সনদ যঈফ বলেছেন।
১৬৭. সহীহুল বুখারী, ২৩৮, ২৩৯; সহীহ মুসলিম, ২৮১, ২৮২
১৬৮. সুনানু আবী দাউদ, ২৭, ২৮
১৬৯. সহীহুল বুখারী, ১৫৬; সহীহ মুসলিম, ২৬২
১৭০. সহীহুল বুখারী, ; সহীহ মুসলিম, ২৯২; সুনানু ইবন মাজাহ, ৩৪৮
১৭১. সহীহুল বুখারী, ১৫০, ১৫৫; সহীহ মুসলিম, ২৭০, ২৭১; আস-সামারুল মুস্তাতাব, ১/৯
১৭২. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/১১৭

আর যদি বস্ত্র জাতীয় কোথাও লাগে, তাহলে যথাসাধ্য ধুয়ে ফেলতে হবে। মোছা বা ধোয়ার পরও যদি লালা থেকে যায় এবং শুকিয়ে যায়, তাহলে তাতে বসলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি তা না শুকায় বরং তরল অবস্থায় থাকে এবং যাত্রীর কাপড়ে লেগে যায়, তাহলে সেই কাপড় অবশ্যই ধুতে হবে। মোটকথা, কুকুরের লালা যথাসাধ্য গাড়ি থেকে দূর করতে হবে।[১৭৩]

প্রশ্ন ৭৯: শরীরে বা পোশাকে ছোটো বাচ্চার পেশাব লেগে গেলে কী করণীয়?

জবাব: দুধ ছাড়া অন্য খাবার খেতে অক্ষম এমন ছোটো বাচ্চা ছেলে হলে পেশাবের স্থানে পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট। আর মেয়ে বাচ্চা হলে অথবা দুধ ছাড়া অন্যান্য খাবার খেতে সক্ষম ছেলে বা মেয়ে বাচ্চা হলে পেশাব ও পেশাবের স্থান ধুয়ে ফেলতে হবে। উম্মু কায়েস বিনত মিহসান থেকে বর্ণিত, তিনি তার খাবার খেতে অক্ষম ছেলে বাচ্চাকে সঙ্গে করে রাসূলুল্লাহ ﷺরে নিকট আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিয়ে তাঁর কোলে বসালে বাচ্চাটি পেশাব করে দেয়। তখন তিনি পানি আনতে বলেন এবং পেশাবের স্থানে পানি ছিটিয়ে দেন; ধুয়ে ফেলেননি।[১৭৪]

হানাফী মাযহাবে এই হাদীসের ব্যাখ্যা করা হয়, 'পানি ছিটিয়ে দেন মানে ভালোভাবে ধৌত করেননি।' তাদের এ ব্যাখ্যা কয়েক কারণে অগ্রহণযোগ্য।

ক. ঘটনা যেভাবে ও যে শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে, তা তাদের ব্যাখ্যাকে নাকচ করে।

খ. তাদের এ ব্যাখ্যা আবুস সামহ ﷺ'র বর্ণিত হাদীস পরিপন্থি। সে হাদীসে বলা হয়েছে, মেয়ে বাচ্চার পেশাব ধুতে হবে আর ছেলে বাচ্চার পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।[১৭৫] মূলত মাযহাবী গোঁড়ামির কারণে তারা শরীআতের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য পরিপন্থি এমন দূরবর্তী ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে।[১৭৬]

প্রশ্ন ৮০: মিসওয়াক করার বিধান কী? কোন হাতে মিসওয়াক করতে হবে?

জবাব: মিসওয়াক করা সুন্নাত। একাধিক হাদীসে নবী ﷺ মিসওয়াক করতে উৎসাহ দিয়েছেন।[১৭৭] আর কোন হাতে মিসওয়াক করতে হবে এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণ নেই। কতক আলেমের মতে, ডান হাতে করতে হবে। আবার কতক আলেমের মতে, বাম হাতে করতে হবে। উভয়

---

১৭৩. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/১১২
১৭৪. সহীহুল বুখারী, ২২৩; সহীহ মুসলিম, ২৮৭
১৭৫. সুনানু আবী দাউদ, ৩৭৬; সুনানু ইবন মাজাহ, ৫২৬
১৭৬. আত-তালীক আলা মিশকাতিল মাসাবীহ, ১/১৫৫
১৭৭. সহীহুল বুখারী, ৮৮৭, ৮৮৮; সুনানুন নাসায়ী, ৫

দল নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মতামত দিয়েছেন। যারা বলেছেন ডান হাতে মিসওয়াক করতে হবে, তারা প্রত্যেক কাজ ডান দিক থেকে শুরু করার হাদীসসমূহকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আর যাদের মতে বাম হাতে মিসওয়াক করতে হবে, তারা বলেছেন, মিসওয়াক করা মূলত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, তা ইস্তিনজা ও অন্যান্য ময়লা দূর করার হুকুমে হবে। এ কারণে এই মাসআলায় প্রত্যেকে তার চাহিদা ও অন্তরের প্রশান্তি অনুযায়ী আমল করবে।[১৭৮]

প্রশ্ন ৮১: দাঁত নেই এমন ব্যক্তির জন্য কি আঙুল দ্বারা মিসওয়াক করা সুন্নাত?

জবাব: 'ফিকহুস সুন্নাহ' গ্রন্থকার সাইয়্যিদ সাবিক-এর পর্যালোচনা করে ইমাম আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সাইয়্যিদ সাবিক বলেছেন: যার দাঁত নেই তার জন্য সুন্নাত হচ্ছে, নিজ আঙুল দ্বারা মিসওয়াক করা। তার পক্ষে দলীল হচ্ছে আয়েশাহ ﵂'র হাদীস। তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! যার মুখ (দাঁত) নেই সে কি মিসওয়াক করবে?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, করবে।' আমি বললাম, 'কীভাবে করবে?' তিনি বলেন, 'সে তার মুখে আঙুল প্রবেশ করাবে।' হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন।[১৭৯]

আমি (আলবানী) বলব, লেখক এ হাদীসের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য না করে বোঝাতে চেয়েছেন হাদীসটি প্রমাণিত। অথচ হাদীসটি প্রমাণিত নয়। হাইসামী 'মাজমাউয যাওয়াইদ' (২/১০০) গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসটি তাবারানী 'আওসাত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সনদে ঈসা ইবন আবদুল্লাহ আনসারী নামক একজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে।

যাহাবী 'মীযান' গ্রন্থে তার জীবনীতে বলেছেন, 'যাদের হাদীসের ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে তাদের একজন হলেন ইনি।'

ইবন হাজার আসকালানী 'তালখীসুল হাবীর' ১/৩৮৩ গ্রন্থে বলেছেন, 'ঈসাকে দুর্বল বলেছেন ইবন হিব্বান। আর ইবন আদী তার এ হাদীসকে আপত্তিকর হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।'

অতএব, আপনি হাদীসটির এ অবস্থা দেখতে পেলেন। কাজেই লেখকের আঙুল দ্বারা মিসওয়াক করাকে সুন্নাত বলা আপত্তিকর।'[১৮০]

---

১৭৮. ফাতাওয়াল ইমারাত, ৭৭
১৭৯. আল-মুজামুল আওসাত, ৬৬৭৮
১৮০. তামামুল মিন্নাহ, পৃ. ৯০

অধ্যায় চার

হায়েয-নিফাস

প্রশ্ন ৮২: কখন বোঝা যাবে, একজন মহিলা হায়েয থেকে মুক্ত হয়ে গেছে?

জবাব: হায়েযের পরে 'আল-কুসসাতুল বায়যা বা পূর্ণ সাদা বর্ণ' দেখা গেলে সে নারী পবিত্র হয়ে যাবে। অনেক এলাকায় একে 'তুহর বা পবিত্র' বলা হয়। 'আল-কুসসাতুল বায়যা' মহিলাদের কাছে অতিপরিচিত সাদা রঙের তরল পানি, যা হায়েয শেষে নির্গত হয়। হায়েযের রক্ত নির্গত হওয়া বন্ধ হয়ে গেলে হায়েযের দিন শেষ বলে গণ্য হবে না; যতক্ষণ না আল-কুসসাতুল বায়যা দেখা যায়।[১৮১]

প্রশ্ন ৮৩: হায়েযের পূর্ব ও পরের ঘোলাটে ও হলুদ রঙের যা নির্গত হয় তার বিধান কী?

জবাব: হায়েয বা নিফাসের সময়ে ঘোলাটে ও হলুদ রঙের যা নির্গত হয়, তা হায়েয ও নিফাস বলে গণ্য হবে। হায়েয বা নিফাসের সময় কেউ যদি ঘোলাটে ও হলুদ রঙের কিছু নির্গত হতে দেখে, তাহলে পবিত্র বলে গণ্য হবে না। তবে 'আল-কুসসাতুল বায়যা' নির্গত হওয়ার পর কেউ যদি পবিত্র হয়ে যায় তারপর ঘোলাটে ও হলুদ রঙের কিছু নির্গত হয় অথবা সাধারণ পবিত্র অবস্থায় নির্গত হয়, তাহলে তা হায়েয বা নিফাস বলে গণ্য হবে না। যথারীতি সে নারী সালাত, সিয়াম ও অন্যান্য ইবাদত চালু রাখবে।[১৮২]

প্রশ্ন ৮৪: হায়েযের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সীমা কয়দিন?

জবাব: হায়েযের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সীমা নিয়ে আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তবে এ মাসআলায় শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ যে মত প্রদান করেছেন, তা সর্বাধিক বিশুদ্ধ। তার মতে, হায়েযের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ কোনো সীমা নেই। বরং মহিলারা স্বাভাবিকভাবে যাকে হায়েয মনে করে তাই হায়েয বলে গণ্য করবে, যদিও তা একদিনের

১৮১. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/৪৯৭

১৮২. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/৪৯৯

কম হয়। তবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে লাগাতার কোনো মহিলার হায়েয হয় না। কেননা শরীআত ও ভাষাতত্ত্ব থেকে প্রমাণিত যে, একজন মহিলা কোনো সময় পবিত্র থাকবে আবার কোনো সময় ঋতুবতী থাকবে। পবিত্র অবস্থার জন্য কিছু বিধান রয়েছে আবার ঋতুকালীনের জন্য কিছু বিধান রয়েছে।[১৮৩]

প্রশ্ন ৮৫: হায়েযের কাপড় বা পোশাক পরিষ্কার করার জন্য শুধু পানি কি যথেষ্ট? না কি সাবান বা অন্যকিছু দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে?

জবাব: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ

তোমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে তা হাত দিয়ে উঠিয়ে ফেলবে তারপর পানি দিয়ে ধুয়ে নেবে।[১৮৪]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

أُقْرُصِيهِ بِمَاءٍ ثُمَّ انْضَحِيْ فِيْ سَائِرِهِ فَصَلِّي فِيهِ

পানি দিয়ে তা ঘষে-মলে নেবে তারপর গোটা কাপড় ধুয়ে নিয়ে তাতে সালাত আদায় করবে।[১৮৫]

এ হাদীসের বাহ্যিকতা থেকে প্রমাণ হয় হায়েযের রক্ত শুধু পানি দিয়ে ধুয়ে নিলেই যথেষ্ট; বরই পাতা, সাবান ও অন্য কোনো কিছু প্রয়োজন নেই। তবে অন্য আরেকটি হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয়, বরই পাতা, সাবান ও অন্যকিছু ব্যবহার করা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

حُكِّيهِ بِضِلْعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

কাঠের টুকরো দিয়ে তা খুঁচিয়ে দূরে করো, তারপর বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলো।[১৮৬]

প্রশ্ন ৮৬: হায়েযের কাপড় বা পোশাক পুরোটাই পরিষ্কার করতে হবে না কি শুধু রক্তমিশ্রিত অংশ পরিষ্কার করে নিলেই হবে?

১৮৩. সিলসিলাতুয যঈফাহ, ৩/৬০৯
১৮৪. সহীহুল বুখারী, ৩০৭
১৮৫. সুনানুদ দারেমী, ১০১৮
১৮৬. সুনানু আবী দাউদ, ৩৬৩; সিলসিলাতুস সহীহাহ, ১/১/৫৯৯

জবাব: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ

তোমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে তা হাত দিয়ে খুঁটে ফেলবে এবং তারপর পানি দিয়ে ধুয়ে নেবে।[১৮৭]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

أَقْرُصِيهِ بِمَاءٍ ثُمَّ انْضَحِيْ فِيْ سَائِرِهِ فَصَلِّي فِيهِ

পানি দিয়ে তা ঘষে-মলে নেবে, তারপর পুরো কাপড় ধুয়ে নিয়ে তাতে সালাত আদায় করবে।[১৮৮]

'তারপর পুরো কাপড় ধুয়ে নিয়ে' অংশ প্রমাণ করে প্রথম হাদীসে 'তারপর পানি দিয়ে ধুয়ে নেবে' অংশ দ্বারা রক্তমিশ্রিত অংশ ধোয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং গোটা কাপড় ধুতে হবে। এ মতকে আয়েশাহ ﷺ'র হাদীস আরও বলিষ্ঠ করে। আয়েশাহ ﷺ বলেন,

كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.

আমাদের কারো হায়েয হলে পবিত্র হওয়ার পর সে রক্তকে তার কাপড় থেকে হাত দিয়ে খুঁটে ফেলত। তারপর ধুয়ে নিত এবং গোটা কাপড়ে পানি প্রবাহিত করত। অতঃপর সেই কাপড়ে সালাত আদায় করত।[১৮৯]

প্রশ্ন ৮৭: পরিধেয় বস্ত্রতে অতি সামান্য হায়েযের রক্ত লাগলেও কি পুরো কাপড় ধুতে হবে?

জবাব: আয়েশাহ ﷺ বলেন,

قَدْ كَانَ يَكُونُ لإِحْدَانَا الدِّرْعُ فِيهِ تَحِيضُ وَفِيهِ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ ثُمَّ تَرَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ فَتَقْصَعُهُ بِرِيقِهَا.

আমাদের কারো কারো একটি জামা থাকত। সেই জামা পরিহিত অবস্থায় হায়েয হতো। তাতেই অপবিত্রতার গোসল ফরয হতো। জামায় এক ফোঁটা রক্ত দেখলে তা থুথু দিয়ে মলে নিত।[১৯০]

১৮৭. সহীহুল বুখারী, ৩০৭
১৮৮. সুনানুদ দারেমী, ১০১৮
১৮৯. সহীহুল বুখারী, ৩০৮; সিলসিলাতুস সহীহাহ, ১/১/৬০২
১৯০. সুনানু আবী দাউদ, ৩৬৪, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

'মানারুস সাবীল' গ্রন্থকার[১৯১] এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, যৎসামান্য রক্ত মাফযোগ্য। কেননা আয়েশাহ ﷺ এ হাদীসে তাদের মাঝে প্রচলিত নিয়মের কথা বলছেন। তারা এভাবেই স্থায়ীভাবে পরিষ্কার করতেন। থুথু দ্বারা যদি পরিষ্কার না হতো বরং এভাবে মলে নেওয়ার কারণে যদি নখ অপবিত্র হয়ে যেত, তাহলে নবী ﷺ তা অবহিত করতেন। এ প্রচলিত নিয়ম তাঁর অজানা থাকতে পারে না। আল্লাহু আলাম।[১৯২]

প্রশ্ন ৮৮: ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাসের বিধান কী? সহবাস করলে কোনো কাফফারা প্রদান করতে হবে কি?

জবাব: ঋতুবতী স্ত্রীর যোনিতে সহবাস করা হারাম। যোনি ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ উপভোগ করা জায়েয। আনাস ইবন মালিক ﷺ বলেন, ইয়াহুদীদের কোনো মহিলা ঋতুবতী হলে তারা তাদের সাথে খাওয়াদাওয়া করত না, একই বাসায় বসবাস করত না। সাহাবীগণ এ ব্যাপারে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

তারা আপনাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, তা অপবিত্র। অতএব, ঋতুকালে তোমরা স্ত্রীদের নিকট যেয়ো না। এমনকী তারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হবে না। সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হওয়ার পর তোমরা তাদের কাছে আসো আল্লাহ যেভাবে তোমাদের আদেশ করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন, ভালোবাসেন পবিত্র অর্জনকারীদের।[১৯৩] এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সহবাস ছাড়া তোমরা তাদের সাথে সব করবে।[১৯৪]

নবী ﷺ বলেন, যে ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে বা স্ত্রীর মলদ্বারে মিলন করে বা গণকের নিকট গিয়ে তার কথা সত্যায়ন করে, সে মুহাম্মাদের ওপর অবতীর্ণ বিধানকে অস্বীকার করে। সুনান গ্রন্থকারগণ এ হাদীস সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি আমি 'নাকদুত তাজ' নং ৬৪-এ উল্লেখ করেছি।[১৯৫]

১৯১. 'মানারুস সাবীল' হাম্বালী মাযহাবের ওপর লিখিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থের লেখক হলেন ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন যুইয়ান রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩৫৩ হি. মোতাবেক ১৯৩৫ খ্রি.)-সংকলক

১৯২. ইরওয়াউল গালীল, ১৮২

১৯৩. সূরা বাকারাহ, ২:২২২

১৯৪. সহীহ মুসলিম, ৫৮১; সুনানু আবী দাউদ, ২৫৮

১৯৫. সুনানুত তিরমিযী, ১৩৫; সুনানু আবী দাউদ, ৩৯০৪; সুনানু ইবন মাজাহ, ৬৩৯, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা সবার ঐকমত্যে হারাম। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল, মুহাম্মাদ ইবন হাসান ও ইসহাক প্রমুখগণ বলেন, যোনি ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ উপভোগ করা বৈধ। তবে তা এমন ব্যক্তির জন্য পরিহারযোগ্য ও মাকরূহ, যার ব্যাপারে যোনিতে সহবাস করার আশঙ্কা রয়েছে। মাকরূহ বা হারাম কাজে পতিত হওয়ার পথ রুদ্ধ করার জন্য এটিই তার জন্য বিধান।

কেউ যদি ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে ফেলে, তবে সে এক দীনার অথবা অর্ধদীনার সাদকা করবে। ইবন আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, 'যে ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে সে এক দীনার অথবা অর্ধদীনার সাদকা করবে।'[১৯৬] হাদীসটি সুনান গ্রন্থকারগণ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।[১৯৭]

প্রশ্ন ৮৯: হজ সম্পাদনের জন্য ওষুধের মাধ্যমে কি হায়েয বন্ধ করা যাবে?

জবাব: আমি ব্যক্তিগতভাবে আধুনিক ওষুধপত্র ও চিকিৎসা উপকরণ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ মনে করি না। তবে শর্ত হচ্ছে, ডাক্তারদের মতে সেসব ওষুধ যেন মহিলাদের জন্য ক্ষতিকর না হয়। তা ক্ষতিকর না হলে হজ সম্পাদনকে নির্বিঘ্ন ও সহজ করতে তা সেবনে আমি কোনো অসুবিধা দেখি না। কেননা মৌলিকভাবে সকল বস্তু বৈধ। তা ছাড়া এটি কোনো হারাম কাজে জড়ানোর উদ্দেশ্যেও সেবন করা হচ্ছে না।[১৯৮]

প্রশ্ন ৯০: মুস্তাহাযা[১৯৯] স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা কি বৈধ?

জবাব: মুস্তাহাযা স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা নিয়ে আলেমদের মাঝে মতদ্বৈধতা রয়েছে। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে সহবাস করা বৈধ। আর এটিই সঠিক মত। কেননা মৌলিকভাবে সবকিছু হালাল। হারাম ঘোষণা করতে হলে তার সপক্ষে দলিল লাগবে। তা ছাড়া মুস্তাহাযার সঙ্গে সহবাসে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা স্বামীর জন্য ক্ষতিকর; বিশেষ করে স্ত্রী স্থায়ীভাবে ইস্তিহাযাগ্রস্ত হলে, যেমনটি উম্মু হাবীবা বিনত জাহাশ ছিলেন। সহীহ সনদে ইমাম দারিমী (২০৭) সালিম আফতাসের উদ্ধৃতিতে সাঈদ ইবন জুবাইর থেকে যে উক্তিটি বর্ণনা করেন তা বেশ অনিন্দ্য। সাঈদ ইবন জুবাইরকে জিজ্ঞেস করা হয়, মুস্তাহাযার সাথে সহবাস করার

১৯৬. সুনানু আবী দাউদ, ২৬৪

১৯৭. আস-সামারুল মুস্তাতাব, ১/৪১-৪২

১৯৮. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/৫০০

১৯৯. হায়েয ও নিফাসের মেয়াদের অতিরিক্ত সময় রক্তঃস্রাবকে 'ইস্তিহাযা' বলে এবং ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীকে 'মুস্তাহাযা' বলা হয়। এটি এক প্রকার রোগ।

বিধান কী? তিনি বলেন, 'সহবাসের থেকে সালাত অধিক মহান।'[২০০] সহীহ্ সনদে বাকর ইবন আবদুল্লাহ মুযানী থেকে একই কথা বর্ণিত হয়েছে।[২০১]

প্রশ্ন ৯১: মুস্তাহাযা নারীকে কি প্রত্যেক সালাতের জন্য আলাদা আলাদাভাবে অজু করতে হবে?

জবাব: মুস্তাহাযা মহিলার ক্ষেত্রে প্রত্যেক সালাতের জন্য আলাদা আলাদাভাবে অজু করা আবশ্যক। হিশাম ইবন উরওয়া থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তার পিতা আয়েশাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, ফাতিমা বিনত আবী হুবাইশ নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, আমার প্রায় এক-দু মাস হায়েয হয়। তিনি তাকে বলেন, ওটা হায়েয নয় বরং তা নাড়ি থেকে বের হচ্ছে। যখন হায়েয শুরু হবে তখন সালাত ছেড়ে দেবে, আর যখন হায়েয শেষ হবে তখন নিজেকে পবিত্র করার জন্য গোসল করবে। তবে প্রতি সালাতের জন্য অজু করবে।[২০২]

প্রত্যেক সালাতের জন্য নতুন করে অজু করার পক্ষে রয়েছেন ইমাম শাফিয়ী, ইমাম আহমাদ ও আবু সাওর প্রমুখ। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে প্রতি ওয়াক্ত সালাতের নয় বরং সলাতের সময় অজু করতে হবে।[২০৩] রূপকতাকে উপজীব্য বানিয়ে এ মত প্রদান করা হয়েছে। এ মতের পক্ষে দলিল প্রয়োজন। শাওকানী এ মতের ব্যবচ্ছেদ করেছেন।[২০৪]

ইকরিমা বলেন, উম্মু হাবীবাহ বিনতে জাহাশ ﷺ'র ইস্তিহাযা হয়। নবী ﷺ তাকে আদেশ দেন, হায়েযের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তারপর গোসল করে যথারীতি সালাত আদায় করবে। যদি ইস্তাহাযার স্রাবের কোনো কিছু দেখো তবে অজু করে সালাত আদায় করবে।[২০৫] এ হাদীসের সনদ বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

এ হাদীসটি আয়েশাহর পূর্বের হাদীসের বিধানকে সীমাবদ্ধ করে। পূর্বের হাদীস অনুযায়ী ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলা সর্বদা প্রত্যেক সালাতের জন্য অজু করবে, তাতে স্রাব নজরে আসুক অথবা না আসুক। আর এ হাদীস অনুযায়ী অজু তখন ওয়াজিব যখন সে স্রাব দেখবে। আর

---

২০০. অর্থাৎ মুস্তাহাযা নারীর জন্য যেখানে সালাত আদায় করতে পারবে, সেখানে সহবাস বাদ পরার প্রশ্নই আসে না।

২০১. আস-সামারুল মুস্তাতাব, ১/৪৫

২০২. সহীহ মুসলিম, ৬৪০

২০৩. অর্থাৎ শাফিয়ী মাযহাব মতে মুস্তাহাযা মহিলা যদি যোহর ও আসর সালাত একত্রে আদায় করে তবে তাকে যোহরের জন্য একবার ওজু করতে হবে আর আসরের জন্য আরেকবার ওজু করতে হবে। আর আবূ হানীফার মতে, দুইবার ওজু করার দরকার নেই, একবার ওজু করলে এক ওজুতে দুই সালাত আদায় করতে পারবে।-সংকলক

২০৪. আস-সামারুল মুস্তাতাব, ১/৪০

২০৫. সুনানু আবী দাউদ, ৩০৫

স্রাব না দেখলে অজু না ভাঙা পর্যন্ত এক অজুতে ইচ্ছেমতো সালাত আদায় করার সুযোগ আছে। আর সেই অজু ভাঙতে পারে স্রাব আসার মাধ্যমে অথবা অন্য যে-কোনো অজু ভঙ্গের কারণের মাধ্যমে। এ হাদীসের এটাই উদ্দেশ্য। এ ছাড়া আর অন্য কোনো উদ্দেশ্য এতে নেই।[২০৬]

প্রশ্ন ৯২: মুস্তাহাযা নারীর ওপর কি প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করা ওয়াজিব?

জবাব: আসমা বিনতে উমাইস বলেন, আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফাতিমা বিনতে হুবাইশ অমুক অমুক দিন থেকে মুস্তাহাযাগ্রস্ত। সে এ কারণে সালাতও আদায় করে না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'সুবহানাল্লাহ, এটা মূলত শয়তানের পক্ষ থেকে স্রাব। সেই নারী যেন একটা বড়ো পাত্রে বসে। এরপর যদি পানির ওপর হলুদ স্রাব দেখতে পায়; তবে যেন যুহর ও আসরের জন্য একবার গোসল করে, মাগরিব ও ইশার জন্য একবার গোসল করে আর ফজরের জন্য একবার গোসল করে। আর এর মধ্যবর্তী সময়ে সে যেন অজু করে।'[২০৭]

এ হাদীসের সনদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী। এ হাদীসে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা ওয়াজিবের জন্য নয়; বরং মুস্তাহাবের জন্য।[২০৮]

প্রশ্ন ৯৩: কোনো মহিলার যদি গর্ভপাত হয় আর এ কারণে স্রাব নির্গত হয়, তবে সেই স্রাব কি নিফাস বলে গণ্য হবে?

জবাব: গর্ভপাতের দরুন যে স্রাব নির্গত হয়, তা নিফাস বলে গণ্য হবে। সেই সময় সালাত ও সিয়াম পালন করবে না।[২০৯]

প্রশ্ন ৯৪: অনেক সময় দেখা যায়, সন্তান প্রসব করার কয়েকদিন পূর্ব থেকে স্রাব নির্গত হয়। সেই স্রাব কি নিফাস বলে গণ্য হবে?

জবাব: বাচ্চা প্রসবের পূর্বের স্রাব 'ইস্তিহাযার স্রাব'। বাচ্চা প্রসবের স্রাবকে নিফাস বলা হয়। তাই প্রসবের পূর্বের স্রাব নির্গত অবস্থায় সালাত, সিয়ামসহ অন্যান্য ইবাদত যথারীতি অব্যাহত রাখতে হবে। অতএব, তা নিফাস বলে গণ্য হবে না।[২১০]

---

২০৬. সহীহ সুনানু আবী দাউদ, ২/১১২-১১৩
২০৭. সুনানু আবী দাউদ, ২৯৬
২০৮. সহীহ সুনানু আবী দাউদ, ২/৯১
২০৯. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/৫৫৫
২১০. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/৫৫৫-৫৫৬

প্রশ্ন ৯৫: গর্ভবতী অবস্থায় যে রক্ত নির্গত হয়, তার বিধান কী? সে রক্ত কি হায়েযের রক্ত বলে গণ্য হবে?

জবাব: রাসূলুল্লাহ ﷺ আওতাসের বন্দিদের ব্যাপারে বলেন,

لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ

গর্ভবতীর সঙ্গে মিলন করা যাবে না, গর্ভপাত না হওয়া পর্যন্ত। আর যারা গর্ভবতী নয় তাদের সাথে মিলন করা যাবে না, হায়েয না হওয়া পর্যন্ত।[২১১]

হাদীসটি একাধিক সনদের ভিত্তিতে সহীহ। 'মানারুস সাবীল' গ্রন্থকার হাদীসটিকে এ ব্যাপারে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন যে, গর্ভবতী মহিলা রক্ত নির্গত হতে দেখলে, তা হায়েয হিসেবে ধর্তব্য হবে না। কেননা হাদীস অনুযায়ী, একজন মহিলা গর্ভবতী নয় তখন প্রমাণ হবে, যখন তার হায়েযের রক্ত নির্গত হবে। সুতরাং গর্ভবতী মহিলার হায়েয হলে 'হায়েয না হওয়াকে' গর্ভবতী না হওয়ার নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা হতো না।

এই মতের পক্ষে আরেকটি প্রমাণ রয়েছে। হাদীসটি দুই সনদে ইমাম দারিমী (১/২২৭, ২২৮) বর্ণনা করেছেন। আতা ইবন আবী রাবাহ বর্ণনা করেন আয়েশাহ থেকে। আয়েশাহ বলেন, 'গর্ভবতী মহিলার হায়েয হয় না। গর্ভবতী অবস্থায় কেউ রক্ত দেখলে, সে যেন গোসল করে সালাত আদায় করে।' এ হাদীসের সনদ সহীহ।[২১২]

প্রশ্ন ৯৬: নিফাসের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সীমা কতদিন?

জবাব: নিফাসের সর্বনিম্ন সীমা নিয়ে একাধিক মত রয়েছে। তবে সঠিকতার সবচেয়ে নিকটবর্তী মত হচ্ছে, এর সর্বনিম্ন কোনো সীমা নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যদি এর পূর্বেই পবিত্রতা দেখো।' আর এটাই ইমাম শাফিয়ী ও ইমাম মুহাম্মাদের মত। এ মতের পক্ষে রয়েছেন শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ ও ইবন হাযম।[২১৩]

আর নিফাসের সর্বোচ্চ সীমা হলো, চল্লিশ দিন। উম্মু সালামাহ ﷺ বলেন, নববী যুগে নিফাসগ্রস্ত মহিলারা চল্লিশ দিন বসে থাকত। আর আমরা চেহারার দাগ দূর করার জন্য ওয়ারস নামক ঘাস ব্যবহার করতাম।[২১৪]

২১১. সুনানু আবী দাউদ, ২১৫৭; মিশকাতুল মাসাবীহ, ৩৩৩৮, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
২১২. ইরওয়াউল গালীল, ১৮৭
২১৩. আস-সামারুল মুস্তাতাব, ১/৫১
২১৪. সুনানু আবী দাউদ, ৩১১, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আস-সামারুল মুস্তাতাব, ১/৪৫

অধ্যায় পাঁচ

অজু

প্রশ্ন ১৭: অজুর পদ্ধতি যদি বিস্তারিত বর্ণনা করতেন!

জবাব: অজুর পদ্ধতি হচ্ছে, মিসওয়াক করা।

শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা।[২১৫]

তিন বার দুই কবজি ধোয়া।[২১৬] এটি সুন্নাত।

কুলি করা, নাকি পানি দেওয়া এবং নাক ঝেড়ে ফেলা।[২১৭] এগুলো ওয়াজিব। নবী ﷺ একসঙ্গে কুলি করতেন ও নাকি পানি দিতেন।[২১৮] এক কবজি পানি নিয়ে অর্ধেক মুখে দিতেন আর বাকি অর্ধেক নাকে দিতেন। ডান হাত দিয়ে নাকে পানি দিতেন আর বাম হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলতেন। রোজা অবস্থা ব্যতীত নাকে ভালোভাবে পানি দিতে তিনি আদেশ দিয়েছেন।[২১৯]

মুখমণ্ডল ধোয়া। এটি ফরজ।[২২০] দাড়ি খিলাল করা[২২১] মুস্তাহাব।

কনুইসহ দুই হাত ধোয়া।[২২২] তিনি এ ক্ষেত্রে খিলাল করার আদেশ দিয়েছেন।

পুরো মাথা মাসাহ করা ফরজ।[২২৩] মাথা মাসাহ করার পদ্ধতি হচ্ছে, দুই হাত দ্বারা মাথার অগ্রভাগ থেকে মাসাহ শুরু করবে তারপর তার ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যাবে। তারপর ঘাড় থেকে শুরু করে সেখানে আবার ফিরিয়ে আনবে, যেখান থেকে মাসাহ শুরু করা হয়েছিল।[২২৪] তিন

---

২১৫. সুনানু আবী দাউদ, ১০১
২১৬. সহীহুল বুখারী, ১৫৯
২১৭. সহীহুল বুখারী, ১৫৯, ১৬১
২১৮. সুনানু আবী দাউদ, ১১১
২১৯. সুনানু আবী দাউদ, ১৪২; সুনানুত তিরমিযী, ৭৮৮
২২০. সূরা মায়িদাহ, ৫:৬
২২১. সুনানু আবী দাউদ, ১৪৫; সুনানুত তিরমিযী, ২৯, ৩১
২২২. সূরা মায়িদাহ, ৫:৬
২২৩. সূরা মায়িদাহ, ৫:৬
২২৪. সহীহুল বুখারী, ১৮৫

বার মাসাহ করা[২২৫] মুস্তাহাব। মাথায় পাগড়ি থাকলে মাথার কিয়দাংশ মাসাহ করা যথেষ্ট।[২২৬] উল্লেখ্য, পাগড়ির ওপর মাসাহ করা যাবে।[২২৭]

মাথার অবশিষ্ট পানি দিয়ে দুই কান মাসাহ করা[২২৮] মুস্তাহাব।

দুই পা ধোয়া ফরজ।[২২৯] এমনকী দুই নলা বা পেশুলি ধৌত করা শরীআতসিদ্ধ। ধোয়ার সময় পায়ের গোড়ালি না ভিজলে জাহান্নামের শাস্তি পেতে হবে।[২৩০] অজু বা অন্যান্য ক্ষেত্রে ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে খিলাল করতে হবে।[২৩১] নবী ﷺ বলেছেন,

> তোমরা কাপড় পরলে এবং অজু করলে ডান দিকে থেকে শুরু করবে।[২৩২]

তিনি কখনো একবার এক বার করে, কখনো দুবার দুবার করে আবার কখনো তিন তিন বার করে অজু করতেন। তিনি বলেছেন, 'কেউ এর অতিরিক্ত করলে খারাপ কাজ করবে, বাড়াবাড়ি ও জুলুম করবে।'[২৩৩]

অজুর শেষে এই দুআটি পড়া মুস্তাহাব :

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

উচ্চারণ: আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু[২৩৪] আল্লাহুম্মাজআলনী মিনাত তাওওয়াবীনা ওয়াজআলনী মিনাল মুতাতাহহিরীন।[২৩৫]

---

২২৫. সুনানু আবী দাউদ, ১০৭
২২৬. সহীহ মুসলিম, ২৭৪ (৮)
২২৭. সহীহুল বুখারী, ২০৫
২২৮. সুনানুত তিরমিযী, ৩৩
২২৯. সূরা মায়িদাহ, ৫:৬
২৩০. সহীহুল বুখারী, ৬০, ১৬৩; সহীহ মুসলিম, ২৪১
২৩১. সুনানু আবী দাউদ, ১৪৮; সুনানুত তিরমিযী, ৪০
২৩২. সুনানু আবী দাউদ, ৪১৪১; আলবানী এই হাদীসের সনদকে সহীহ বলেছেন।
২৩৩. সুনানুন নাসায়ী, ১৪০; সুনানু ইবন মাজাহ, ৪২২, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।
২৩৪. সহীহ মুসলিম, ২৩৪
২৩৫. সুনানুত তিরমিযী, ৫৫

অথবা এই দুআটি পড়বে:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

উচ্চারণ: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।[২৩৬]

প্রশ্ন ৯৮: অজুর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা কি ওয়াজিব?

জবাব: অজুর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলার সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী দলিল হচ্ছে, আবু হুরাইরাহ সূত্রে বর্ণিত মারফূ হাদীস। হাদীসটি হচ্ছে,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ

যার অজু নেই তার কোনো সালাত নেই, আর যে বিসমিল্লাহ বলেনি তার কোনো অজু নেই।[২৩৭]

এ হাদীসের তিনটি সনদ এবং অনেক শাহিদ হাদীস রয়েছে। সহীহ সুনানু আবী দাউদ হাদীস নং ৯০-এ আমি তা নিয়ে আলোচনা করেছি। [ফিকহুস সুন্নাহর] লেখক (সাইয়্যিদ সাবিক) যখন হাদীসটিকে শক্তিশালী বলে মেনে নিয়েছেন, তখন তার ওপর আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায় যে, হাদীস থেকে যা প্রমাণ হয়, তিনি তা মেনে নেবেন। হাদীস থেকে প্রমাণ হয় 'বিসমিল্লাহ' বলা ওয়াজিব। এমন কোনো দলিল নেই যা এই ওয়াজিব বিধানকে মুস্তাহাবে রূপান্তর করতে পারে। অতএব, প্রমাণ হয়, 'বিসমিল্লাহ' বলা ওয়াজিব। এটি যাহিরী মাযহাব, ইসহাক ও আহমাদ ইবন হাম্বালের দুই মতের এক মত। সিদ্দীক হাসান খান ও শাওকানী এ মতের পক্ষে। ইনশাআল্লাহ এটিই সঠিক মত।[২৩৮]

প্রশ্ন ৯৯: অজুর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে কী করণীয়?

জবাব: অজু যদি শেষ না হয় বরং অজুকালীন স্মরণ হয়, তাহলে যখন স্মরণ হবে তখন বলবে। আর যদি অজু শেষে স্মরণ হয় তাহলে আর কিছুই করতে হবে না। ইনশাআল্লাহ, মহীয়ান রব তা মার্জনা করে দেবেন। তবে শর্ত হচ্ছে, বিসমিল্লাহ বলার অভ্যাস থাকতে হবে। কেউ যদি অবহেলা ও নিজের খামখেয়ালির কারণে ভুলে যায়, তবে তা ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিপজ্জনক।[২৩৯]

---

২৩৬. ইবনুস সুন্নী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, ৩০; আস-সামারুল মুস্তাতাব, ১/১০
২৩৭. সুনানু আবী দাউদ, ১০১; সুনানুত তিরমিযী, ২৫; সুনানু ইবন মাজাহ, ৩৯৭
২৩৮. তামামুল মিন্নাহ, পৃ. ৮৯
২৩৯. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/১৮১

প্রশ্ন ১০০: শৌচাগারে অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার বিধান কী; বিশেষ করে যখন অধুনা বাথরুমগুলোতে একসঙ্গে গোসলখানা ও পায়খানা থাকে?

জবাব: এই মাসআলা নিয়ে আমি অনেক আলোচনা করেছি। তবে আপনি যদি সংক্ষিপ্তকারে জবাব চান তাহলে বলব, পেশাব-পায়খানার সময় কাপড় খোলার ও পায়খানায় বসার ঠিক আগমুহূর্তে 'বিসমিল্লাহ' বলতে হয়। এক্ষেত্রে সেই শৌচাগার ছোটো হোক বা তাতে একসঙ্গে গোসলখানা ও পায়খানা থাকুক, তাতে অসুবিধা নেই। ধরুন, একই রুমে গোসলখানা ও পায়খানা আছে। সেই গোসলখানায় সে অজু করে। তো এ ক্ষেত্রে সেই পায়খানায় বসার ও কাপড় খোলার ঠিক আগমুহূর্তে 'বিসমিল্লাহ' বলবে। আবার সেখান থেকে নামার পর বা আসার পর 'গুফরানাকা' বলবে; যদিও সে ব্যক্তি সেই রুম থেকে বের হয়নি। কেননা সেই ব্যক্তি পায়খানা থেকে গোসলখানায় চলে এসেছে। এমন পায়খানার ক্ষেত্রে কাপড় ঠিকঠাক করে নেওয়া এবং এক কদম চলাটাই পায়খানা থেকে বের হওয়ার নামান্তর।[২৪০]

প্রশ্ন ১০১: অজুর সময় আংটি নাড়ানো কি ওয়াজিব?

জবাব: আংটি যদি সংকীর্ণ হয় এবং খুব ভালোভাবে আঙুলের সাথে লেগে থাকে তাহলে নাড়ানো আবশ্যক।[২৪১]

প্রশ্ন ১০২: এক হাদীসে পাওয়া যায়, মুমিনের অঙ্গ ততদূর পর্যন্ত চমকাতে থাকবে যতদূর পর্যন্ত অজু করা হবে। এ কারণে আবু হুরাইরাহ ﷺ অজু করার সময় বগল পর্যন্ত হাত ধুতেন। এরূপ করা কি মুস্তাহাব?

জবাব: উল্লিখিত হাদীস কি প্রমাণ করে উজ্জ্বলতা ও শুভ্রতা বৃদ্ধি করার নিমিত্তে অজুর অঙ্গগুলো দীর্ঘ ও লম্বা করে ধোয়া মুস্তাহাব? আমি মনে করি, আবু হুরাইরাহ ﷺ'র নিজস্ব মতামত ও আমল গ্রহণ না করলে, সেই হাদীস দ্বারা তা প্রমাণ হয় না। কেননা হাদীসে বলা হয়েছে 'অজুর সীমা পর্যন্ত'। আর স্পষ্টত বোঝা যায়, অজুর সীমা বলতে উদ্দেশ্য শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। ফলে শরীআতে যদি দীর্ঘ ও লম্বা করার কথা প্রমাণিত না হয়, তাহলে দীর্ঘ ও লম্বা করা জায়েয নয়, যা কারো অজানা নয়। যদি হাদীস দ্বারা তা বোঝাও যায়, তবুও বাহু ধোয়া প্রমাণ হয় না। কেননা বাহু শুভ্রতা ও উজ্জ্বলতার অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণে ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ 'হাদীউল আরওয়াহ ইলা বালাদিল আফরাহ' (১/৩১৫-৩১৬)

২৪০. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/১৮৬
২৪১. তামামুল মিন্নাহ।

গ্রন্থে বলেন, 'এ হাদীস দ্বারা কেউ কেউ প্রমাণ করতে চান, বাহু ধোয়া ও তা লম্বা করা মুস্তাহাব। সঠিক কথা হচ্ছে, তা মুস্তাহাব নয়। এটাই মদীনাবাসীদের মত। ইমাম আহমাদের দুই মতের এক মত। এ হাদীস লম্বা করে ধোয়া প্রমাণ করে না। কেননা অলংকৃত হয় কনুই ও কবজি; কাঁধ ও বাহু অলংকৃত হয় না।'

যারা উজ্জ্বল ও শুভ্রতা লম্বা করার পক্ষে, তারা আরেকটি হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেন। হাদীসটি হলো, আমার উম্মত অজুর প্রভাবে তাদের দীপ্তিমান মুখমণ্ডল ও হাত-পা অবস্থায় (হাশরের ময়দানে) উঠবে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে তার উজ্জ্বলতা বাড়াতে চায়, সে যেন তা করে।[২৪২] এই হাদীসটি বুখারী-মুসলিম বর্ণনা করেছেন। তবে 'কাজেই তোমাদের মধ্যে যে তার উজ্জ্বলতা বাড়াতে চায়, সে যেন তা করে' অংশটুকু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি নয়; বরং তা আবু হুরাইরাহ ﷺ'র উক্তি, যেমনটি বলেছেন মুনযিরী, ইবন তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়িম, আসকালানী প্রমুখ একদল হাফিযে হাদীস। এ অংশ নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'সিলসিলাতুয যঈফাহ' গ্রন্থে। এখানে তা আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। এ অংশটুকু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হলেও তা দ্বারা উজ্জ্বলতা ও দ্বীপ্তি বৃদ্ধি করা মুস্তাহাব প্রমাণ হয়; লম্বা করে বাহু ধোয়া প্রমাণ হয় না।[২৪৩]

প্রশ্ন ১০৩: নাকে কঠিন অ্যালার্জির কারণে তাতে পানি না দিলে কি অজু হবে?

জবাব: নাকে পানি দেওয়ার কারণে যদি অসুখ বৃদ্ধি পায়, তবে নাকে পানি না দিলে এবং নাক না ঝাড়লেও অজু হয়ে যাবে।[২৪৪]

প্রশ্ন ১০৪: একাধিকবার মাথা মাসাহ করার বিধান কী?

জবাব: একাধিকবার মাথা মাসাহ করা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। উসমান ﷺ বলেন, নবী ﷺ তিনবার স্বীয় মাথা মাসাহ করেন। হাদীসটি আবু দাউদ দুটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।[২৪৫] এ ছাড়া হাদীসটির তৃতীয় আরেকটি হাসান সনদ আছে। আমি এই তিন সনদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি সহীহ আবু দাউদ (নং ৯৫-৯৮)-এ। হাফিয ইবন হাজার আসকালানী ফাতহুল বারীতে বলেন, 'উসমান ﷺ'র তিনবার মাথা মাসাহ সংক্রান্ত হাদীসটি আবু দাউদ দুই

---

২৪২. সহীহুল বুখারী, ১৩৬; সহীহ মুসলিম, ৪৬৭

২৪৩. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ১/১/৫০৮-৫০৯

২৪৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/১৯৫

২৪৫. সুনানু আবী দাউদ, ১০৭

সনদে বর্ণনা করেছেন, যা একটিকে ইবন খুযাইমাহসহ প্রমুখ সহীহ বলেছেন। আর বিশ্বস্ত রাবী যদি অতিরিক্ত অংশসহকারে হাদীস বর্ণনা করেন, তবে সেই অতিরিক্ত অংশ গ্রহণযোগ্য।' ইবন হাজার আসকালানী 'তালখীস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইবনুল জাওযী 'কাশফুল মুশকিল' গ্রন্থে একাধিকবার মাসাহ করার হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

আমার মতে এটাই সঠিক। একবার মাসাহ করার হাদীস পরিমাণে অধিক হলেও তিনবার মাসাহ করার সাথে তার কোনো দ্বৈরথ ও দ্বন্দ্ব নেই। তিনবার মাসাহ করাও সুন্নাত। তাই মাঝেমধ্যে দুটোর প্রতি আমল করা যায়। এটাই সানআনীর মত। তার মত জানতে দেখা যেতে পারে 'সুবুলুস সালাম' গ্রন্থ।[২৪৬]

প্রশ্ন ১০৫: কেউ যদি পেছনের দিক থেকে মাথা মাসাহ করে, তাহলে কি তার অজু হবে?

জবাব: মালিক বর্ণনা করেন আমর ইবন ইয়াহইয়া মাযিনী থেকে, মাযিনী বর্ণনা করেন তার পিতা থেকে। তার পিতা আবদুল্লাহ ইবন যাইদ ইবন আসিমকে বলেন, 'আপনি কি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অজুর পদ্ধতি দেখাতে পারবেন?' আবদুল্লাহ ইবন যাইদ বলেন, 'হ্যাঁ পারব।' এরপর তিনি অজুর পানি নেন। তিনি তার দুই হাতে পানি ঢেলে উভয় হাতই ধুয়ে ফেলেন। তারপর তিনবার কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। এরপর তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন। অতঃপর দুইবার করে কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধুলেন। এরপর দুই হাত দিয়ে মাথা মাসাহ করেন। হাত এভাবে আগে ও পেছনে নিয়ে গেলেন; মাথার অগ্রভাগ থেকে শুরু করে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যান, তারপর আবার ঘাড় থেকে সেই স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন, যেখান থেকে শুরু করেন। অতঃপর দুই পা ধুলেন।[২৪৭]

হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। বুখারী, মুসলিম এবং আবু আওয়ানাহ তাদের সহীহ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তিরমিযী বলেন, মাথা মাসাহ সংক্রান্ত মাসআলায় এটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীস।

রুবাই বিনত মুআওউয ইবন আফরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে আগমন করতেন। একদিন তিনি বললেন, আমার জন্য অজুর পানির ব্যবস্থা করো। রুবাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে অজুর পদ্ধতি বর্ণনা করেন, তাতে রয়েছে, তিনি তিনবার তাঁর কবজি ধৌত করেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন, একবার কুলি করেন ও নাকে পানি দেন, তিনবার

২৪৬. তামামুল মিন্নাহ, ৯১
২৪৭. সহীহুল বুখারী, ১৮৬; সহীহ মুসলিম, ৪৪৫; সুনানুত তিরমিযী, ৩২

করে দুই হাত ধৌত করেন। এরপর মাথা মাসাহ করেন দুইবার; প্রথমবার পেছন দিক থেকে শুরু করেন, দ্বিতীয়বার সামনের দিক থেকে। উভয় কানের বাহির ও ভেতরও মাসাহ করেন। অতঃপর তিনবার করে দুই পা ধৌত করেন।[২৪৮]

এ হাদীসের সনদ হাসান। তিরমিযী একে হাসান হাদীস বলেছেন। হাকিম ও যাহাবী শক্তিশালী বলেছেন। হাসান বলার পর তিরমিযী বলেন, 'হাদীসটি হাসান। তবে পূর্বের আবদুল্লাহ ইবন যাইদের হাদীস এর থেকে বেশি সহীহ এবং অধিক উত্তম সনদবিশিষ্ট।'

তিরমিযী যা বলেছেন, তা সঠিক। তবে উভয় হাদীসের মাঝে কোনো দ্বিচারিতা নেই। কেননা উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন হাদীস। এ হাদীস অনুযায়ী পেছন দিক থেকে মাথা মাসাহর সূচনা জায়েয আর পূর্বের হাদীস অনুযায়ী সামনের দিক থেকে মাথা মাসাহর সূচনা জায়েয। উভয়টি সুন্নাত।[২৪৯]

প্রশ্ন ১০৬: সমাজে অনেক মানুষকে ঘাড় মাসাহ করতে দেখা যায়। 'ঘাড় মাসাহ' করা কি হাদীস দ্বারা সমর্থিত?

জবাব: নবী ﷺ থেকে উদ্ধৃত করা হয়, তিনি বলেন, 'ঘাড় মাসাহ করা বেড়ির শৃঙ্খল থেকে নিরাপত্তা।' হাদীসটি জাল।[২৫০]

এধরনের সকল হাদীস মুনকার। যেসব হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অজুর পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, সেসব হাদীসের পরিপন্থি উপরি-উক্ত হাদীসটি। সেসব হাদীসের কোথাও ঘাড় মাসাহ করার কথা উল্লেখ করা হয়নি। তবে হ্যাঁ, তালহাহ ইবন মুসাররিফ তার পিতা, তার পিতা তার দাদার সূত্রে যে হাদীস বর্ণনা করেন, তাতে রয়েছে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একবার মাথা মাসাহ করতে দেখেছি। তিনি ঘাড়ের শুরু পর্যন্ত মাসাহ করেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'তিনি মাথার অগ্রভাগ থেকে শেষ পর্যন্ত মাসাহ করেন, এমনকী উভয় হাত কানের নিচ দিয়ে বের করেন।'[২৫১] হাদীসটি আবু দাউদসহ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে তিনটি ত্রুটি আছে। একেকটি ত্রুটি হাদীসটি দুর্বল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কাজেই যে হাদীসের মাঝে এমন তিনটি ত্রুটির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, তার অবস্থা কী হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

২৪৮. সুনানুত তিরমিযী, ১২৬
২৪৯. সহীহ সুনানু আবী দাউদ, ১/২১২
২৫০. সিলসিলাতুয যঈফাহ, ৬৯
২৫১. সুনানু আবী দাউদ, ১৩২

ত্রুটি তিনটি হলো: দুর্বল রাবী, অপরিচিত রাবী এবং মুসাররিফের পিতার সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য। এ কারণে হাদীসটি নববী, ইবন তাইমিয়্যাহ ও আসকালানী প্রমুখগণ দুর্বল বলেছেন। যঈফ সুনানু আবী দাউদে (হাদীস নং ১৫-এ) আমি তা আলোচনা করেছি।[২৫২]

প্রশ্ন ১০৭: অনেকেই বলে থাকে, অজু করার পর অজুর অঙ্গগুলো মোছা ও ঝাড়া যাবে না? একথা কতটুকু সঠিক?

জবাব: ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মায়মূনাহ বলেন, আমি নবী ﷺ-এর জন্য গোসলের জন্য পানি রাখি এবং কাপড় দিয়ে চারিদিকে পর্দা করে দেই। তিনি হাতের ওপর পানি ঢালেন এবং তা ধুয়ে নেন। এরপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধুয়ে নেন। এরপর মাটিতে হাত মেরে হাত ঘষে নেন, অতঃপর তা ধুয়ে নেন। এরপর কুলি করেন ও নাকি পানি দেন। তারপর মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করেন। এরপর মাথায় পানি ঢালেন এবং গোটা শরীরে পানি প্রবাহিত করেন। এরপর একটু সরে গিয়ে দুই পা ধৌত করেন। আমি তাকে কাপড় দিলে তিনি না নিয়ে দুই হাত ঝাড়তে ঝাড়তে চলে যান।[২৫৩]

বোঝা যায়, পানি দূর করার জন্য তিনি হাত ঝাড়েন। যারা বলেন, 'অজু বা গোসল শেষে ঝাড়া নিষিদ্ধ কারণ এর মাধ্যমে ইবাদতের আলামত বা চিহ্ন দূর হয়ে যায়'-তাদের এ কথার কোনো ভিত্তি শরীআতে নেই। নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত একটি হাদীস পাওয়া যায়। হাদীসটি হলো, 'তোমরা অজু করলে তোমাদের হাত ঝাড়বে না।' হাদীসটি দুর্বল। আবু হুরাইরাহ থেকে কেবল দায়লামী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যেমনটি সুয়ূতীর আল-জামিউল কাবীর (১/৫০/১) গ্রন্থে রয়েছে।

তাই পূর্বের ও পরের হাদীসের মাঝে সমন্বয় করা বৃথা চেষ্টামাত্র, যেমনটি কতক ব্যাখ্যাকার করে থাকেন।[২৫৪]

অজুর অঙ্গগুলো না মোছার ব্যাপারে আরেকটি হাদীস পাওয়া যায়। হাদীসটি হলো: নবী ﷺ বলেন, 'যে-ব্যক্তি অজু করে পরিষ্কার কাপড়ে মুছে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। আর যে মুছে না সে উত্তম। কেননা অজু কেয়ামতের দিন সমস্ত আমলের সাথে নূর হবে।'

হাদীসটি একেবারেই দুর্বল। যারা হাত না মোছার কথা বলে তাদের মূল হাদীস এটি। তাদের কিতাবে এ হাদীসের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। পরবর্তীদের মাঝে প্রচলিত কথা হচ্ছে, 'রুমাল

২৫২. সিলসিলাতুয যঈফাহ, ১/১৬৯-১৭০
২৫৩. সহীহুল বুখারী, ৪৩৬; সহীহ মুসলিম, ৩১৭
২৫৪. আত-তালীক আলা মিশকাতিল মাসাবীহ, ১/১৩৬

দিয়ে অজুর পানি না মোছাই অজুকারীর জন্য ভালো ও উত্তম। কেননা তা নূর।' তাহলে জানা গেল তাদের দলিল একেবারেই দুর্বল। এমন হাদীসের ওপর নির্ভর করা যায় না।[২৫৫]

প্রশ্ন ১০৮: শরীরে তেল, চর্বি বা পিচ্ছিল কোনো কিছু লেগে থাকলে কীভাবে অজু করবে?

জবাব: যথাসাধ্য সেই পিচ্ছিল বস্তু দূর করবে। তা দূর করতে কোনো কিছু ব্যবহার করবে। এরপরও দূর না হলে বা অবশিষ্ট থাকলে তা দূর করতে চামড়া কেটে ফেলতে শরীআত বলেনি। এ ক্ষেত্রে নিম্নের অবস্থাগুলো হয়ে থাকে:

ক. একদল এসব পিচ্ছিল বস্তুগুলো কিছুই মনে করে না। ধরে নেয় তা পানি। অথচ তা পানি নয়; বরং চামড়ার যেসব স্থানে পানি পৌঁছাতে শরীআত নির্দেশ দিয়েছে, সেসব স্থানে পানি পৌঁছাতে তা প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। আর এটা কোনোভাবেই জায়েয নয়। এমন লোকদের অজু বিশুদ্ধ হবে না। ফলে তার সালাতও বাতিল হয়ে যাবে। আর আমরা এমনটা কারো থেকে আশা করি না।

খ. আরেকদল সাধ্যমতো তা দূর করতে সচেষ্ট থাকে। দূর করতে কোনো কিছু ব্যবহারও করে; যদিও পিচ্ছিলতা সম্পূর্ণ দূর হয় না। এমনটা করা সকল মুসলিমের ওপর ওয়াজিব।

গ. তৃতীয় দল প্রথম দলের ঠিক উলটো মেরুর। তারা এমনভাবে ঘষাঘষি করে যে, চামড়া পর্যন্ত তুলে ফেলে। এটা শরীরকে কষ্ট দেওয়া। শরীআতের দৃষ্টিতে এমনটি করা জায়েয নয়।

একদল শিথিলতা করে, অন্যদল সঠিকপন্থা অবলম্বন করে আর তৃতীয় দল বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জিত করে। কী করলে বা কী ব্যবহার করলে তেল জাতীয় পিচ্ছিল বস্তু দূর হয়ে যাবে, তা আমাদের চেয়ে তারা ভালো জানেন যারা তৈলাক্ত বিষয় নিয়ে কাজ করেন। পিচ্ছিলতা দূরকারী বস্তু ব্যবহার করার পরও যদি পিচ্ছিলতা অবশিষ্ট থেকে যায় তবে কোনো অসুবিধা নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

আল্লাহ কোনো নফসকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না।[২৫৬]

---

২৫৫. সিলসিলাতুয যঈফাহ, ৪/১৭৮
২৫৬. সূরা বাকারাহ, ২:২৮৬; তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/২০৬

প্রশ্ন ১০৯: অজু করার সময় প্লাস্টিক সার্জারি করে লাগানো পা বা অন্যান্য অঙ্গ কি ধোয়া লাগবে?

জবাব: যদি পুরোপুরি প্লাস্টিকের পা হয়ে থাকে তাহলে তা এমন পা নয় যা ধোয়া অথবা মাসাহ করা ওয়াজিব। সুস্থ-সবল পা ধুতে হয়।[২৫৭]

প্রশ্ন ১১০: অজু করার পর কারো যদি দু'এক ফোঁটা পেশাব পড়ে, তাহলে কি তাকে পুনরায় অজু করতে হবে?

জবাব: যদি তার ফোঁটায় ফোঁটায় পেশাব ঝরার অসুখ থাকে তাহলে তার বিধান হবে একরকম, আর যদি অসুখ না থাকে বরং এমনিতেই কোনো কারণবশত ঝরে তাহলে তার বিধান হবে ভিন্ন রকম।

যদি তার পেশাব ঝরার অসুখ থাকে তাহলে তাকে সালাতের ওয়াক্ত হওয়ার পরে অজু করতে হবে; সালাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে সে অজু করতে পারবে না। ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর অজু করলে এবং অজু করার পর পেশাব ঝরলে, সে সেই অজুতে সালাত আদায় করে নেবে। আর যদি অসুখ না থাকে বরং অসাবধানতা বা অন্য কোনো কারণে অজু করার পর পেশাব ঝরে, তাহলে সে সেই অজুতে সালাত আদায় করতে পারবে না; বরং নতুন করে অজু করতে হবে।

অতএব, বিস্তারিত জবাব হচ্ছে, পেশাব ঝরার রোগ থাকলে আযানের পর অজু করতে হবে এবং ইচ্ছেমতো ও সহজমতো সেই অজুতে সালাত আদায় করে নেবে আর যদি অসুখ না থাকে তাহলে নতুন করে অজু করতে হবে এবং পুনরায় সালাত আদায় করতে। এ ছাড়াও তাকে তার শরীর ও কাপড় পবিত্র করতে হবে।[২৫৮]

প্রশ্ন ১১১: কোন কোন ক্ষেত্রে অজু করা মুস্তাহাব?

জবাব: অজু থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক সালাতের জন্য নতুন করে অজু করা। আগুনে পাকানো খাবার খেয়ে অজু করা। আল্লাহর যিকির ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য। বমি করার পর। অজু ভেঙে যাবার পর পুনরায় অজু করা।[২৫৯]

---

২৫৭. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/২০৬
২৫৮. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/২০৭
২৫৯. আস-সামারুল মুস্তাতাব, ১/২২

প্রশ্ন ১১২: কী কী কারণে অজু ভেঙে যায়?

জবাব: অজু ভঙ্গের কারণসমূহ হচ্ছে :

পেশাব-পায়খানা। হাদীসে এসেছে; আল্লাহ তাআলা তোমাদের কারো সালাত কবুল করেন না পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার পর অজু না করা পর্যন্ত।[২৬০] অন্য হাদীসে এসেছে; বায়ুর দুর্গন্ধ অথবা বায়ুর আওয়াজ ছাড়া অজু নেই।[২৬১]

মাযী বের হওয়া। মাযী বের হলে অজু করতে হবে।[২৬২]

ঘুম। সাহাবীগণ বলেন, 'সফরে থাকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আদেশ দিতেন, আমরা যেন তিন রাত ও তিন দিন আমাদের মোজা না খুলি পেশাব, পায়খানা ও ঘুমের কারণে। তবে নাপাক হয়ে গেলে ভিন্ন কথা।[২৬৩] এটাই হাসান বাসরী, মুযানী, আবু উবাইদ কাসিম ইবন সাল্লাম, ইবন রাহাওয়াইহ ও ইবন মুনযিরের মত। এ মতের পক্ষে রয়েছেন ইবন হাযমও।

উটের গোশত ভক্ষণ করা। এ মত দিয়েছেন আহমাদ ইবন হাম্বাল, ইসহাক, ইবনু মুনযির, ইবন খুযাইমাহ, বাইহাকী ও ইবন হাযম। ইমাম শাফিয়ী বলেছেন, এ সংক্রান্ত হাদীসটি সহীহ হলে আমি এ মতের পক্ষে। সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় নববী বলেছেন, দলিলের দিক থেকে এ মতটি সর্বাধিক শক্তিশালী; যদিও অধিকাংশ আলেম এ মতের পক্ষে নয়। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ এ মতকে বেশ জোরালোভাবে উল্লেখ করেছেন এবং এ মতের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। এটাই শাওকানীর মত।

উত্তেজনা সহকারে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা।[২৬৪]

প্রশ্ন ১১৩: লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে কি অজু ভেঙে যাবে?

জবাব: বুসরা বিনত সাফওয়ান বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'যে-ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করে সে যেন অজু করে নেয়।'[২৬৫] এ হাদীসের সনদ বুখারীর শর্তানুযায়ী সহীহ।

২৬০. সহীহুল বুখারী, ৬৯৫৪; সহীহ মুসলিম, ৪২৫
২৬১. সুনানুত তিরমিযী, ৭৪; সুনানু ইবন মাজাহ, ৫১৫, হাদীসটিকে আলবানী সহীহ বলেছেন।
২৬২. সুনানুত তিরমিযী, ৭৩৬৭, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
২৬৩. সুনানুত তিরমিযী, ৯৬, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
২৬৪. আস-সামারুল মুস্তাতাব, ১/২১
২৬৫. সুনানু আবী দাউদ, ১৮১, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

কাইস ইবন তলক তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তলক বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গমন করি। সেই সময় এক ব্যক্তির আগমন ঘটে। তাকে দেখে গ্রাম্য ব্যক্তি মনে হলো। সে এসে বলল, 'ইয়া নবীয়াল্লাহ! অজু করার পর কোনো ব্যক্তি নিজ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে তার ব্যাপারে আপনি কী বলেন?' তিনি বলেন, 'এটা তো তারই একটা মাংস টুকরো।'[২৬৬] এ হাদীসের সনদ সহীহ।

নিঃসন্দেহে প্রথমে উল্লিখিত বুসরার হাদীস তলকের হাদীস অপেক্ষা বেশি সহীহ। বুসরার হাদীসের সনদ সুপ্রসিদ্ধ। তার হাদীসের একাধিক শক্তিশালী শাহিদ হাদীস রয়েছে। এর বিপরীতে তলকের হাদীসের শাহিদগুলোর সনদ দুর্বল। 'নাসবুর রায়াহ' ও 'তালখীস' পড়লে তা যে-কেউ জানতে পারবে।

তবে তলকের হাদীসও সহীহ। তাই বলে এক হাদীসকে নাসিখ-রহিতকারী আর অন্য হাদীসকে মানসূখ-রহিত দাবির করার কোনো আবশ্যকতা নেই। কেননা উভয় হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব। তা হলো : উত্তেজনা ছাড়াই লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অজু ভাঙবে না। উত্তেজনা ছাড়া স্পর্শ করলে তা যেন তার শরীরের অন্যান্য মাংস টুকরোর মতো একটি টুকরো। আর উত্তেজনা সহকারে স্পর্শ করলে বুসরার হাদীসের প্রতি আমল করতে হবে অর্থাৎ অজু ভেঙে যাবে। কেননা তখন লজ্জাস্থান তার শরীরের অন্যান্য মাংস টুকরোর মতো থাকে না; কেননা শরীরের অন্যান্য মাংসের টুকরো উত্তেজনা সহকারে স্পর্শ করা হয় না।

এই সমন্বয়ের পক্ষে রয়েছেন শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ। পরবর্তীকালে কিছু মুহাক্কিক আলেম ইবন তাইমিয়্যার মতের অনুসরণ করেন।

এ মতটি এভাবে আরও শক্তিশালী হয় যে, তলকের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জবাব মূলত এমন ব্যক্তির প্রশ্নের পিঠে ছিল, যে কি না সালাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা বিষয়ে জানতে চেয়েছিল; যেমনটি ইবন হিব্বানের বর্ণনায় রয়েছে। উল্লিখিত সমন্বয় সাধনের পক্ষে এটি একটি বলিষ্ঠ প্রমাণ। কেননা কারো অজানা নয় যে, সালাতে উত্তেজনা সহকারে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা একটি কল্পনাতীত ব্যাপার বটে।[২৬৭]

প্রশ্ন ১১৪: স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে কি অজু ভেঙে যাবে?

২৬৬. সুনানু আবী দাউদ, ১৮২, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
২৬৭. সহীহ আবূ দাউদ, ১/৩৩৪-৩৩৫

জবাব: যদি উত্তেজনা ছাড়াই স্পর্শ করে তাহলে অজু ভাঙবে না। আর উত্তেজনা সহকারে স্পর্শ করলে ভেঙে যাবে।[২৬৮]

প্রশ্ন ১১৫: মা তার ছোটো বাচ্চাকে পরিষ্কার করানোর সময় লজ্জাস্থান স্পর্শ করে। অনেক সময় লজ্জাস্থান দিয়ে নাপাক কিছু বের হয় এবং তার কিছু অংশ মার হাতে লেগেও যায়। এতে কি অজু ভেঙে যাবে?

জবাব: না, অজু ভাঙবে না।[২৬৯]

প্রশ্ন ১১৬: স্বামী সহবাস করা ছাড়া স্ত্রীর সাথে আলিঙ্গন করলে বা আমোদ-আহ্লাদ করলে অজু কি ভেঙে যাবে?

জবাব: স্ত্রীর সাথে আলিঙ্গন বা আমোদ-আহ্লাদ করতে গিয়ে বীর্যপাত [ওয়াদী বা মাযী বের] না হলে অজু ভাঙবে না।[২৭০]

প্রশ্ন ১১৭: স্ত্রীকে উত্তেজনা সহকারে চুম্বন করলে কি অজু ভেঙে যাবে?

জবাব: স্ত্রীকে উত্তেজনা সহকারে চুম্বন করলেও অজু ভাঙবে না। জ্ঞাত বিষয় যে, একজন পুরুষ যে অভিপ্রায় নিয়ে নিজ কন্যাকে চুম্বন করে; স্ত্রীকে চুম্বন করতে গিয়ে সেই অভিপ্রায় কখনোই থাকে না। নিজ কন্যাকে ভালোবেসে ও দয়ার্দ্র হয়ে একজন পিতা চুম্বন করে। অপরপক্ষে স্ত্রীকে একজন পুরুষ উত্তেজনা নিয়েই চুম্বন করে। স্ত্রীকে চুম্বন করলে উত্তেজনা কাজ করবেই। তাই স্বামী তার স্ত্রীকে উত্তেজনা সহকারে চুম্বন করলে অজু ভাঙবে না। তবে শর্ত হচ্ছে, যেন মাযীপাত বা বীর্যপাত না হয়।[২৭১]

প্রশ্ন ১১৮: উত্তেজনা, স্বপ্নদোষ কিংবা স্বামীর সাথে আলিঙ্গন করা ছাড়াই নারীদের লজ্জাস্থান দিয়ে যে তরল বস্তু বের হয় তাতে কি অজু ভেঙে যাবে? কতক ফকীহ বলেছেন, সামনের বা পেছনের লজ্জাস্থান দিয়ে কোনো কিছু বের হলেই তাতে না কি অজু ভেঙে যাবে। এ মূলনীতির আলোকে কি প্রমাণ হয়, এ কারণে তাদের অজু ভেঙে যাবে?

২৬৮. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/২৫৩
২৬৯. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/২৫৩
২৭০. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/২৫৩
২৭১. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/২৫৪

জবাব: এক মত অনুযায়ী এ ধরনের তরল বস্তুর কারণে গোসল ওয়াজিব হয় না। তবে এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ও প্রণিধানযোগ্য মত হচ্ছে, তাতে অজু ভাঙে না। স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগেও মহিলাদের লজ্জাস্থান থেকে এমন তরল বস্তু বের হতো। অথচ এ কারণে অজু নষ্ট হয়ে যাওয়ার পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর কোনো প্রমাণ নেই। তাদের অজু অবস্থায় তা বের হলে সেই অজুতেই সালাত আদায় করে নিত। সালাত অবস্থায় তা বের হলে সালাত অব্যাহত রাখত।

আর ফকীহগণ যে মূলনীতি উল্লেখ করেছেন, তা সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়। এটা সকল ফকীহর ঐকমত্যপূর্ণ মূলনীতি নয়। যেমন, ইমামু দারিল হিজরাহ ইমাম মালিক বলেন, মানুষের পেছনের রাস্তা দিয়ে যদি কোনো পাথর বা পোকা বের হয়, তাহলে অজু নষ্ট হবে না। অথচ সেটাও কিন্তু দুই রাস্তার এক রাস্তা দিয়ে বের হয়। অনুরূপভাবে সামনের রাস্তা দিয়ে পোকা বা এ জাতীয় কোনোকিছু বের হলে অজু নষ্ট হবে না। কেননা অজু ভঙ্গকারী বিষয়গুলোর পক্ষে হয় কুরআন থেকে প্রমাণ থাকতে হবে অথবা হাদীস থেকে প্রমাণ থাকতে হবে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ

অথবা তোমাদের কেউ যদি পায়খানা থেকে আসে।[২৭২]

এ আয়াতে বলা হয়নি, পেছনের রাস্তা দিয়ে যা বের হবে। আয়াতে শুধু পেশাব-পায়খানার কথা বলা হয়েছে।

সুন্নাহতে শরীআতের অনেক বিধান খুব স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কুরআনের বিধান যেমন আঁকড়ে ধরা অত্যাবশ্যক, অনুরূপ সুন্নাহর বিধানও আঁকড়ে ধরা অত্যাবশ্যক।

উদাহরণস্বরূপ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত মাযী ও ওয়াদী অজু ভঙ্গকারী বস্তু। অনুরূপভাবে উটের মাংস ভক্ষণ অজু ভঙ্গকারী বস্তু। এসব বস্তু অজু ভঙ্গকারী বলে গণ্য হবে; কারণ, এসবের পক্ষে সরাসরি দলিল রয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে, শরীআত যেসব বিষয়ে মৌন অবলম্বন করেছে, তা আমাদের জন্য রহমত। সেসব বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে বারণ করা হয়েছে। আমাদের রব আমাদের যদি কষ্টে ফেলতে চাইতেন, যেমনটি আল্লাহ বলেন, 'যদি আল্লাহ চাইতেন তোমাদের কষ্টে ফেলতে পারতেন'[২৭৩]-তাহলে বলতেন, দুই রাস্তা দিয়ে যা-কিছু বের হবে...

২৭২. সূরা নিসা, ৪:৪৩
২৭৩. সূরা বাকারাহ, ২:২২০

কুরআন ও সুন্নাহর এ ধরনের কোনো কথা পাওয়া যায় না। তাই ফকীহদের উক্ত মূলনীতি নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কিছুই নেই। যদিও দাবি করা হয় তা সঠিক মূলনীতি কিন্তু তা সর্বক্ষেত্রে সঠিক হওয়ার পক্ষে কোনো দলিল নেই, যেমনটি আমরা আলোচনা করলাম।[২৭৪]

প্রশ্ন ১১৯: এক ব্যক্তিকে ঠাট্টার ছলে ধোঁকায় ফেলে মদমিশ্রিত পানীয় পরিবেশন করা হয়। সে অজু অবস্থায় সেই পানীয় পান করে। এতে তার অজু কি ভেঙে যাবে?

জবাব: তার অজু নষ্ট হবে না। শুধু কুলি করলেই যথেষ্ট হবে।[২৭৫]

২৭৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/২৬৬
২৭৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/২৬৭

অধ্যায় ছয়

মাসাহ

প্রশ্ন ১২০: মোজার ওপর মাসাহ করার বিধান কি সহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত?

জবাব: মোজার ওপর মাসাহ করার বৈধতা সংক্রান্ত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির-এ দাবি করেছেন একাধিক আহলুল হাদীস ওয়াস সুন্নাহর ইমাম। সাহাবী ও সালাফগণ মোজার ওপর মাসাহ করতেন, এ ব্যাপারে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ আসার রয়েছে। তবে কেউ কেউ সেসব অস্বীকারও করেছেন। তাদের কাছে মাসাহ সংক্রান্ত দলিল না পৌঁছার দরুন তারা অস্বীকার করেন। এটা শুধু এই মাসআলায় নয়; অনেক ফিকহী মাসআলায় এমনটা ঘটেছে। পরবর্তীকালে যখন তাদের কাছে হাদীস পৌঁছে, তারা তাদের পূর্ববর্তী মত প্রত্যাহার করে মোজার ওপর মাসাহ শুরু করেন। অজুর আয়াতে وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ যের দিয়ে 'আরজুলাকুম' পড়লে এই আয়াত দ্বারা মাসাহ করা প্রমাণিত হয়। রাফিযী, খারিজী ও ইবাযিয়্যাহ ফিরকা আজও এই সুন্নাতকে অস্বীকার করে। তাদের এমন কাজ প্রমাণ করে যে তারা নিরেট প্রবৃত্তিপূজারি। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ বলেছেন,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

পথনির্দেশনা স্পষ্ট হওয়ার পর যে-ব্যক্তি রাসূলের ব্যাপারে বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সেদিকে পরিচালিত করব যেদিকে সে পরিচালিত হয়। আর তাকে দগ্ধ করব জাহান্নামে। তা খুব নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল[২৭৬]।[২৭৭]

প্রশ্ন ১২১: জুতার ওপর মাসাহ করা কি শরীআতসম্মত?

জবাব: পরবর্তী যুগের আলেমদের মাঝে সুপ্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, জুতার ওপর মাসাহ করা শরীআতসিদ্ধ নয়। কিন্তু আমার জানামতে, তাদের এ মতের পক্ষে কোনো দলিল নেই। তারা তাদের মতের পক্ষে ইমাম বাইহাকীর উক্তিকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি তদীয়

২৭৬. সূরা নিসা, ৪:১১৫
২৭৭. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ৬/২/১০৫৯

'সুনান' (১/২৮৮) গ্রন্থে বলেন, 'মূলগতভাবে দুই পা ধৌত করা ওয়াজিব। তবে সুন্নাহ বা মতবিরোধহীন ইজমা দ্বারা মাসাহ প্রমাণিত হলে ভিন্ন কথা। আর জুতা ও জাওরাব-কাপড়ের মোজার ওপর মাসাহ করার পক্ষে সুন্নাহ বা ইজমা উভয়টির কোনোটি নেই। আল্লাহু আলাম।'

কিন্তু তার এ উক্তি দুঃখজনক। জুতা ও জাওরাব-কাপড়ের মোজার ওপর মাসাহ সংক্রান্ত পুস্তিকায় আমি যেসব হাদীস উল্লেখ করেছি, সেসব হাদীস তার দৃষ্টিগোচর হয়নি। সেসব হাদীসের অনেকগুলোর সনদ সহীহ।

এ কারণে তুরকমানী হানাফী 'আল-জাওহারুন নাকী' (১/২৮৮) গ্রন্থে বাইহাকীর সমালোচনায় বলেন, 'এটা ঠিক নয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জুতা ও জাওরাব-কাপড়ের মোজার ওপর মাসাহ করার হাদীসকে ইমাম তিরমিযী সহীহ বলেছেন। এ সংক্রান্ত মুগীরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হুযাইলের হাদীসকে তিনি হাসান বলেছেন। এ ছাড়াও আবু মূসা ﷺ থেকে যাহহাকের হাদীসকেও তিনি হাসান বলেছেন। জুতার ওপর মাসাহ সংক্রান্ত আউসের হাদীসকে ইবন হিব্বান সহীহ বলেছেন। একইভাবে 'সুবতী' জুতার ওপর মাসাহ সংক্রান্ত ইবন উমারের হাদীসকে ইবন খুযাইমাহ সহীহ বলেছেন। আর বাইহাকী জুতার ওপর মাসাহ সংক্রান্ত ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত যাইদ ইবন হুবাবের যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, তা ভালো। ইবন কাত্তান তা সহীহ বলেছেন।'

অতএব, প্রমাণিত এসব হাদীস জানার পর এ ছাড় গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া জায়েয নয়। কেননা হাদীস সহীহ প্রমাণ হওয়ার পর শোনা ও মানা ছাড়া ভিন্ন কোনো পথ অবশিষ্ট থাকে না। বিশেষ করে যখন জুতার ওপর মাসাহ করা সাহাবীদের আমল ছিল; তাদের মধ্যে অন্যতম খলীফায়ে রাশেদ আলী ইবন আবী তালিব ﷺ। এ মতের পক্ষে কতক ইমামও ছিলেন। ইবন হাযম রাহিমাহুল্লাহ আল-মুহাল্লা (২/১০৩) গ্রন্থে বলেন, 'মাসআলা: মোজা যদি টাখনুর নিচে কাটা থাকে তবুও মাসাহ করা জায়েয। এটি আওযাঈর মত। তার থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, টাখনুর নিচে কাটা মোজার ওপর ইহরামবাঁধা ব্যক্তি মাসাহ করবে।... আর অন্যান্যগণ বলেছেন, শুধু সেই মোজার ওপর মাসাহ করবে যে মোজা টাখনু ঢেকে থাকে।'[২৭৮]

প্রশ্ন ১২২: বুটের ওপর মাসাহ করার বিধান কী? যদি কেউ বুট পরিধান করে সালাত আদায় করতে চায়, তাহলে কি তাকে বুট খুলে কাপড়ের মোজার ওপর মাসাহ করতে হবে না কি বুটের ওপর মাসাহ করাই যথেষ্ট হবে?

২৭৮. তামামুন নাসাহ ফী আহকামিল মাসাহ, পৃ. ৮২-৮৩

জবাব: পায়ে পরিধেয় বস্তুর ওপর মাসাহ সিদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, তা পবিত্র অবস্থায় পরিধান করতে হবে। পরিধেয় বস্তু বুট হতে পারে, চামড়ার মোজা হতে পারে, অথবা হতে পারে কাপড়ের মোজা বা জুতা। পায়ে যা পরিধান করা হোক, তার ওপর পূর্বের শর্ত সাপেক্ষে মাসাহ করা জায়েয।

পায়ে পরিধেয় উপর্যুক্ত বস্তু পবিত্র অবস্থায় পরিধান করলে এবং তাতে মাসাহ করলে, এরপর যদি তা খুলে ফেলা হয় তবুও অজু শুদ্ধ থাকবে; নতুন করে অজু করার বা পা ধোয়ার প্রয়োজন নেই। এরই ধারাবাহিকতায় কেউ যদি পবিত্র অবস্থায় বুট পরিধান করে, অনুরূপ পবিত্র অবস্থায় কাপড়ের মোজা পরিধান করে, এরপর যদি বুট খুলে ফেলে, তবে তার অজু শুদ্ধ থাকবে, যতক্ষণ না অজু ভঙ্গের কোনো কারণ যুক্ত হয়। বুট খুলে ফেলার পরও যদি মোজা না খুলে কিন্তু অন্য কোনো কারণে অজু ভেঙে যায়, তবে মোজার ওপর মাসাহ করা শুদ্ধ হবে; কেননা মোজা পবিত্র অবস্থায় পরিধান করেছিল। পূর্বের অবস্থায় মোজার ওপর মাসাহ শুদ্ধ হলেও বুটের ওপর মাসাহ শুদ্ধ হবে না; কারণ, বুট খোলার পর অজু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর মাসাহ করার শর্ত হচ্ছে পূর্ণ পবিত্র অবস্থায় পা-বস্ত্র পরিধান করা। অতএব, আমরা বুঝতে পারলাম, কেউ পবিত্র হয়ে অর্থাৎ অজুতে পা ধোয়ার পর মোজা পরিধান করে, এরপর অজু ভেঙে যায় অতঃপর মোজার ওপর মাসাহ করে, তারপর সে যদি বুট পরিধান করে, তবে সে পূর্ণ পবিত্র অবস্থায় বুট পরিধান করেনি। কেননা সে মোজার ওপর মাসাহ করে বুট পরিধান করেছে, পা ধুয়ে বুট পরিধান করেনি। এ অবস্থায় বুটের ওপর মাসাহ করা যাবে না, বরং তাকে বুট খুলে মোজার ওপর মাসাহ করতে হবে।[২৭৯]

প্রশ্ন ১২৩: পায়ের সাথে লেগে থাকে এমন পাতলা কাপড়ের মোজার ওপর মাসাহ করা কি বৈধ? কারো কারো মতে, যেমন; কাসানীর দাবি অনুযায়ী সবার ঐকমত্যে এমন মোজার ওপর মাসাহ করা বৈধ নয়।

জবাব: ইজমা দ্বারা যদি পূর্ব-পরবর্তী ইমামদের ইজমা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এমন দাবি বাতিল। কেননা ইমাম নববী 'শারহুল মুহাযযাব' গ্রন্থে আমীরুল মুমিনীন উমার ও আলী এবং ইসহাক ও দাউদ থেকে পাতলা কাপড়ের মোজার ওপর মাসাহ করার বৈধতা উদ্ধৃত করেছেন। এমনকী তিনি আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ থেকেও এর বৈধতার কথা তুলে ধরেছেন। এটাই ইমাম ইবন হাযমের মত। অতএব, কীভাবে ইজমার দাবি সঠিক হতে পারে? আর যদি ইজমা দ্বারা তিনি হানাফী মাযহাবের ইজমা বোঝান তাহলে কোনোরকমে মেনে নেওয়া যায়। তারপরও নববীর

২৭৯. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/২৯৩

উদ্ধৃতি অনুযায়ী আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ তাদের সাথে একমত নন। অতএব, প্রমাণ হয়, এ ব্যাপারে কোনো ইজমা নেই। তাই এটি ভালোভাবে স্মরণ রাখুন।[২৮০]

প্রশ্ন ১২৪: ছেঁড়া-ফাটা মোজার ওপর মাসাহ করা কি জায়েয?

জবাব: ছেঁড়া-ফাটা মোজার ওপর মাসাহর বৈধতা নিয়ে চরম মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশের মতে এটা জায়েয নয়। তবে তাদের মাঝে আবার ছেঁড়ার পরিমাণ নিয়ে লম্বা-চওড়া মতভিন্নতা রয়েছে। বিস্তারিত আলোচনাসমৃদ্ধ ফিকহী কিতাব ও 'মুহাল্লা'-তে তা দেখা যেতে পারে। আরেকদল আলেমের মতে ছেঁড়া মোজায় মাসাহ করা জায়েয। এটি আমার মত।

আমাদের মতের পক্ষে দলিল হচ্ছে, মূলগতভাবে মোজার ওপর মাসাহ করা জায়েয। অতএব, যারা শর্ত করেন মোজা ছেঁড়া-ফাটা হবে না এবং ছেঁড়া-ফাটার পরিমাণ নির্ধারণ করেন, তাদেরকে তাদের মতের পক্ষে দলিল পেশ করতে হবে। তাদের মতের পক্ষে দলিল না থাকায় তা বাতিল। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ

যেসব শর্ত আল্লাহর কিতাবে নেই, তা বাতিল।[২৮১]

সাওরী থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমার পায়ে যা লেগে থাকে, তার ওপর মাসাহ করো। মুহাজির ও আনসারদের মোজা ছেঁড়া-ফাটা ও ছিদ্রযুক্ত ছিল।[২৮২]

ইবন হাযম 'আল-মুহাল্লা' (২/১০০) গ্রন্থে বলেন, 'মোজা বা পা-বস্ত্রে যদি ছোটো, বড়ো, আড়াআড়ি অথবা লম্বা ছিদ্র থাকে আর সেই ছিদ্র দিয়ে এক পায়ের কিঞ্চিৎ অথবা সিংহভাগ অথবা উভয়ে পায়ের কিঞ্চিৎ অথবা সিংহভাগ প্রকাশ পায়-তবুও তাতে মাসাহ করা জায়েয, যতক্ষণ তা পায়ে লেগে থাকে। এটি সুফইয়ান সাওরী, দাউদ, আবু সাওর, ইসহাক ইবন রাহাওয়াইহ ও ইয়াযিদ ইবন হারূনের মত।'

এরপর ইবন হাযম তাদের মতামত উল্লেখ করেছেন, যারা তা নাজায়েযের পক্ষে। তিনি তাদের মত ও যুক্তির ব্যবচ্ছেদ করে প্রমাণ করেছেন যে, ব্যক্তি মতামত ছাড়া তাদের মতের পক্ষে কোনো দলিল নেই। শেষে তিনি বলেন, কুরআনের ব্যাখ্যা সুন্নাহর যে বিধান এসেছে তা সঠিক।

---

২৮০. তাহকীকুল মাসাহ আলাল জাওরাবাইন, ৬৮, টীকা দ্রষ্টব্য।
২৮১. সহীহুল বুখারী, ২৭৩৫; সহীহ মুসলিম, ১৫০৪ (৪)
২৮২. মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, ৭৫৩; বাইহাকী, ১/২৮৩

সুন্নাহর বিধান হচ্ছে, 'মাসাহর জন্য পায়ে যদি কোনো পা-বস্ত্র পরিধান করে না থাকে, তাহলে ধৌত করতে হবে। আর যদি কোনো কিছু পরিধান করে থাকে, তাহলে মাসাহ করতে হবে। এটা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا তোমার রব ভুলে যাবার নন।[২৮৩] রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মোজা ও পা-বস্ত্রে মাসাহ করার আদেশ দেন, তখন জানতেন কোনো কোনো পা-বস্ত্র অনেক ছেঁড়া-ফাটা থাকে আবার কোনো কোনো পা-বস্ত্র কম ছেঁড়া-ফাটা থাকে, সেসব কালো, লাল, সাদা, নতুন, পুরাতন বিভিন্ন ধরন ও রঙের হয়। এরপরও তিনি সেসবের মাঝে ফারাক করে বলেননি কোনগুলোতে মাসাহ করা যাবে; আর কোনগুলোতে যাবে না। যদি সত্যিকারার্থে ফারাক থাকত, তাহলে আল্লাহ তাআলা ওহী করতে ছাড়তেন না আর তাঁর রাসূলও গাফেল থাকতেন না। অবশ্যই এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা দেওয়া হতো। অতএব প্রমাণ হয়, সর্বাবস্থায় মাসাহ করা যাবে।'

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ 'আল-ইখতিয়ারাত' (১৩) গ্রন্থে বলেন, 'ইবন তাইম প্রমুখদের বর্ণনা অনুযায়ী দুই মতের একমত অনুযায়ী কাপড়ের মোজায় মাসাহ করা জায়েয। মোজা যতই ছেঁড়া-ফাটা হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ক্ষেত্রে মোজা অভিধা ব্যবহার করা হবে এবং তা পরিধান করে হাঁটা সম্ভব হবে, তাতে মাসাহ করা জায়েয। এটি শাফিয়ীর পূর্বের মত। আবুল বারাকাতসহ আরও কিছু ইমামের এটাই মত।'

রাফিয়ী 'শারহুল ওয়াজিয' (২/৩৭০) গ্রন্থে এটি অধিকাংশের মত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'এরূপ শর্তের মাধ্যমে যদি মাসাহ নিষিদ্ধ করা হয়, তাহলে শরীআত কর্তৃক স্বীকৃত এ ছাড়ের সীমা ও পরিধি সংকীর্ণ হয়ে পড়বে। অতএব, মাসাহ করা যাবে।' আর তিনি সঠিক কথাই বলেছেন।[২৮৪]

প্রশ্ন ১২৫: উমার ইবন খাত্তাব, আনাস ইবন মালিক ও আবু মূসা আশআরীর ব্যাপারে ইবন কুদামাহ উল্লেখ করেছেন, তারা টুপির ওপর মাসাহ করতেন। তাদের থেকে এ কথা কি সহীহ সূত্রে প্রমাণিত? সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হলে টুপির ওপর মাসাহ করা কি জায়েয?

জবাব: তাদের থেকে এ কথা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত কি না, তা আমার জানা নেই। তবে আমার মত হচ্ছে, পাগড়ির ওপর মাসাহ করার বৈধতা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। আর টুপির ওপর মাসাহ করা একদিকে যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত নয়, অন্যদিকে টুপি খুলে

২৮৩. সূরা মারইয়াম, ১৯:৬৪
২৮৪. তামামুন নাসহ ফী আহকামিল মাসাহ, পৃ. ৮৪-৮৬

মাসাহ করাতেও কোনো জটিলতা নেই। কিন্তু পাগড়ির ব্যাপারটি টুপি থেকে ভিন্ন। পাগড়ি মাথায় দিলে পাগড়ি খুলে মাসাহ করাতে জটিলতা আছে। তাই প্রথমত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণার্থে পাগড়িতে মাসাহ করা বৈধ, দ্বিতীয়ত তা খোলায় জটিলতা থাকায় তার ওপর মাসাহ করা যুক্তিযুক্ত। অন্যদিকে টুপির ওপর মাসাহ করা না রাসূলের সুন্নাহ, আর না তাতে জটিলতার কারণ বিদ্যমান আছে। এটাই আমার মত।[২৮৫]

প্রশ্ন ১২৬: ব্যান্ডেজের ওপর মাসাহ করার বিধান কী?

জবাব: শাইখ সাইয়্যিদ সাবিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'অঙ্গ জোড় দেওয়ার জন্য অথবা বাঁধার জন্য যে পট্টি বা ব্যান্ডেজ করা হয় তার ওপর মাসাহ করা শরীআতসম্মত। এ ব্যাপারে একাধিক হাদীস পাওয়া যায়; যদিও সেসব হাদীস দুর্বল কিন্তু সবগুলো পরস্পর মিলে দলিলযোগ্য।...'

শাইখ সাইয়্যিদ সাবিকের উপর্যুক্ত মত পর্যালোচনা করে দেখা যায়, হাদীসগুলোকে শক্তিশালী গণ্য করার ক্ষেত্রে তিনি সানআনী ও শাওকানী প্রমুখদের অনুসরণ করেছেন। আমি এ কিতাবের [তামামুল মিন্নাহর] ভূমিকায় ১০ নং মূলনীতিতে যে আলোচনা করেছি, হাদীসগুলোকে শক্তিশালী গণ্য করার ক্ষেত্রে সে মূলনীতির অনুসরণ করা হয়নি। সেই মূলনীতির মূল কথা হলো, সনদে যদি দুর্বলতার পরিমাণ বেশি থাকে, তবে একাধিক সনদ থাকলেও সেই হাদীস শক্তিশালী হবে না। ব্যান্ডেজের ওপর মাসাহ সংক্রান্ত হাদীসগুলো এ পর্যায়ের। এ সংক্রান্ত মোট হাদীস হচ্ছে চারটি। সংক্ষিপ্তাকারে হাদীসগুলোর দুর্বলতার কারণ উল্লেখ করছি:

প্রথম হাদীস: তিনি জাবের ﷺ'র যে হাদীস উল্লেখ করেছেন, তাতে যে অংশে ব্যান্ডেজের ওপর মাসাহ করার কথা বলা হয়েছে, সে অংশটুকু মুনকার-আপত্তিকর; যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাই এখানে ফের আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয় হাদীস: আলী ﷺ বলেন, আমার এক কবজি ভেঙে গেলে এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জিজ্ঞেস করি। তিনি আমাকে ব্যান্ডেজের ওপর মাসাহ করার আদেশ দেন।

ইবন হাজার আসকালানী এ হাদীসের ব্যাপারে বুলুগুল মারামে বলেন, 'হাদীসটি ইবন মাজাহ অত্যন্ত দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।' বুলুগুল মারামের ব্যাখ্যাতা সানআনী বলেন, 'ইয়াহইয়া ইবন মাঈন, আহমাদ ইবন হাম্বালসহ অন্যান্য ইমাম হাদীসটিকে মুনকার বলেছেন। তারা বলেছেন, 'হাদীসটি আমর ইবন খালিদ আল-ওয়াসিতী থেকে বর্ণিত। আর তিনি কাযযাব-

২৮৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/৩০৯

হাদীস জালকারী। দারাকুতনী ও বাইহাকী দুই সনদে বর্ণনা করলেও তা আরও দুর্বল।' নববী বলেন, এ হাদীস দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত হাফিযে-হাদীস একমত। শাফিয়ী বলেছেন, এ হাদীসের সহীহ্ সনদের কথা জানতে পারলে আমি এই হাদীস অনুযায়ীই ফাতাওয়া দিতাম।'

ইবন আবী হাতিম তার পিতা থেকে 'আল-ইলাল' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন, এ হাদীস বাতিল। এর কোনো ভিত্তি নেই।

তৃতীয় হাদীস: আবু উমামা ﷺ'র হাদীস। হাদীসটি তাবারানী 'আল-মুজামুল কাবীর' ৮/৫৪/৭৫৯৭ গ্রন্থে নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেছেন। 'নাসবুর রায়াহ' ১/১৮৬ গ্রন্থেও তা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সনদে ইসহাক ইবন দাউদ আস-সওয়াফ নামক তাবারানীর একজন শিক্ষক রয়েছেন। আমি তার জীবনী খুঁজে পাইনি। এ ছাড়াও হাফস ইবন উমার আদানী নামক আরেকজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। তার ব্যাপারে নাসায়ী বলেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

চতুর্থ হাদীস: ইবন উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবী ﷺ ব্যান্ডেজের ওপর মাসাহ করতেন।'

হাদীসটি দারাকুতনী বর্ণনা করার পর বলেন, 'আবু আম্মারাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন মাহদী অত্যন্ত দুর্বল রাবী। এ হাদীস মারফূ সূত্রে সহীহ নয়।' হাদীসটি বাইহাকী ইবন উমার ﷺ'র মত হিসেবে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করার পর বলেন, 'হাদীসটি ইবন উমারের মত মওকূফ হিসেবে সহীহ।'

ইমাম বাইহাকী এ হাদীসের প্রথম সনদ উল্লেখ করার পর বলেন, 'এই মাসআলায় কোনো কিছু প্রমাণিত নয়। এ ব্যাপারে সবচেয়ে সহীহ হাদীস হচ্ছে পূর্বের আতা ইবন আবী রাবাহর (অর্থাৎ প্রথমে উল্লিখিত জাবিরের) হাদীস। হাদীসটি শক্তিশালী নয়। এ ব্যাপারে ভরসা হচ্ছে, তাবিয়ী ও তাবিয়ী পরবর্তীদের মতামত এবং ইবন উমারের ব্যান্ডেজের ওপর মাসাহ সংক্রান্ত বর্ণনা।'

আপনি বাইহাকীর উক্তি অবলোকন করলেন। তিনি এই মাসআলায় ফকীহদের মতামত ও উল্লিখিত ইবন উমারের আসারের ওপর ভরসা করেছেন। উপর্যুক্ত একাধিক সনদের কারণে হাদীসটি শক্তিশালী হলে তিনি তা দলিল হিসেবে উপস্থাপন করতেন। কেননা তিনি একাধিক সনদের মাধ্যমে হাদীস শক্তিশালী হওয়ার পক্ষে। তথাপি তিনি তা করেননি সনদগুলো অত্যন্ত দুর্বল হওয়ার কারণে।

এসব কারণে ইবন হাযমের মতে ব্যান্ডেজের ওপর মাসাহ করা শরীআতসম্মত নয়। তিনি 'আল-মুহাল্লা' ২/৭৪-৭৫ গ্রন্থে বলেন, 'তা শরীআতসম্মত না হওয়ার দলিল হচ্ছে,

আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

আল্লাহ কোনো নফসকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না।[২৮৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

আমি যখন তোমাদের কোনো বিষয়ে আদেশ দেব, তখন তোমরা সাধ্যমতো তা পালন করবে।[২৮৭]

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণ হলো, মানুষ যা করতে অক্ষম, তা তাকে পালন করা লাগবে না। তার অক্ষমতার কারণে সেই বিধানের পরিবর্তে অন্য কোনো বিধান থাকতে পারে। তবে সেই বিধান শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত হতে হবে। আর শরীআত তা নির্ধারণ করবে কুরআন অথবা সুন্নাহর মাধ্যমে। অথচ কেউ গোসল করতে বা ধুতে না পারলে তার পরিবর্তে ব্যান্ডেজে মাসাহ করার বিধান কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত ও পরিবর্তিত নয়। অতএব, এ মত অগ্রহণযোগ্য।'

এরপর ইবন হাযম এ মতের পক্ষে শাবী এবং দাউদ ও তার অনুসারীদের মত উল্লেখ করেন। আর এই মতটি সঠিক ইনশাআল্লাহ।

পূর্বে উল্লিখিত ইবন উমার ﷺ'র আসারের জবাবে তিনি বলেন, এটি তার নিজস্ব মত। এ কারণে তাতে মাসাহ করা ওয়াজিব প্রমাণ হয় না। তার থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি অজু ও গোসলে চোখের ভেতরে পানি প্রবেশ করাতেন। আর এ কাজ ফরজ তো দূরের কথা শরীআতসম্মতও নয়।[২৮৮]

প্রশ্ন ১২৭: রাসূলুল্লাহ ﷺ মোজার ওপর মাসাহ করার ব্যাপারে বলেন, আমি মোজাদ্বয় পবিত্র অবস্থায় পরিধান করেছি। তিনি এ কথা দ্বারা কী বুঝিয়েছেন? আমি কিছু সালাফী ভাইকে এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি, এর অর্থ হলো অজুর সময় তিনি প্রথমে ডান পা ধুয়ে ডান পায়ের মোজা পরিধান করেন, তারপর বাম পা ধুয়ে বাম পায়ের মোজা পরিধান করেন। তাদের এ ব্যাখ্যা কি সঠিক?

---

২৮৬. সূরা বাকারাহ, ২:২৮৬
২৮৭. সহীহুল বুখারী, ৭২৮৮
২৮৮. তামামুল মিন্নাহ, পৃ. ১৩৩

জবাব: 'আমি মোজাদ্বয় পবিত্র অবস্থায় পরিধান করেছি' দ্বারা ভাষাতত্ত্বগত ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং শরয়ী ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য। আর সেই উদ্দেশ্য হলো, আমি অপবিত্র অবস্থায় মোজাদ্বয় পরিধান করিনি। মোজার ওপর মাসাহ করার শর্ত হচ্ছে, উভয় মোজা পবিত্র অবস্থায় পরিধান করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপরি-উক্ত কথার ব্যাখ্যা হচ্ছে, 'আমি অজু অবস্থায় উভয় মোজা পরিধান করেছি।' কেউ শুধু ডান পা ধৌত করলে বলা হবে না, সে অজু করেছে। কেননা বাম পা ধৌত করা ছাড়া অজু হয় না। অতএব, তাঁর উক্ত কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, 'দুই পা ধোয়ার পর আমি মোজাদ্বয় পরিধান করেছি'। অর্থাৎ কেউ মোজার ওপর মাসাহ করতে চাইলে অজুতে দুই পা ধোয়ার পর মোজা পরিধান করতে হবে। এক পা ধোয়ার পর মোজা পরিধান করা যাবে না। অতএব, তারা উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা মুলত প্রচলিত ভাষাতত্ত্বের ওপর নির্ভর করে ব্যাখ্যা করেছে। আর সবার জানা ব্যাপার যে, ভাষাতত্ত্ব দুই প্রকার; প্রচলিত ভাষাতত্ত্ব এবং শরয়ী ভাষাতত্ত্ব। আর শরয়ী ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে শরয়ী ভাষাতত্ত্বের ওপর নির্ভর কতে হবে, প্রচলিত ভাষাতত্ত্বের ওপর নয়।[২৮৯]

প্রশ্ন ১২৮: মোজার ওপর মাসাহ করার সময়সীমা কখন থেকে শুরু হয়?

জবাব: এ ব্যাপারে দুটি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে:

ক. মোজা পরিধান করার পর প্রথমবার যখন অজু ভাঙবে, তখন থেকে সময়সীমা শুরু হবে।

খ. মোজা পরিধান করার পর প্রথমবার অজু ভাঙা থেকে সময়সীমা শুরু হবে না; বরং অজু ভাঙার পর পুনরায় যখন অজুতে মাসাহ করবে, তখন থেকে শুরু হবে।

প্রথম মতের পক্ষে রয়েছেন ইমাম আবু হানীফা, শাফিয়ী এবং আহমাদ ও তার অনুসারীগণ। এ মতের পক্ষে উল্লেখ করার মতো কোনো দলিলের কথা জানি না। তারা ব্যক্তি মতামতের আলোকে এ মত দিয়েছেন। এ কারণেই তাদের অনুসারীগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন। জানামতে এ মতের পক্ষে কোনো সাহাবী নেই। আর দ্বিতীয় মতটির পক্ষে একাধিক সহীহ হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে রয়েছে উমার ইবন খাত্তাব ﷺ'র ফাতাওয়াও।

দ্বিতীয় মতের পক্ষের হাদীসগুলো একদল সাহাবী বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমসহ সুনানু আরবাআ, মাসানীদ ও অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থে হাদীসগুলো রয়েছে। সেসব হাদীস বিভিন্ন শব্দে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মাসাহর আদেশ দিয়েছেন', 'মাসাহর ছাড় দিয়েছেন', 'মাসাহ নির্ধারণ করেছেন'-মুকিমের জন্য একদিন একরাত আর মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত। আর এটি

২৮৯. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/৩১৯

স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ বিষয় যে, মাসাহর সময়সীমার সূচনা তখন থেকেই হয়, যখন মাসাহ করবে। প্রথম মতের ব্যবচ্ছেদের জন্য এটাই দলিল হিসেবে যথেষ্ট।

ধরুন, কেউ সূর্য উদিত হওয়ার সামান্য আগে ফজরের সালাত আদায় করল এবং সালাতান্তে তার অজু নষ্ট হয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয় দিন ফজরের ওয়াক্ত শুরুর হওয়ার সময় ফজরের সালাতের জন্য সে অজু করল এবং সেই অজুতে প্রথমবার মাসাহ করল। প্রথম মত অনুযায়ী এই ব্যক্তি আর মাসাহ করতে পারবে না। তাহলে এই ব্যক্তি কীভাবে একদিন একরাত মাসাহ করার সুযোগ পেল! আর দ্বিতীয় মত অনুযায়ী এই ব্যক্তি তৃতীয়দিন ফজরের সালাতের পূর্ব পর্যন্ত মাসাহ করার সুযোগ পাবে। প্রথম মত অনুযায়ী আরও অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, অজু নষ্ট হওয়ার পর যদি মুকিম ব্যক্তি একদিন একরাত, আর মুসাফির ব্যক্তি তিনদিন তিনরাত কোনো কারণে মাসাহ না করে, তবে সে আর মাসাহ করার সুযোগ পাবে না; তার মাসাহ করার সময়সীমা পার হয়ে গেছে। তাকে আবার নতুন করে পা ধুয়ে অজু করতে হবে।[২৯০]

এভাবে সুন্নাহ পরিপন্থি মত হওয়ার কারণে প্রথম মতের অনুসারীরা মাসাহর ছাড় গ্রহণ করা থেকে ঐ ব্যক্তিকে বঞ্চিত করছে। শক্তিশালী দলিলের কারণে ইমাম নববী এই মাসআলায় নিজ মাযহাবের বিরোধিতা করতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ তিনি পারতপক্ষে নিজের মাযহাবের বিরোধিতা করেন না। তিনি 'শারহুল মুহাযযাব' ১/৪৮৭ গ্রন্থে প্রথম মত ও তার অনুসারীদের নাম উল্লেখ করার পর বলেন,

'আওযায়ী ও আবু সাওর বলেছেন, অজু নষ্ট হওয়ার পর যখন মাসাহ করবে তখন থেকে মাসাহর সময়সীমার সূচনা হবে। এটি এক মত অনুযায়ী আহমাদ ও দাউদের মত। দলিলের দৃষ্টিকোণ থেকে এ মতটি প্রণিধানযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য। এ মত গ্রহণ করেছেন ইবনুল মুনযির। এ ধরনের মত উমার ইবন খাত্তাব থেকে তিনি উদ্ধৃত করেছেন। মাওরদী ও শাশী হাসান বাসরী থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তার মতে সময়সীমা শুরু হবে মোজা পরিধান করার সময় থেকে। আর যারা বলেন, মাসাহ করার পর থেকে সময়সীমা শুরু হবে, তারা দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মুসাফির তিনদিন মাসাহ করবে।' এ হাদীসগুলো যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ হাদীসগুলো থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ হয়, তিনদিন

২৯০. যেমন মুকিম ব্যক্তির কথা ধরুন: এক ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় মোজার পরিধান করার পর আজ সূর্য উদিত হওয়ার পাঁচ মিনিট পূর্বে তার ওজু নষ্ট হয়ে গেলো। সে পরদিন সূর্য উদিত হওয়ার পাঁচ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত কোনো কারণে ওজুতে মাসাহ করার সুযোগ পেলো না। তো প্রথম মত অনুযায়ী এ ব্যক্তি আর মাসাহ করার সুযোগ পাবে না। কারণ, ওজু নষ্ট হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ সূর্য উদিত হওয়ার পাঁচ মিনিট পূর্ব থেকে তার মাসাহর সময়সীমা শুরু হয়েছে এবং একদিন এক রাত অতিক্রম করেছে। অথচ অবাক করা বিষয় হচ্ছে, এ ব্যক্তি এখনো মাসাহ-ই করেনি।-সংকলক

মাসাহ করা যাবে। আর তিনদিন তখন হবে যখন মাসাহর সময়সীমার সূচনা ধরা হবে মাসাহ করা থেকে। ইমাম শাফিয়ী বলেছেন, 'যদি মুকিম অবস্থায় অজু নষ্ট হয় আর সফরে মাসাহ করে, তবে সফরের সময়সীমা পূর্ণ করবে।' তিনি এখানে সময়সীমাকে মাসাহ করার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আমাদের মাযহাবের অনুসারীরা কাসিম ইবন যাকারিয়া মাতরিযীর সূত্রে সাফওয়ানের হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। হাদীসটি হলো, 'অজু নষ্ট হওয়া থেকে অজু নষ্ট হওয়া পর্যন্ত।' কিন্তু এ বর্ধিতাংশটুকু অপরিচিত, প্রমাণিত নয়। এ ছাড়া তারা কিয়াসও পেশ করেন।...

ইমাম নববী যে কিয়াসের কথা বলেছেন সেই কিয়াস সঠিক হলেও কিয়াস গ্রহণযোগ্য হওয়ার এবং দলিলযোগ্য হওয়ার শর্ত হচ্ছে, তা হাদীস বিরোধী হবে না। আর সেই কিয়াসটি হাদীস বিরোধী। অতএব, সেই কিয়াসের দিকে তাকানোর সুযোগ নেই। এ কারণে প্রবাদ বাক্য আছে, 'হাদীস পাওয়া গেলে ব্যক্তি মতামত বাতিল। আল্লাহর নদী প্রবাহিত হলে মাকিলের নদী বাতিল।' এ ছাড়া এ মতটি খলীফায়ে রাশেদ উমার ইবন খাত্তাবের মতের পরিপন্থি। অথচ আমরা মুকাল্লিদদের দেখি, সহীহ হাদীস উমার ﷺ'র মতের পরিপন্থি হলে তারা সহীহ হাদীস ত্যাগ করে তার মত গ্রহণ করেন; যেমনটি তারা করেছে তালাকের মাসআলায়। তাহলে এ মাসআলায় কেন তারা তার মত গ্রহণ করছে না অথচ হাদীসও তার মতের স্বপক্ষে। আবদুর রাযযাক তার 'মুসান্নাফ' ১/২০৯/৮০৭ গ্রন্থে সহীহ সনদে আবু উসমান নাহদী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি সা'দ ও আবদুল্লাহ ইবন উমার কাছে উপস্থিত হই। তারা উভয়ে মোজার মাসাহ নিয়ে বিতর্ক নিরসনের জন্য উমারের কাছে উপস্থিত হন। উমার বলেন, 'সে তাতে মাসাহ করবে তার দিনের ও রাতের সময় পরিমাণ।'

এ হাদীসের সনদ বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। এখান থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়, মাসাহর সময়সীমার সূচনা হবে মোজায় মাসাহ করা থেকে নিয়ে একদিন ও একরাত সময় পরিমাণ। মোজা মাসাহর সময়সীমা নিয়ে আবদুর রাযযাক ও ইবন আবী শাইবাহ তদীয় 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে যত আসার বর্ণনা করেছেন, আমার জানামতে এই আসারটি সবথেকে স্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, ইবন আবী শাইবাহ ১/১৮০ আমর ইবন হারিস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি আবদুল্লাহর সঙ্গে মাদাইন যাই। তিনি মোজার ওপর তিনদিন মাসাহ করেন, কিন্তু তা খুলেননি।' এর সনদ বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। সালাফদের আসার পুরোপুরি সুন্নাহর সঙ্গে মিলে গেছে। অতএব, আপনি তা আঁকড়ে ধরুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি হিদায়াতপ্রাপ্ত হবেন।[২৯১]

২৯১. তামামুন নাসহ ফী আহকামিল মাসাহ, ৮৯-৯২

প্রশ্ন ১২৯: কেউ মুকিম অবস্থায় মোজার ওপর মাসাহ করল। তারপর মুকিমের মাসাহর সময়সীমা শেষ হওয়ার পূর্বেই সফর শুরু করল। এ ক্ষেত্রে কীভাবে মাসাহর সময়সীমা নির্ধারণ করবে?

জবাব: প্রথমে মুকিমের মাসাহর সময়সীমা শেষ করবে অর্থাৎ একদিন একরাত পূর্ণ করার পর মোজা খুলে ফেলবে। এরপর নতুন করে অজু করবে, পা ধৌত করবে এবং পূর্ণ পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করবে। এভাবে মুসাফিরের সময়সীমা শুরু করবে।[২৯২]

প্রশ্ন ১৩০: রাসূলুল্লাহ ﷺ মুকিমের জন্য একদিন একরাত আর মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত মাসাহর সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই সময়সীমা কি অতিক্রম করা যাবে?

জবাব: উক্ত সময়সীমা অতিক্রম করা যাবে না। তা জায়েয নয়। অতিক্রম করা জায়েয হলে সময়সীমা নির্ধারণ করার মানে কী? সময়সীমা পার করা বৈধ বললে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়াতে উপকার কী?[২৯৩] আশা করি বুঝতে পেরেছেন।

প্রশ্ন ১৩১: সফর অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনের স্বার্থে তিন দিন তিন রাতের বেশি কি মাসাহ করা যাবে?

জবাব: উকবাহ ইবন আমির জুহানী ﷺ বলেন, আমি জুমআর দিন সিরিয়া থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হই। আমি উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ'র নিকট যাই। তিনি বললেন, কবে মোজা পরিধান করেছেন? বললাম, জুমআর দিন। জিজ্ঞেস করলেন, এর মধ্যে কি খুলেছেন? বললাম, না। তিনি বললেন, আপনি সুন্নাহসম্মত কাজ করেছেন।[২৯৪]

মুসাফিরের জন্য নির্ধারিত তিন দিন ও তিন রাত সময়সীমা এবং উমার ﷺ'র উপর্যুক্ত ঘটনার মাঝে সমন্বয় হচ্ছে, উমারের উক্ত ঘটনা বিশেষ প্রয়োজনের সময় অথবা যখন কাফেলা বা সাথি হারানো বা অন্য কোনো কারণে মোজা খোলা সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটাই শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহর মত। তিনি মাসাহ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। মোজা ছেঁড়া-ফাটা হতে পারবে না-এটি শর্ত কি না এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'যে-সমস্ত হাদীসে মাসাহর সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, তাতে একদিন একরাত এবং তিন দিন তিন রাত

২৯২. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/৩২৭
২৯৩. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/৩২৭
২৯৪. সুনানু ইবন মাজাহ, ৫৫৮

মাসাহ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। সেসব হাদীস থেকে মাফহূম-বুঝ ছাড়া প্রমাণ হয় না যে নির্ধারিত সময় অতিক্রম করা যাবে না। আর মাফহূম-বুঝ ব্যাপক নয়। অতএব, যখন নির্ধারিত সময়সীমায় মোজা খোলা সম্ভব হবে, তখন সেসব হাদীসের ওপর আমল করবে। আর সম্ভব না হলে উকবার ঘটনার ওপর আমল করবে। তিনি দামেস্ক থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হন দামেস্ক বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে। তিনি টানা এক সপ্তাহ মোজা না খুলেই মাসাহ করেন। উমার তাকে বলেন, আপনি সুন্নাহসম্মত কাজ করেছেন। এ ঘটনাটি সহীহ।'

স্বয়ং শাইখুল ইসলাম এক সফরে এর ওপর আমলও করেন। তিনি বলেন, আমি কাফেলা সহকারে ডাকের কাজে যাই। মাসাহর সময়সীমা শেষ হয়ে গেলেও আমার পক্ষে মোজা খুলে অজু করা সম্ভব হচ্ছিল না। মোজা খুলতে গেলে হয় আমাকে কাফেলা হারাতে হবে, আর কাফেলা আটকে মোজা খুলতে গেলে সবাইকে কোনো দুর্ঘটনার শিকার হতে হবে। সেই সময় আমার মনে উদয় হয়, প্রয়োজনের স্বার্থে কোনো সময়সীমা নেই, যেমন ব্যান্ডেজের ক্ষেত্রে সময়সীমা নেই। এ অবস্থায় ক্ষেত্রে আমি উকবার ব্যাপারে উমারের উক্তি 'আপনি সুন্নাহসম্মত কাজ করেছেন'-কে প্রয়োগ করি। এভাবে হাদীসসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন হয়ে যায়। পরবর্তীকালে আমি 'মাগাযী ইবন আয়েয' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, দামেস্ক বিজয় হলে তিনি আমার মতোই ডাকের কাজে যান। তার সঙ্গে আমার অবস্থান সাযুজ্যপূর্ণ হয়ে যাওয়ায় আমি আল্লাহর প্রশংসা করি। এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা।'

তিনি সঠিক কথা বলেছেন। এটি তার অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ফিকহী উদঘাটন। আল্লাহ তাকে আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দিন। শাইখ আলাউদ্দীন মিরদাবী তদীয় 'আল-ইনসাফ' ১/১৭৬ গ্রন্থে শাইখুল ইসলাম থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তিনি 'আল-ইখতিয়ারাত' গ্রন্থে বলেন, 'এমন মুসাফিরের ক্ষেত্রে মাসাহর সময়সীমা নির্ধারিত নয়, যে মোজা খুললে ও পরিধান করলে দুর্ভোগের শিকার হবে এবং তার পক্ষে তা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। যেমন, যে-ব্যক্তি মুসলিমদের কল্যাণে দূত ও ডাকের কাজে নিয়োজিত।' তিনিও 'আল-ইখতিয়াত' পৃ. ১৫ গ্রন্থে তার স্বীকারোক্তি প্রদান করেন।[২৯৫]

প্রশ্ন ১৩২: কেউ যদি মোজায় মাসাহ করার পর মোজা খুলে ফেলে, তাহলে কি তার অজু নষ্ট হয়ে যাবে?

জবাব: এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে তিনটি মত রয়েছে:

২৯৫. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ৬/২৪৩-২৪৪

ক. তার অজু শুদ্ধ থাকবে। তাকে কিছুই করতে হবে না।

খ. শুধু তাকে তার দুই পা ধুতে হবে।

গ. তার অজু নষ্ট হয়ে যাবে। তাকে পুনরায় অজু করতে হবে।

উপর্যুক্ত প্রত্যেক মতের পক্ষে সালাফগণ রয়েছেন। আবদুর রাযযাক তার 'মুসান্নাফ' ১/২১০/৮০৯-৮১৩ এবং ইবন আবী শাইবাহ তদীয় 'মুসান্নাফ' ১/১৮৭-১৮৮ এবং বাইহাকী তার 'সুনান' ১/২৮৯-২৯০ গ্রন্থে তাদের মতামতসমূহ উল্লেখ করেছেন।

নিঃসন্দেহে প্রথম মত প্রণিধানযোগ্য। কেননা মাসাহর বিধানের উদ্দেশ্য মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড় এবং উম্মাহর জন্য সহজীকরণ। আর প্রথম মতটি এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বাকি মত দুটি এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, যেমনটি রাফিয়ী পূর্বের মাসআলায় বলেছেন। এ ছাড়া আরও দুটি কারণে প্রথম মত প্রাধান্যযোগ্য:

ক. তা খলীফায়ে রাশেদ আলী ইবন আবী তালিবের আমলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আমরা সহীহ সনদে আগেই উল্লেখ করেছি যে, তার অজু নষ্ট হয়ে গেলে তিনি অজু করেন এবং জুতার ওপর মাসাহ করেন। তারপর তা খুলে ফেলে দিয়ে সালাত আদায় করেন।

খ. সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কেউ যদি মাথা মাসাহ করে তারপর মাথা মুণ্ডন করে ফেলে তাহলে তাকে অজু তো দূরের কথা পুনরায়ও মাসাহ করতে হবে না। এটাই শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যার মত। তিনি 'আল-ইখতিয়ারাত' পৃ. ১৫ গ্রন্থে বলেন, 'মোজা বা পাগড়ি খুলে ফেলার কারণে বা সময়সীমা শেষ হওয়ার কারণে মাসাহকারীর অজু নষ্ট হবে না। পুনরায় মাথা মাসাহ করা বা পা ধোয়া তার ওপর ওয়াজিব নয়। এটাই হাসান বাসরীর মত। এটা যেমন মাসাহ করার পর চুল কেটে ফেলার ন্যায়। সঠিক মত অনুযায়ী এটি আহমাদ ও অধিকাংশের মত।'

এটাই ইবন হাযমের মত। এ ব্যাপারে তার আলোচনা ও বিরোধী পক্ষের ব্যবচ্ছেদ জানার জন্য 'আল-মুহাল্লা' ২/১০৫-১০৯ গ্রন্থ দেখুন। তার আলোচনাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক।

ইবন আবী শাইবাহ ১/১৮৭ ও বাইহাকী ১/২৮৯ এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি মোজার ওপর মাসাহ করার পর তা খুলে ফেলে। তিনি বলেন, সে তার পা ধুবে।

এ হাদীসটি দুর্বল। কারণ, তাতে ইয়াযিদ ইবন আবদুর রহমান দালানী নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছে। তার ব্যাপারে হাফিয আসকালানী বলেন, 'সে সত্যবাদী, তবে প্রচুর ভুল করত। তা ছাড়া সে মুদাল্লিস ছিল।'

বাইহাকী আবু বাকরাহ থেকে এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে হাদীসের সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-কুরাশী ব্যতীত। তার সম্পর্ক আমি জানতে পারিনি।

মুগীরাহ ইবন শুবাহ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, 'মোজার ওপর মাসাহর সময়সীমা মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত আর মুকিমের জন্য একদিন একরাত, যতক্ষণ না মোজা খোলা হয়।'[২৯৬]

এ হাদীসটিও দুর্বল। কারণ, হাদীসটি শুধু উমার ইবন রুদাইহ বর্ণনা করেছেন। আর তিনি শক্তিশালী নন। 'যতক্ষণ না মোজা খোলা হয়' অংশটুকু মুনকার, তিনি দুর্বল হওয়ার কারণে এবং তার কোনো শাহিদ হাদীস না থাকার কারণে ঐ অংশটুকু বাতিল।

প্রশ্ন ১৩৩: মাসাহর সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে অজু কি নষ্ট হয়ে যাবে?

জবাব: এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে একাধিক মত রয়েছে। শাফিয়ী মাযহাবেই দুটি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে।

ক. নতুন করে অজু করতে হবে।

খ. শুধু দুই পা ধোয়াই যথেষ্ট হবে।

আরেকটি মত হলো,

গ. তাকে কোনো কিছু করতে হবে না। তার অজু শুদ্ধ থাকবে। সেই অজু অন্য কোনো কারণে নষ্ট না হলে উক্ত অজু দ্বারা যত খুশি সালাত আদায় করতে পারবে।

তৃতীয় মত বেশি শক্তিশালী। নিজের মাযহাবের বিপরীতে এটাই ইমাম নববীর মত। তিনি 'শারহুল মুহাযযাব' ১/৫২৭ গ্রন্থে বলেন, 'ইবনুল মুনযিরের বর্ণনা অনুযায়ী এটি হাসান বাসরী, কাতাদাহ ও সুলাইমান ইবন হারবের মত। ইবনুল মুনযির এ মত গ্রহণ করেন। এটিই প্রণিধানযোগ্য ও শক্তিশালী মত। আমাদের মাযহাবের অনুসারীগণ দাউদ থেকে এ মত বর্ণনা করেন।'

শারানী তদীয় 'মীযান' ১/১৫০ গ্রন্থে এই মতটি ইমাম মালিক থেকে উদ্ধৃত করেছেন। নববী প্রমুখগণও তার থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ইবন হাযমের অনুসরণার্থে এই মতের পক্ষে রয়েছেন

২৯৬. তাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর ২০/৪১৮

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ। ইবন হাযম এই মতের পক্ষে ইবরাহীম নাখয়ী ও ইবনু আবী লায়লাকে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

'এটাই সঠিক মত। এই মতের বিকল্প কোনো মত নেই। কারণ, হাদীসে এমন কোনো কিছু বলা হয়নি যে, মাসাহর ওয়াক্ত শেষ হওয়ার কারণে অজু নষ্ট হয়ে যাবে বা কোনো অঙ্গ থেকে অজু নষ্ট হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু বলেছেন, মুসাফির অবস্থায় তিনদিন তিনরাত আর মুকিম অবস্থায় একদিন একরাতের বেশি কেউ যেন মাসাহ না করে। এর অতিরিক্ত কেউ কিছু বললে সেই হাদীসে এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালো, হাদীসে যার কোনো অস্তিত্ব নেই এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথার সঙ্গে এমন কথা জুড়ে দিলো, যা তিনি বলেননি।'[২৯৭]

২৯৭. তামামুন নাসহ ফী আহকামিল মাসাহ, ৯২-৯৩

অধ্যায় সাত

গোসল

প্রশ্ন ১৩৪: গোসলের পদ্ধতি কী?

জবাব: যদি ফরজ গোসল হয়, তাহলে প্রথমে দুহাত দুবার অথবা তিন বার ধুয়ে নেবে। তারপর ডান হাতের সাহায্যে বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধুবে। এরপর সালাতের অজুর ন্যায় অজু করবে। অতঃপর পানি নিয়ে আঙুলের মাধ্যমে চুলের গোড়া ভেজাবে। যখন মনে হবে চুলের গোড়া ভিজে গেছে তখন তিন অঞ্জলি পানি মাথায় প্রবাহিত করবে। এরপর গোটা শরীরে পানি প্রবাহিত করবে। সবশেষে দুই পা ধুয়ে নেবে।[২৯৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ গোসলের এসব কাজ ডান দিক থেকে শুরু করতেন, তারপর বাম দিক থেকে। তিনি গোসলের পর আর অজু করতেন না।

মহিলারা যদি মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢেলে দেয় তারপর গোটা শরীরে পানি প্রবাহিত করে, তাহলে এভাবেই পবিত্রতা অর্জন করা যথেষ্ট হবে।[২৯৯]

প্রশ্ন ১৩৫: গোসলের সময় বিসমিল্লাহ বলা কি ওয়াজিব?

জবাব: গোসলের সময় বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। কেননা গোসল অজুর স্থলাভিষিক্ত। আর যে-ব্যক্তি বিসমিল্লাহ বলে না, তার অজু নেই।[৩০০]

প্রশ্ন ১৩৬: গোসলের সময় কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া কি ওয়াজিব?

জবাব: গোসলের সময় কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব নয়। কারণ, গোসলের পূর্বে অজু করা ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নাত। প্রমাণ হচ্ছে, নবী ﷺ-এর গোসলের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আমি আমার মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢালি। এভাবেই আমি পবিত্র হয়ে যাই।'[৩০১]

---

২৯৮. সহীহুল বুখারী, ২৫৭
২৯৯. আস-সামারুল মুস্তাতাব, ১/২৭
৩০০. সুনানু আবী দাউদ, ১০১; ফাতাওয়াল ইমারাহ, ৭০
৩০১. সহীহ মুসলিম, ৩৩০

তবে অজুতে কুলি ও নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব। ওয়াজিব হওয়া একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।[৩০২]

প্রশ্ন ১৩৭: জুমআর দিন গোসল করার বিধান কী?

জবাব: জুমআর দিনে গোসল সংক্রান্ত দুই প্রকারের হাদীস পাওয়া যায়। একপ্রকার হাদীস থেকে প্রমাণ হয়, জুমআর দিনে গোসল করা ওয়াজিব। অন্য প্রকার হাদীস দ্বারা গোসলের মাহাত্ম্য ও ফযীলত ফুটে ওঠে। দ্বিতীয় প্রকার হাদীসের কারণে অনেকেই মনে করেন, গোসল ওয়াজিব নয়।

যেসমস্ত হাদীস দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণ হয়, তার পরিমাণ অনেক এবং সবগুলোই সহীহ। যেমন:

ক.

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

প্রত্যেক বালিগের ওপর জুমআর দিন গোসল করা ওয়াজিব।[৩০৩]

খ.

مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

যে জুমআর আসে সে যেন গোসল করে।[৩০৪]

গ.

حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ

প্রত্যেক মুসলিমের হক হচ্ছে, সে প্রতি সাত দিনে গোসল করবে।[৩০৫]

যেসমস্ত হাদীস দ্বারা গোসলের মাহাত্ম্য ও ফযীলত প্রমাণিত হয়; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ

যে-ব্যক্তি জুমআর দিন অজু করল সে ভালো করল। অন্যদিকে যে গোসল করল, (আর) গোসল উত্তম।[৩০৬]

---

৩০২. সহীহুল বুখারী, ১৫৯, ১৬৪; সহীহ মুসলিম, ২৩৫; ফাতাওয়াল ইমারাত, ৭১
৩০৩. সহীহুল বুখারী, ৮৭৯; সহীহ মুসলিম, ১৮৪৫
৩০৪. সুনানুত তিরমিযী, ৪৯২
৩০৫. সহীহুল বুখারী, ৮৯৭; সহীহ মুসলিম, ১৮৪৮
৩০৬. সুনানুত তিরমিযী, ৪৯৭; সুনানুন নাসায়ী, ১৩৮৩

'গোসল উত্তম' এ উক্তি দ্বারা কিছু আলেম প্রমাণ করেন যে, গোসল ওয়াজিব নয়। অথচ এ উক্তি দ্বারা তা প্রমাণ হয় না। কেননা 'জুমআর দিন গোসল উত্তম' একথা মুস্তাহাব গোসলের ক্ষেত্রেও বলা সঙ্গত, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা গোসলের ক্ষেত্রেও বলা সঙ্গত আবার ওয়াজিব গোসলের ক্ষেত্রেও বলা সঙ্গত। যে-কোনো প্রকার গোসল হোক না কেন এভাবে বলা যায় 'আর যে গোসল করল, গোসল উত্তম।' বরং আমরা যদি জুমআর দিন গোসলকে সুন্নাহ না বলে ওয়াজিব বলি, তাহলে গোসলের শ্রেষ্ঠত্ব আরও বলিষ্ঠ ও শক্তিশালীভাবে প্রমাণিত হয়; যেমন, আমরা যদি জুমআর দিন গোসলকে মুস্তাহাব না বলে সুন্নাহ বলি, তাহলে গোসলের শ্রেষ্ঠত্ব আরও বলিষ্ঠ ও শক্তিশালীভাবে প্রমাণিত হয়।

আমরা আরও বলতে পারি, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমআর দিনে গোসল করার যে তাগিদ দেন, শ্রেষ্ঠত্বের বিধানটি তার পূর্বের। কেননা শরীআতে অনেক বিধান ক্রমান্বয়ে উন্নত ও শক্তিশালী করা হয়েছে। আর এটি জানা বিষয় যে, সাহাবীদের জীবন জাগতিক সাজসরঞ্জমাদি ও বিলাসিতাপূর্ণ ছিল না। তারা খুব কষ্টের সাথে জীবন অতিবাহিত করতেন। তা ছাড়া তৎকালে পানির অভাবও ছিল প্রকট। পানির স্বল্পতার কারণে গোসল ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজগুলো খুব সহজ ছিল না। এ অবস্থায় তাদেরকে ওয়াজিবভাবে সরাসরি গোসলের আদেশ দেওয়া মানে তাদেরকে কষ্টের মধ্যে ঠেলে দেওয়া। কোনো কোনো হাদীসে এর বাস্তব দৃশ্যও দৃষ্টিগোচর হয়। আয়েশাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার জুমআর দিনে মসজিদে প্রবেশ করেন। দেখেন সাহাবীদের ঘর্মাক্ত পোশাকের কারণে মসজিদে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে তিনি তাদের বলেন, لَوْ اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ তোমরা যদি জুমআর দিন গোসল করতে![৩০৭] গোসল ওয়াজিব হওয়ার এটি ছিল উদ্বোধন। এরপর গোসলের নির্দেশসূচক অন্যান্য হাদীসের অবতারণা হতে থাকে।

আমরা যে বিশ্লেষণ করলাম এমনটা উমার ইবন খাত্তাব ﷺ-ও বুঝতেন। তিনি একদিন জুমআর খুতবা দিচ্ছিলেন। সেই সময় এক ব্যক্তি অন্য বর্ণনায়, উসমান ইবন আফফান ﷺ মসজিদে প্রবেশ করেন। তাকে দেখে উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ খুতবা বন্ধ করে জিজ্ঞেস করেন, কেন তিনি খুতবায় আসতে দেরি করলেন। তিনি জবাব দেন, আমি আযান শোনামাত্রই অজু করে মসজিদে আগমন করলাম। উমার তাকে বলেন, শুধু অজু করে এলেন! অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'যে জুমআয় আসে সে যেন গোসল করে।'[৩০৮]

৩০৭. সহীহুল বুখারী, ৯০৩; সহীহ মুসলিম, ১৮৪৪
৩০৮. সহীহুল বুখারী, ৮৮২; সহীহ মুসলিম, ৮৪৫

উমারের এভাবে জনসম্মুখে উসমানের প্রতিবাদ করা প্রমাণ করে, জুমআর দিন গোসল করা এমন ফযীলতপূর্ণ আমল যে, যে-ব্যক্তি তা পরিহার করবে, সে তিরস্কারযোগ্য।

একদল আলেম বলেন, এ ঘটনায় উল্লেখ করা হয়নি যে, উসমান ﷺ সেদিন গোসল করেননি। তাদের এ অভিব্যক্তি সঠিক। কিন্তু উমারের তাকে জিজ্ঞেস করার সাথে উসমানের পক্ষ থেকে 'আমি আযান শোনামাত্রই অজু করে মসজিদে আগমন করলাম।' জবাব থেকে বোঝা যায়, তিনি সেদিন গোসল করেননি। তবে উসমানের জবাব গোসল ওয়াজিব হওয়ার পক্ষ-বিপক্ষ কোনো দলেরই পক্ষের দলিল নয়। এর বিপরীতে উসমানের জবাবের পিঠে উমার যে অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেন এবং হাদীস বর্ণনা করেন, তা গোসল ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে অতিস্পষ্ট দলিল।

❑ জ্ঞাতব্য:

জুমআর দিন গোসল করা সালাত শুদ্ধ হওয়ার শর্ত নয়; বরং তা জুমআয় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির জন্য শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত আদব।

❑ শাস্ত্রীয় মূলনীতি:

জুমআর দিন গোসল ওয়াজিব সংক্রান্ত পূর্বে উল্লিখিত তিনটি হাদীস বুখারী-মুসলিমের। এর বিপরীতে গোসলের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসটির কোনো সহীহ সনদ আমি পাইনি। একাধিক সনদের ভিত্তিতে আমরা তাকে যঈফ না বলে সহীহ বলেছি।

❑ ফিকহী উপকারিতা:

মূলনীতি হচ্ছে, কোনো বিধানের অতিরিক্ত বিধান প্রমাণিত হলে সেই অতিরিক্ত বিধান ধর্তব্য হবে। যেমন, কোনো দলিল দ্বারা যদি কোনো বিষয় বৈধ প্রমাণ হয় তারপর অন্য আরেকটি দলিলের মাধ্যমে সেই বিষয়টি যদি মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়, তবে আমরা প্রথম দলিলের ভিত্তিতে শুধু সেই বিষয়টিকে বৈধ বলব না; বরং দ্বিতীয় দলিলের ভিত্তিতে তাকে মুস্তাহাব আখ্যা দেব। কেননা বৈধ আর মুস্তাহাবের মাঝে কোনো বিরোধ ও দ্বৈরথ নেই।

উদাহরণস্বরূপ আরও বলতে পারি, কোনো হাদীস দ্বারা যদি কোনো কিছু বৈধ প্রমাণিত হয় আর অন্য আরেকটি হাদীস দ্বারা ঠিক উক্ত কাজটি হারাম প্রমাণিত হয়; কিন্তু কোন বিধানটি পূর্বের আর কোন বিধানটি পরের তা আমরা জানতে সক্ষম না হই, তবে এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে-বৈধ হওয়ার ওপর হারাম হওয়া প্রাধান্য পাবে।

একটি হাদীসে এসেছে, যদিও হাদীসটির সনদ দুর্বল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ফরজ বিধানসমূহকে ফরজ করে দিয়েছেন এবং সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। আর কিছু বিষয়ে মৌনতা অবলম্বন করেছেন দয়াপরবশ হয়ে। তোমরা সেসব বিষয়ে কোনো কিছু জানতে চেয়ো না।[৩০৯] ইসলামের সূচনায় যেসব ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করা হয়েছিল, তা আজ পর্যন্ত মৌন থাকবে অর্থাৎ তা বৈধ ও জায়েয। আর যেসব জিনিস হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, তা হারাম বলে গণ্য হবে।

জুমআর দিন গোসলের বিধানের ক্ষেত্রে আমরা যদি এই মূলনীতি প্রয়োগ করি, তাহলে আমরা এভাবে ফলাফলে পৌঁছাতে সক্ষম হই যে-'তোমরা যদি জুমআর দিন গোসল করতে' এই হাদীসে গোসলের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করা হয়েছে। এই উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করার পূর্বে জুমআর দিন গোসল ছিল অন্যান্য সাধারণ গোসলের ন্যায়। এরপর 'আর যে গোসল করল, গোসল উত্তম' হাদীস দ্বারা অজুর ওপর গোসলের মর্যাদা ও ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর সেসব হাদীস অস্তিত্বে এসেছে যেসব হাদীস দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। ওয়াজিব বিধানটি পূর্বের বিধানের অতিরিক্ত বিধান।

হাফিয ইবন হাজার আসকালানীর 'শারহুন নুখবাহ' নামে একটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ রয়েছে। তিনি তাতে বলেন, পরস্পর বিরোধী যদি দুটি হাদীস পাওয়া যায়, যার একটি সহীহ অন্যটি হাসান, তবে আমরা নিম্নের পদ্ধতি অবলম্বন করব-

ক. আমরা উভয় হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনের যে-কোনো এক পদ্ধতিতে সমন্বয় করব। পরস্পর বিরোধী হাদীসের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের শতাধিক পদ্ধতি রয়েছে।

খ. সমন্বয়ের কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব না হলে নাসিখ-মানসূখের পদ্ধতি অবলম্বন করব।

গ. নাসিখ-মানসূখ নির্ধারণ করা সম্ভব না হলে হাদীসের শুদ্ধতার স্তরের ভিত্তিতে একটিকে আরেকটির ওপর প্রাধান্য দেব। যেমন, পরস্পর বিরোধী দুটি হাদীসের একটি যদি হাসান হয় আর অন্যটি সহীহ হয়, কিন্তু উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন সম্ভব না হয় এবং নাসিখ-মানসূখ নির্ধারণও করা সম্ভব নয়, সেই সময় হাসান হাদীসের ওপর সহীহ হাদীস প্রাধান্য পাবে। অনুরূপ একটি হাদীস যদি সহীহ গরীব হয় আর অন্যটি সহীহ মুস্তাফিয বা মাশহুর হয়, তখন সহীহ মুস্তাফিয বা মাশহুর হাদীস সহীহ গরীব হাদীসের ওপর প্রাধান্য পাবে।

---

৩০৯. দারাকুতনী, ৪/১৮৪; আস-সুনানুল কুবরা, ১০/১২

ঘ. শুদ্ধতার দিক থেকে যদি উভয় হাদীস সমান হয়, একটিকে অন্যটির ওপর প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব না হয়, তখন উভয় হাদীসের প্রতি আমল স্থগিত থাকবে।[৩১০]

প্রশ্ন ১৩৮: শরীরে কোনো আঘাতের কারণে বা জখমের কারণে কেউ যদি ফরজ গোসলে কোনো অঙ্গ ধুতে সক্ষম না হয়, তবে এ ক্ষেত্রে সে কী করবে?

জবাব: সে অবশ্যই তায়াম্মুম করবে। এরপর যেসব অঙ্গ ধুতে সক্ষম, সতর্কতাবশত সেসব অঙ্গ ধুবে।[৩১১]

প্রশ্ন ১৩৯: কী কী কারণে গোসল ফরজ হয়?

জবাব: গোসল ফরজ হওয়ার কারণসমূহ:

১. উত্তেজনা সহকারে বীর্য বের হওয়া। হাদীসে এসেছে; তুমি বীর্য নিক্ষেপ করলে অপবিত্রতার গোসল করবে আর নিক্ষেপ না করলে গোসল করবে না।[৩১২] এ হাদীসের সনদ হাসান।

হাদীসটি অন্য সনদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, আর বীর্য নির্গত হলে গোসল করবে।[৩১৩] এর সনদ উত্তম

২. স্বপ্নদোষের মাধ্যমে বীর্য নির্গত হওয়া। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান। উম্মু সালামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহি! আল্লাহ তাআলা হকের ব্যাপারে লজ্জা করেন না। নারীদের স্বপ্নদোষ হলে তারাও কি গোসল করবে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, বীর্য দেখলে গোসল করবে।' উম্মু সালামা ﷺ বলেন, 'নারীদেরও স্বপ্নদোষ হয়!' তিনি বললেন, 'তোমার হাত ধুলোয় ধূসরিত হোক! তা না হলে কীভাবে সন্তান তার মায়ের মতন হয়?'[৩১৪]

এ হাদীসের মাধ্যমে তাদের মত খণ্ডন হয় যারা বলে নারীদের বীর্যপাত হয় না।

৩. দুই লজ্জাস্থান মিলিত হলে। পুরুষ নারীর চার জানুতে বসলে এবং উভয়ের লজ্জাস্থান মিলিত হলে, গোসল ওয়াজিব হয়; যদিও বীর্যপাত না হয়।

---

৩১০. ফাতাওয়াল ইমারাহ, ৭২-৭৬
৩১১. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/৩৬২
৩১২. মুসনাদ আহমাদ, ৮৪৭
৩১৩. সুনানু আবী দাউদ, ২০৬
৩১৪. সহীহুল বুখারী, ৩৩২৮; সহীহ মুসলিম, ৫৯৯

ইসলামের সূচনা বিধান ছিল দুই লজ্জাস্থান মিলিত হওয়ার পর বীর্যপাত হলে গোসল করা ফরজ হয়। পরবর্তীকালে তা রহিত করা হয় এবং বিধান দেওয়া হয়, বীর্যপাত নাহলেও গোসল ফরজ।[৩১৫] পরবর্তী বিধানের পক্ষে আয়াতও রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

আর তোমরা অপবিত্র হলে পবিত্রতা অর্জন করো।[৩১৬]

আরবী ভাষায় অপবিত্রতা দ্বারা মিলনকে বোঝায়, যদিও বীর্যপাত না হয়-এমনটি ইমাম শাফিয়ী বলেছেন।

৪. হায়েয। হাদীসে এসেছে, যখন তোমার হায়েয আসবে, সালাত ছেড়ে দেবে আর যখন হায়েয শেষ হবে তখন গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে।[৩১৭]

৫. নিফাস। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, হালাল-হারাম এবং মুবাহ-মাকরূহ সকল ব্যাপারে নিফাসের বিধান হায়েযের মতোই।[৩১৮]

প্রশ্ন ১৪৯: অপবিত্রতার কারণে ফরজ গোসল এবং হায়েযের কারণে ফরজ গোসলের মাঝে কি কোনো পার্থক্য আছে?

জবাব: আয়েশাহ ﵂ থেকে বর্ণিত, আসমা বিনত ইয়াযিদ নবী ﷺ-কে হায়েযের গোসলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। নবী ﷺ বলেন, তোমরা পানি ও বরই পাতা নিয়ে উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে।...তারপর সুগন্ধযুক্ত কাপড় নিয়ে তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। আসমা জিজ্ঞেস করেন, কাপড় দ্বারা কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে? নবীজি ﷺ বলেন, সুবহানআল্লাহ, তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে।...এরপর আসমা অপবিত্রতাজনিত ফরজ গোসলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে নবীজি ﷺ বলেন, তুমি পানি নিয়ে উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে।...আয়েশাহ ﵂ বলেন, আনসারী মহিলারা কতই উত্তম! দ্বীন বুঝতে লজ্জা তাদের প্রতিবন্ধক হতে পারে না।[৩১৯]

---

৩১৫. সুনানু আবী দাউদ, ২১৪
৩১৬. সূরা মায়েদাহ, ৫:৬
৩১৭. সহীহুল বুখারী, ২২৮; সহীহ মুসলিম, ৬৪০
৩১৮. আস-সামারুল মুস্তাতাব, ১/২৩
৩১৯. সুনানুত তিরমিযী, ৩১৬

এ হাদীস থেকে দিবালোকের ন্যায় অপবিত্রতার কারণে ফরজ গোসল এবং হায়েযের কারণে ফরজ গোসলের মাঝে পার্থক্য প্রমাণিত হয়। হায়েযের গোসলের ক্ষেত্রে যেভাবে খুব রগড়িয়ে গোসল করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে, সেভাবে অপবিত্রতাজনিত গোসলের ব্যাপারে তাগিদ দেওয়া হয়নি। এ ছাড়াও উম্মু সালামার হাদীস থেকে প্রমাণ হয়, অপবিত্রতাজনিত গোসলে চুলের বেণি খোলা ওয়াজিব নয় কিন্তু হায়েযের গোসলে খোলা ওয়াজিব। এটি ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বালের মত। ইবনুল কাইয়িম 'তাহযীবুস সুনান' ১/১৬৫-৬৮ গ্রন্থে এ মতকে সঠিক বলেছেন। এ মতের পক্ষে রয়েছেন ইবন হাযম।[৩২০]

প্রশ্ন ১৪১: কোন কোন ক্ষেত্রে গোসল করা মুস্তাহাব?

জবাব: যেসব ক্ষেত্রে গোসল করা মুস্তাহাব, তা হলো:

১. মৃতব্যক্তিকে গোসল দিলে। হাদীসে এসেছে, যে-ব্যক্তি মৃতকে গোসল দেয়, সে যেন গোসল করে আর যে মৃতকে বহন করে, সে যেন অজু করে।[৩২১]

২. মুশরিককে সমাধি দেওয়ার পর। আলী ইবন আবী তালিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা মারা গেলে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিকট যাই। তাঁর কাছে গিয়ে বলি, আপনার চাচা মারা গেছেন। তিনি বললেন, তাকে নিয়ে গিয়ে ঢেকে দাও। আমি বললাম, তিনি তো মুশরিক অবস্থায় মারা গেছেন। তিনি আবার বললেন, যাও তাকে ঢেকে দাও। আর আমার কাছে আসার পূর্ব পর্যন্ত কোনো কিছু করবে না। আমি নবী ﷺ-এর কথামতো কাজ করে তাঁর কাছে ফিরে আসি। আর তখন তিনি আমাকে গোসল করার আদেশ দেন।[৩২২]

হাদীসটি অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে: আমি গোসল করে আবার নবী ﷺ-এর কাছে আসি। তিনি আমার জন্য এমন দুআ করলেন, আমি লাল ও কালো উট পেলেও তত খুশি হতাম না। আলী رضي الله عنه মৃতকে গোসল দিলে গোসল করতেন।[৩২৩]

৩. ইহরামের জন্য গোসল করা; এমনকী নিফাসগ্রস্ত মহিলা হলেও। তবে কারো মতে, নিফাসগ্রস্ত মহিলার জন্য গোসল করা ওয়াজিব। এই মত হাসান বাসরী, যাহিরী মাযহাব ও ইবন হাযমের।

---

৩২০. তামামুল মিন্নাহ, ১২৪

৩২১. মুসনাদ আহমাদ, ৭৬৭৫; সুনানুত তিরমিযী, ৯৯৩, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৩২২. সুনানুন নাসায়ী, ১৯০, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৩২৩. যাওয়াইদুল মুসনাদ, ১/১০৩, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

৪. মক্কায় প্রবেশের সময়। ইবন উমার ﷺ বলেন, তার জন্য গোসল করা সুন্নাত, যে ইহরাম বাঁধতে ইচ্ছুক এবং মক্কায় প্রবেশ করতে ইচ্ছুক।[৩২৪]

৫. একাধিকবার সহবাস করলে প্রত্যেক সহবাসের পর। আবু রাফি ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ একদিন তাঁর স্ত্রীদের নিকট গমন করেন। তিনি প্রত্যেকের কাছে গোসল করেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহি! আপনি শেষে একবার গোসল করলেই তো পারতেন? তিনি বলেন, প্রত্যেকবার গোসল করা অধিকতর উত্তম, পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক।[৩২৫]

৬. অবচেতন হওয়ার পর। নবী ﷺ অসুস্থতার সময় এমনটা করতেন, যা আয়েশাহ ﷺ'র হাদীস থেকে প্রমাণিত।[৩২৬]

৭. মুস্তাহাযা মহিলার প্রত্যেক সালাতের জন্য। অথবা যোহর ও আসরের জন্য একসঙ্গে গোসল করা, অনুরূপ মাগরিব ও ঈশার সালাতের জন্য একবার গোসল করা। দুই সালাতের জন্য একবার গোসল করার ক্ষেত্রে প্রথম সালাতকে দ্বিতীয় সালাতের ওয়াক্ত পর্যন্ত দেরি করতে হবে। আর ফজর সালাতের জন্য একবার গোসল করা।[৩২৭]

প্রশ্ন ১৪২: অপবিত্র অবস্থায় নখ-চুল কাটার বিধান কী?

জবাব: শরীআতে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, যা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, অপবিত্র অবস্থায় নখ-চুল কাটা মাকরূহ। ইমাম বুখারী তদীয় 'সহীহুল বুখারী'-তে এভাবে অধ্যায় রচনা করেছেন: 'অপবিত্র ব্যক্তি (ঘর থেকে) বের হয়ে বাজারসহ অন্যান্য স্থানে চলাফেরা করবে।' আতা বলেন, 'অপবিত্র ব্যক্তি হিজামা লাগাতে পারে এবং নখ-চুল কাটতে পারে; যদিও অজু না করে।' আতার এ আসারটি আবদুর রাযযাক তার 'মুসান্নাফ' ২৮২/১০৯১ গ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, আবু হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর একদিন তার সঙ্গে মদীনার এক রাস্তায় সাক্ষাৎ হয়। আবু হুরাইরাহ ﷺ সেসময় অপবিত্র ছিলেন। আবু হুরাইরাহ ﷺ বলেন, তিনি আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে চলতে লাগলেন। এক জায়গায় গিয়ে তিনি বসলেন। এই সুযোগে আমি কেটে পড়ি এবং গোসল করে আবার আসি। এসে

৩২৪. সহীহ মুসলিম, ১২৫৯ (২); সুনানুত তিরমিযী, ৮৩০
৩২৫. সুনানু আবী দাউদ, ২১৯; সুনানু ইবন মাজাহ, ৫৯০
৩২৬. সহীহ মুসলিম, ৪১৮
৩২৭. আস-সামারুল মুস্তাতাব, ১/২৫

দেখলাম তিনি বসেই আছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'আবু হুরাইরাহ কোথায় ছিলে?' বললাম, 'আমি অপবিত্র ছিলাম। আর অপবিত্র অবস্থায় আপনার সঙ্গে বসতে আমার খারাপ লাগছিল।' তিনি বললেন, 'সুবহানাল্লাহ, আবু হুরাইরাহ! মুমিন ব্যক্তি অপবিত্র হয় না।'[৩২৮]

৩২৮. সহীহুল বুখারী, ২৮৩; দেখুন ইরওয়াউল গলীল, ১/১৯৩/৭৪; সিলসিলাতুয যঈফাহ, ১৩/১/৩৭৭

অধ্যায় আট

তায়াম্মুম

প্রশ্ন ১৪৩: তায়াম্মুম করার পদ্ধতি কী?

জবাব: আম্মার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি অপবিত্র হলাম কিন্তু পানি পেলাম না। ফলে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সালাত আদায় করলাম। পরে নবী ﷺ-কে এ ঘটনা বললাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল-এরপর তিনি দুই তালু জমিনে মারলেন এবং তাতে ফুঁ দিলেন। তারপর উভয় তালু দ্বারা চেহারা ও তালু মাসাহ করলেন।[৩২৯]

অতএব, তায়াম্মুমে চেহারা ও উভয় তালুর জন্য একবার মাটিতে মারতে হবে। এটা ইমাম আহমাদ ও ইসহাক প্রমুখদের মত। গোটা হাত মাসাহ করার পক্ষে দলিল নেই।[৩৩০]

আম্মারের উপর্যুক্ত হাদীসে কোনো সনদে দুইবার মারার কথা পাওয়া যায়। আবার কোনো সনদে কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু সবগুলো সনদ ত্রুটিপূর্ণ, সহীহ নয়। হাফিয ইবন হাজার 'আত-তালখীস' পৃ. ৫৬ গ্রন্থে বলেন, 'ইবন আবদিল বার বলেন, আম্মারের অধিকাংশ মারফু হাদীসে একবার মারার কথা এসেছে। আর দুইবার মারার কথা যেসব বর্ণনায় এসেছে, সবগুলো বিশৃঙ্খলপূর্ণ। আম্মারের হাদীস ছাড়াও বেশ কিছু হাদীসে দুইবার মারার কথা পাওয়া যায়। তবে সবগুলো বর্ণনাই ত্রুটিপূর্ণ, যা আসকালানী 'তালখীস'-এ তুলে ধরেছেন।[৩৩১]

প্রশ্ন ১৪৪: পেইন্টিং করা দেওয়ালে তায়াম্মুমের জন্য মাসাহ করা যাবে কি?

জবাব: অভিধানে যাকে দেওয়াল বলা হবে তাতেই মাসাহ করা যাবে; তাতে তা পেইন্ট করা হোক বা না হোক। কারণ, সবগুলোই দেওয়াল।

প্রশ্ন ১৪৫: এক তায়াম্মুমে কয় ওয়াক্ত সালাত আদায় করা বৈধ?

৩২৯. সহীহুল বুখারী, ৩৩৯; সহীহ মুসলিম, ৩৬৮

৩৩০. আস-সামারুল মুস্তাতাব, ১/৩৪

৩৩১. ইরওয়াউল গালীল, ১৬১ নং হাদীসের অধীনে।

জবাব: সাহাবী ইবন আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, সুন্নাহ হচ্ছে, ব্যক্তি এক তায়াম্মুমে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে। তারপর আরেক ওয়াক্ত সালাতের জন্য পুনরায় তায়াম্মুম করবে।

কিন্তু হাদীসটি ইবন আব্বাস ﷺ থেকে মারফূ বা মাওকূফ হিসেবে সহীহ নয়। বরং তার থেকে এর বিপরীত মতও বর্ণিত হয়েছে, যা ইবন হাযম 'আল-মুহাল্লা' ২/১৩২ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এক তায়াম্মুমে যত ওয়াক্ত ইচ্ছে ফরজ ও নফল সালাত আদায় করতে পারবে, যতক্ষণ না তায়াম্মুম নষ্ট হয় বা পানি পাওয়া যায়। এই মাসআলায় এটাই সঠিক মত, যেমনটি ইবন হাযম প্রমাণ করেছেন।[৩৩২]

প্রশ্ন ১৪৬: কারো কাছে পানি আছে কিন্তু পানি ব্যবহার করলে সালাতের সময় শেষ হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে কি সে তায়াম্মুম করতে পারবে?

জবাব: শাইখ সাইয়্যিদ সাবিক বলেন, 'কেউ যদি পানি ব্যবহারে সক্ষম হয় কিন্তু অজু বা গোসলে পানি ব্যবহার করলে সালাতের সময় শেষ হয়ে যাবে-এক্ষেত্রে সে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে নেবে; তাকে পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে না।'

ইমাম আলবানী শাইখ সাইয়্যিদ সাবিকের মতের পর্যালোচনা করে বলেন, 'আমার মত এ মতের বিপরীতে। কেননা কুরআনের স্পষ্ট দলিল দ্বারা শরীআতে সুসাব্যস্ত বিধান হচ্ছে, পানি না পাওয়া গেলে তায়াম্মুম করা শরীআতসিদ্ধ। সুন্নাহতে এর পরিধি আরও বিস্তৃত করে বলা হয়েছে, অসুস্থতা বা কঠিন ঠান্ডার কারণে তায়াম্মুম বৈধ; যেমনটি স্বয়ং লেখক উল্লেখ করেছেন। অতএব, পানি ব্যবহারে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তায়াম্মুম করার বৈধতার দলিল কোথায়?

যদি বলা হয়, দলিল হচ্ছে, সালাতের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। আমি বলব, একথা দলিল হওয়ার উপযুক্ত নয়। কেননা যে সালাতের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছে, তার ক্ষেত্রে দুই অবস্থার কোনো এক অবস্থা প্রযোজ্য; তার ক্ষেত্রে তৃতীয় অবস্থা নেই। প্রথম অবস্থা হচ্ছে, নিজের অবহেলা ও গাফিলতির কারণে সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় অবস্থা হলো ঘুম বা ভুলে যাওয়া বা এ জাতীয় তার ক্ষমতার বাইরের কোনো কারণে সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় অবস্থার ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে, যখন সে ঘুম থেকে জাগ্রত হবে বা যখন তার সালাতের কথা স্মরণ হবে, তখন থেকেই তার সালাতের ওয়াক্ত শুরু হবে।

---

৩৩২. আস-সিলসিলাতুয যঈফাহ, ১/৬১২-৬১৩

নবী ﷺ বলেন,

‘যে-ব্যক্তি সালাত ভুলে গেছে বা ঘুমিয়ে গেছে তার কাফফারা হলো, যখন স্মরণ হবে তখন আদায় করে নেবে।’[৩৩৩]

এই ধরনের ওজরগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে মহান শরীআত কেবল তার জন্য নির্দিষ্ট ওয়াক্ত নির্ধারণ করে দিয়েছে। তাই সে যদি অজু বা গোসলে পানি ব্যবহার করে, তবুও তার ক্ষেত্রে সালাতের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। অতএব, প্রমাণ হয়, তার জন্য তায়াম্মুম বৈধ নয়। এটাই শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যার মত যেমনটি ‘আল-ইখতিয়ারাত’ পৃ. ১২ গ্রন্থে রয়েছে। ‘আল-মাসাইলুর মারদিনিয়্যাহ’ পৃ. ৬৫ গ্রন্থে একে অধিকাংশের মত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর প্রথম অবস্থার ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে, মৌলিক হুকুম হলো, মুসলিম ব্যক্তি পানি ব্যবহারে আদিষ্ট; সে তায়াম্মুম করবে না। অতএব, এ অবস্থাতেও সে পানি ব্যবহার করবে। পানি ব্যবহার করার পর ওয়াক্তের মধ্যে সালাত আদায় করতে পারলে ভালো। আর না পারলে সে নিজেকে দোষারোপ করবে। কেননা তার নিজের কারণে এমনটা হয়েছে।

এ মতে আমার অন্তর তৃপ্তি অনুভব করে এবং বক্ষে শীতলতা উপলব্ধি হয়। যদিও শাইখুল ইসলাম প্রমুখগণ বলেছেন, সে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে। আল্লাহু আলাম।

এরপর দেখলাম, আমি যে মত দিয়েছি শাওকানী সেই মতকে সমর্থন করেছেন। দেখুন, ‘আস-সাইলুল জাররার’ ১/১২৬-১২৭।[৩৩৪]

প্রশ্ন ১৪৭: কেউ যদি পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করে সালাত শুরু করে এবং সালাত অবস্থায় পানি পায়, তাহলে সে কি সালাত ছেড়ে দিয়ে অজু করে পুনরায় সালাত শুরু করবে, না কি সালাত না ছেড়ে অব্যাহত রাখবে?

জবাব: না, সালাত ছেড়ে দিয়ে অজু করবে। হাদীসে এসেছে, যখন তুমি পানি পাবে তখন তোমার শরীরে তা স্পর্শ করাও।[৩৩৫]

৩৩৩. সহীহ মুসলিম, ১৪৪৬

৩৩৪. তামামুল মিন্নাহ, পৃ. ১৩২

৩৩৫. সুনানুত তিরমিযী, ১২৪; তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/৪৪৬

অধ্যায় নয়

ফিতরাত

প্রশ্ন ১৪৮ : খতনা করার বিধান কী?

জবাব: আমার কাছে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে, খতনা করা ওয়াজিব। এটি ইমাম মালিক, শাফিয়ী ও আহমাদসহ অধিকাংশের মত। ইবনুল কাইয়্যিম এই মতটি গ্রহণ করেছেন। তিনি এ ব্যাপারে ১৫টি পদ্ধতিতে দলিল উপস্থাপন করেছেন। প্রত্যেকটি থেকে [এককভাবে] ওয়াজিব প্রমাণ না হলেও সবগুলোর সমষ্টিতে ওয়াজিব প্রমাণ হয়। তার সেসব দলিল এখানে তুলে ধরার সুযোগ নেই। তবে তার দুটি পদ্ধতির দলিল তুলে ধরছি:

ক. আল্লাহ তাআলা বলেন,

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

অতঃপর আমি তোমার কাছে ওহী করেছি যে, তুমি একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের মিল্লাতের অনুসরণ করো।[৩৩৬]

আর খতনা করা তাঁর মিল্লাত, যেমনটি গ্রন্থে উল্লিখিত আবু হুরাইরা ﷺ'র হাদীসে রয়েছে। এই দলিলটি অত্যন্ত উত্তম দলিল, যেমনটি বাইহাকী বলেছেন; যা হাফিয আসকালানী উদ্ধৃত করেছেন।

খ. খতনা করা এমন একটি বড়ো নিদর্শন যার মাধ্যমে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ হয়; এমনকী মুসলিমরা খতনাবিহীন ব্যক্তিকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করে না বললেই চলে।

ইবনুল কাইয়্যিমের অন্যান্য প্রমাণগুলো কেউ জানতে চাইলে দেখতে পারেন আত-তুহফাহ (পৃ. ৫৩-৬০) গ্রন্থ।[৩৩৭]

৩৩৬. সূরা নাহল, ১৬:১২৩
৩৩৭. তামামুল মিন্নাহ, ৬৭

প্রশ্ন ১৪৯: খতনা করার সময়সীমা কত?

জবাব: খতনা করার সময়সীমা নিয়ে দুটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে:

ক. জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সপ্তম দিনে হাসান ও হুসাইনের পক্ষ থেকে আকীকাহ দেন এবং উভয়ের খতনা করেন।

হাদীসটি তাবারানী 'আল-মুজামুস সাগীর' (পৃ. ১৮৫)-এ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য; তবে মুহাম্মাদ ইবন আবীস সুররী আলকালানীর মুখস্থশক্তি নিয়ে সমালোচনা রয়েছে। তিনি ছাড়া এ সনদে ওয়ালীদ ইবন মুসলিম নামক আরেকজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী রয়েছেন, তিনি তাদলীসুত তাসবীয়াহ করতেন এবং এখানে তিনি মুআনআন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। তাই হাদীসটি দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য।

হাদীসটি হাফিয আসকালানী ফাতহুল বারীতে (১০/২৮২) আবুশ শাইখ ও বাইহাকীর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি এ হাদীসের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি। হতে পারে আবুশ শাইখ ও বাইহাকী ভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন।

খ. ইবন আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সপ্তম দিনে নবজাতকের সাতটি সুন্নাত রয়েছে: নাম রাখা, খতনা করা...

হাদীসটি তাবারানী 'আল-আওসাত' (১/৩৩৪/৫৬২) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাইসামী আল-মাজমাউয যাওয়াইদ (৪/৫৯) গ্রন্থে সনদের রাবীদের নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। হাফিয আসকালানী ফাতহুল বারী (৯/৪৮৩) গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি তাবারানী আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন; তবে সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

আমি বলব, হাফিয আসকালানীর কথা সঠিক। কেননা সনদে রাওয়াদ ইবন জাররাহ নাম একজন রাবী রয়েছেন। তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে, যেমনটি যাহাবীর 'আল-কাশিফ' গ্রন্থে বলা হয়েছে। তবে হাদীস দুটি পরস্পরকে শক্তিশালী করে। কেননা উভয় হাদীসের উৎস ভিন্ন আর উভয় সনদে মিথ্যার দোষে দুষ্ট কোনো বর্ণনাকারী নেই। শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারীগণ এই হাদীস গ্রহণ করে বলেছেন, সপ্তম দিনে খতনা করা মুস্তাহাব, যেমনটি 'আল-মাজমূ' (১/৩০৭) ও অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে।

আর খতনার সর্বোচ্চ সময়সীমা হচ্ছে বালিগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, কোনো অভিভাবকের জন্য জায়েয নয় এতদিন পর্যন্ত বাচ্চার খতনা না করা যে, বাচ্চা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায়।[৩৩৮]

প্রশ্ন ১৫৩: মহিলাদের খতনা করার বিধান কী?

জবাব: দেশ ভিন্নতায় এর বিধান ভিন্ন ভিন্ন হয়। শীতপ্রধান এলাকায় সচরাচর মহিলাদের খতনা করার প্রয়োজন পড়ে না। এর বিপরীতে উষ্ণপ্রধান এলাকায় তাদের খতনা করার প্রয়োজন দেখা যায়। মহিলাদের খতনা সচরাচর করা হয় নারী-অঙ্গে। তাদের যৌনাঙ্গে এক টুকরো মাংস থাকে। সেই মাংস কখনো সামান্য হয় আবার কখনো বড়ো হয়। শীতপ্রধান এলাকায় তা বড়ো হয় না কিন্তু উষ্ণপ্রধান এলাকায় তা বড়ো হয়। এ কারণে উষ্ণপ্রধান এলাকার মহিলারা খতনা করে। হিজাযে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যামানায় এমনটাই হতো। কোনো কোনো সহীহ হাদীসে এসেছে, এক মহিলা খতনা করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, যখন তুমি খাতনা করবে তখন গভীর করে কাটবে না। অর্থাৎ সেই কোমলাস্থি বা মাংস-টুকরো বেশি করে কাটবে না। কারণ, তা চেহারাকে সমুজ্জ্বল করে এবং যা কি না স্বামীর জন্য খুব তৃপ্তিদায়ক।[৩৩৯] অতএব, দেশ ভিন্নতায় মহিলাদের খতনার বিধান ভিন্ন ভিন্ন।

কিন্তু সকল পুরুষের খতনার প্রয়োজন হয়। তবে হাতেগোনা এমন কিছু পুরুষ রয়েছে যারা খতনা করা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। এ ধরনের ঘটনা খুবই বিরল। আর নবী ﷺ-কে ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, তিনি খতনা করা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন। সনদের দিক থেকে এ হাদীস সহীহ নয়। তা ছাড়া এটি কোনো কোনো মানুষের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই ঘটে। তাই একে নবী ﷺ-এর কারামত হিসেবে গণ্য করা যাবে না। কারণ, কোনো কোনো কাফিরও খতনা করা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে; তাই এটি কোনো কারামত নয়।

মোদ্দাকথা, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে যে চামড়া থাকে তা অধিকাংশ পুরুষের কাটা অত্যাবশ্যক হয়। আর উষ্ণপ্রধান এলাকার অধিকাংশ মহিলার ঐ অংশটুকু কাটা আবশ্যক হলেও শীতপ্রধান এলাকার মহিলাদের সেটা কাটা আবশ্যক হয় না। এটাই হচ্ছে খতনার বিধান।[৩৪০]

---

৩৩৮. তামামুল মিন্নাহ, পৃ. ৬৭

৩৩৯. সুনানু আবী দাউদ, ৫৭১, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৩৪০. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/৪৬০-৪৬১

প্রশ্ন ১৫১: গোঁফ কি ছোটো করতে হবে না কি চেঁচেপুঁছে ফেলতে হবে?

জবাব: নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয়, তিনি বলেন,

قَصُّوا الشَّارِبَ مَعَ الشِّفَاهِ

'তোমরা গোঁফ কাটো ঠোঁট সহকারে।' এই হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাবারানী (৭৫৬)।...

কাটা বা ছোটো করা সুন্নাহ; শেভ করে ফেলা নয়। তাহাবী প্রমুখ মুগীরাহ ইবন শুবা ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, এক লম্বা গোঁফওয়ালা ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে আগমন করে। নবী ﷺ মিসওয়াক এবং একটি চাকু নিয়ে লোকটিকে ডাকেন। এরপর নবীজি মিসওয়াকের ওপর রেখে ঐ ব্যক্তির গোঁফ কেটে দেন। হাদীসটি আবু দাউদসহ প্রমুখ সংক্ষিপ্তাকারে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।[৩৪১]

এটাই ছিল একদল সাহাবীর আমল। তাবারানী বর্ণনা করেছেন (১/৩২৯/২) শুরাহবীল ইবন মুসলিম বলেন, আমি পাঁচজন সাহাবীকে দেখেছি, তারা গোঁফ কাটতেন এবং দাড়ি ছেড়ে দিতেন। তারা হলেন: আবু উমামাহ বাহিলী, আবদুল্লাহ ইবন বুসর আল-মাযিনী, উতবাহ ইবন আব্দ আস-সুলামী, হাজ্জাজ ইবন আমির আস-সিমালী ও মিকদাম ইবন মাদীকারুব। তারা ঠোঁটের দিকসহ গোঁফ কাটতেন।[৩৪২]

প্রশ্ন ১৫২: নাভির নিচের ও বগলের লোম পরিষ্কার করার ব্যাপারে কি কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে?

জবাব: হ্যাঁ, চল্লিশ দিন সময়সীমার কথা বলা হয়েছে। আনাস ইবন মালিক ﷺ বলেন,

وُقِّتَ لَنَا فِيْ قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وِحَلْقِ الْعَانَةِ أَن لَّا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً

গোঁফ কাটা, নখ কর্তন করা, বগলের লোম তুলে ফেলা এবং নাভির নিচের লোম চেঁচেপুঁছে ফেলার ব্যাপারে আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয় যে, আমরা যেন চল্লিশ দিনের বেশি রেখে না দেই।[৩৪৩]

৩৪১. সহীহ আবূ দাউদ, ১৮২

৩৪২. সিলসিলাতুয যঈফাহ, ৯/৫৩; তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/৪৬৬

৩৪৩. সহীহ মুসলিম, ৪৮৭

হাদীসটি মুসলিম স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি কর্মবাচ্য-বোধকভাবে বর্ণনা করলেও অন্যরা কর্তৃবাচ্য-বোধকভাবে বর্ণনা করেন। অন্যরা এভাবে বর্ণনা করেন,

وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সময় নির্ধারণ করে দেন।[৩৪৪]

অতএব, এসবের নির্ধারিত সময়সীমা রয়েছে।

প্রশ্নকারী: এ হাদীস থেকে কি বোঝা যায়, নির্ধারিত সময়ের মাঝে পরিষ্কার করা ওয়াজিব?

শাইখ: হ্যাঁ। আপনি জানেন সালাতের নির্ধারিত সময়সীমা আছে। আপনি কি সেই সময়সীমা অতিক্রম করা জায়েয মনে করেন?

প্রশ্নকারী: না, জায়েয মনে করি না।

শাইখ: আপনি জানেন হজ ও উমরার নির্ধারিত সীমা রয়েছে। সেগুলো অতিক্রম করা কি জায়েয? তাই এসব পরিষ্কার করার বিষয়টিও ঠিক অনুরূপ।[৩৪৫]

প্রশ্ন ১৫৩: কানের লোম পরিষ্কার করা কি জায়েয?

জবাব: এতে নাজায়েযের কিছুই নেই। এই লোম মূলত কানের এক ধরনের ময়লা ও অপরিচ্ছন্নতা।[৩৪৬]

প্রশ্ন ১৫৪: নির্দিষ্ট সময় ও উদ্দেশ্য ছাড়া মাথা মুণ্ডন করার বিধান কী?

জবাব: নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয়, তিনি বলেন,

لَا تُوضَعُ النَّوَاصِي إِلَّا فِيْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ

'হজ অথবা উমরা ব্যতিরেকে ললাটের কেশগুচ্ছ (মাথা) মুণ্ডন করা যাবে না।'

হাদীসটি অগ্রহণযোগ্য। এই হাদীসের বাহ্যিক অবস্থা প্রমাণ করে, হজ অথবা উমরা ছাড়া মাথা মুণ্ডন করা শরীআতসিদ্ধ নয়। মূলত হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আরেকটি বাচনিক হাদীস

৩৪৪. সুনানু আবী দাউদ, ৪২০০
৩৪৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/৪৬৯
৩৪৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/৪৬৯

পরিপন্থি। হাদীসটি হলো:

احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ

হয় তোমরা গোটা মাথা মুণ্ডন করো, আর নাহয় গোটা মাথা মুণ্ডন না করে রেখে দাও (অর্থাৎ, আংশিক মাথা মুণ্ডন করো না)।

এই হাদীসটি সহীহ।[৩৪৭]

প্রথম হাদীসটি সহীহ হলেও তার অর্থ এমনটা হতো যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য মাথা মুণ্ডন করা শরীআতসিদ্ধ নয়; যেমনটা কতক সূফী ও তরীকতপন্থি পীর করে থাকে। কেউ তাদের তরীকা গ্রহণ করলে, তারা তাকে নমনীয় হওয়ার জন্য মাথা মুণ্ডন করতে বলে। অতএব, নির্দিষ্ট সময় ও উদ্দেশ্য ছাড়া মাথা মুণ্ডন করা যাবে, এতে কোনো সমস্যাই নেই।[৩৪৮]

৩৪৭. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ১১২৩
৩৪৮. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১/৪৭৭

অধ্যায় দশ

সালাত

আযান ও ইকামত

প্রশ্ন ১৫৫: আযান দেওয়া কি ওয়াজিব?

জবাব: 'ফিকহুস সুন্নাহর' গ্রন্থকার সম্ভবত 'ওয়াজিব না কি মানদূব' এই দুই মতের কোনোটির পক্ষে সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময়-সুযোগ পাননি। আযান দেওয়া মানদূব এই মত বাতিল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কীভাবে তা মানদুব হতে পারে! অথচ তা ইসলামের এমন একটি বড়ো নিদর্শন যে, নবী ﷺ কোনো এলাকায় যদি আযান না শুনতে পেতেন, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন এবং তাদের ওপর অতর্কিত হামলা করতেন আর যদি আযান শুনতে পেতেন তবে হামলা বন্ধ করে দিতেন। এমন ঘটনা বুখারী-মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসে বিদ্যমান। একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা এই আদেশ প্রমাণিত।[৩৪৯] এর থেকে কম বিষয়ের মাধ্যমেও ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। অতএব হক হচ্ছে, আযান ফরযে কিফায়াহ। এ মতকে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ 'মাজমূউল ফাতাওয়া' (১/৬৭-৬৮, ৪/২০) গ্রন্থে সঠিক বলেছেন।[৩৫০]

প্রশ্ন ১৫৬: কেউ যদি দুই সালাত জমা করে তাহলে কি এক আযানই যথেষ্ট হবে?

জবাব: দুই সালাত জমা করে পড়া হলে এক আযান দিতে হবে; তাতে জমাকৃত দুই সালাতের প্রথম ওয়াক্তে করা হোক বা শেষ ওয়াক্তে করা হোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফা ও মুযদালিফায় এক আযান দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হজ আদায় নিয়ে জাবির ﷺ'র এক সুদীর্ঘ লম্বা হাদীস রয়েছে। সেই হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি দিলেন। এরপর আরাফায় পৌঁছালেন এবং নামিরা নামক স্থানে তাঁর জন্য খাটানো একটি তাঁবু পেলেন। তিনি সেই তাঁবুতে অবতরণ করলেন। সূর্য যখন ঢলে পড়ল... বিলাল আযান দিলেন, তারপর ইকামত দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের সালাত পড়লেন। তারপর আবার বিলাল ইকামত দিলেন।

৩৪৯. সহীহুল বুখারী, ২৯৪৩; সুনানু আবী দাউদ, ২৬৩৪; সুনানুত তিরমিযী, ১৬১৮

৩৫০. তামামুল মিন্নাহ, পৃ. ১৪৪

তিনি এবার আসরের সালাত পড়লেন। উভয় সালাতের মাঝে তিনি অন্য কোনো সালাত আদায় করেননি। এরপর আরোহণ করলেন।... মুযদালিফায় আসলেন। সেখানে তিনি এক আযান ও দুই ইকামতে মাগরিব ও ঈশার সালাত পড়লেন। উভয় সালাতের মাঝে কোনো তাসবীহ পড়েননি।

পুরো সুদীর্ঘ হাদীসটি ইমাম মুসলিম[৩৫১] বর্ণনা করেছেন (৪/৩৯-৪৩)। তিনি ছাড়া সুনান গ্রন্থকার প্রমুখগণ বর্ণনা করেছেন। উপর্যুক্ত অংশ শুধু নাসায়ী[৩৫২] (১/১০৭) বর্ণনা করেছেন। আর তাহাবী (১/৪১১) মুযদালিফায় সালাতের কথা বর্ণনা করেছেন।

এটাই আবু হানীফা ও তার সাথিদের এবং শাফিয়ীর মত। এ মতের পক্ষে আছেন ইবন হাযম (৭/১২৫-১২৯)। তিনি বলেন, উমার ﵁ থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত যে, তিনি দুই আযান এবং দুই ইকামতে জমা করতেন।

আমি বলব, হাদীসটি তাহাবী (১/৪০৯) আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন। আসওয়াদ বলেন, আমি উমার ইবন খাত্তাব ﵁'র সঙ্গে দুইবার দুই সালাত আদায় করি। তিনি প্রত্যেক সালাত আযান ও ইকামত সহকারে জমা করতেন।

এ আসারের সনদ সহীহ যেমনটি হাফিয আসকালানী (৩/৪১৩) বলেছেন। ইবন মাসউদ থেকেও দুই আযান ও দুই ইকামত সহীহ সূত্রে প্রমাণিত।

আসারটি ইমাম বুখারী (৩/৪৯২) ও ইবন হাযম (৭/১২৭) উমারের বর্ণনার ন্যায় বর্ণনা করেছেন। আলী ﵁ থেকেও তা বর্ণনা করা হয়। এটি মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন হাসানের মত। তিনি এটা তার আহলে বাইত-এ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ মত দিয়েছেন মালিক।

সাহাবীদের আসারের জবাবে ইবন হাযম বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস থাকতে আর কোনো প্রমাণ লাগে না। এ ক্ষেত্রে উমার, ইবন মাসউদ ও আলীর কথা দলিল নয়। কারণ, একাধিক সাহাবী তাদের বিপরীতে মত পোষণ করেছেন। ইবন উমার, সালিম এবং আতা থেকে আমাদের মতের পক্ষে মত বর্ণিত হয়েছে।[৩৫৩]

---

৩৫১. হাদীস নং, ২৮৪০

৩৫২. হাদীস নং, ৬০৫

৩৫৩. আস-সামারুল মুস্তাতাব, ১/১৪১

প্রশ্ন ১৫৭: কাযা সালাতের জন্য কি আযান দেওয়া যাবে? একাধিক ওয়াক্ত সালাত কাযা হলে কীভাবে আযান দিতে হবে?

জবাব: শরীআতসম্মত কারণে সালাত কাযা হয়ে গেলে আযান দিতে হবে। একাধিক ওয়াক্ত কাযা হয়ে গেলেও একবার আযান দিতে হবে। আর এমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও করেছেন। এ ব্যাপারে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে :

ক. আবু কাতাদা ﷺ থেকে বর্ণিত, কোনো এক সফরে ঘুমের কারণে ফজরের সালাত কাযা হয়ে গেলে নবী ﷺ বিলালকে আযান দেওয়ার আদেশ দেন।[৩৫৪]

খ. আবু হুরাইরাহ ﷺ থেকেও এমন একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

গ. ইবন মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, খন্দকের দিন মুশরিকরা চার ওয়াক্ত সালাত থেকে নবী ﷺ-কে ব্যস্ত রাখেন। আল্লাহ যতটুকু চান ততটুকু রাত কেটে গেলে তিনি বিলালকে আদেশ দেন। বিলাল ﷺ আযান দেন, তারপর ইকামত দেন। নবী ﷺ যোহরের সালাত পড়ান। এরপর বিলাল আবার ইকামত দেন। নবী ﷺ আসরের সালাত পড়ান। এরপর আবারও বিলাল ইকামত দেন। নবী ﷺ মাগরিবের সালাত পড়ান। এরপর আবার বিলাল ইকামত দেন। নবী ﷺ তারপর ঈশার সালাত পড়ান।[৩৫৫] হাদীসটি তিরমিযীসহ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।[৩৫৬]

প্রশ্ন ১৫৮: কেউ কোথাও একাকী সালাত আদায় করলে, সে কি আযান দিতে পারবে?

জবাব: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন কোনো রাখাল পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থানকালে আযান দিয়ে সালাত আদায় করে, তখন তোমাদের রব সন্তুষ্ট হন। তিনি (ফেরেশতাদের) বলেন, তোমরা আমার এই বান্দার দিকে তাকিয়ে দেখো, সে আযান দিয়ে সালাত আদায় করছে। সে তো আমার ভয়ে এমন করছে। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালাম।[৩৫৭]

এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয়, একাকী কোনো ব্যক্তি সালাত আদায় করলেও আযান দেওয়া মুস্তাহাব। অতএব, এ ব্যাপারে অবহেলা করা উচিত নয়।[৩৫৮]

---

৩৫৪. সহীহ মুসলিম, ১৪৪৬; সুনানু আবী দাউদ, ৪৩৫

৩৫৫. সুনানুন নাসায়ী, ৬৬২, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৩৫৬. আস-সামারুল মুস্তাতাব, ১/১৪২

৩৫৭. সুনানু আবী দাউদ, ১২০৩, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৩৫৮. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ১/১/১০২

প্রশ্ন ১৫৯: কেউ যদি ভুল করে এক বা একাধিক রাকাআত সালাত না পড়েই মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, পরে আবার সেই রাকাআত পূর্ণ করার জন্য মসজিদে আসে, তাহলে কি তাকে পুনরায় ইকামত দিতে হবে?

জবাব: কেউ যদি এক বা একাধিক রাকাআত ভুলে গিয়ে, যা ছাড়া তার সালাত পূর্ণ হবে না- সালাম ফিরিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় আর সে উক্ত সালাত পূর্ণ করতে চায়, তাহলে তাকে আবার ইকামত দিতে হবে। প্রমাণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন সালাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে চলে যান অথচ তখনো এক রাকাআত বাকি ছিল। এক ব্যক্তি গিয়ে বললেন, আপনি এক রাকাআত ভুলে গেছেন। নবী ﷺ ফিরে এসে মসজিদে প্রবেশ করেন এবং বিলালকে (ইকামত দেওয়ার) আদেশ দেন। বিলাল ইকামত দিলে তিনি মানুষদের নিয়ে এক রাকাআত আদায় করেন।[৩৫৯] হাদীসটি সহীহ[৩৬০]

প্রশ্ন ১৬০: আমি যদি নাপাক অবস্থায় থাকি, তাহলে কি আমার জন্য আযান দেওয়া জায়েয হবে?

জবাব: হ্যাঁ, জায়েয হবে। তবে উত্তম হচ্ছে, আপনি পূর্ণ পবিত্র অবস্থায় আযান দেবেন।[৩৬১]

প্রশ্ন ১৬১: কেউ যদি ফরয রোজাবস্থায় থাকে, তাহলে সে প্রথমে ইফতার করবে না কি প্রথমে আযান দেবে?

জবাব: আমরা এ ব্যাপারটা তেমন জটিল মনে করি না। উভয়ের যে-কোনো একটি প্রথমে করতে পারে।

প্রশ্নকারী: ইফতারের সময় হয়ে যাওয়ার পরও কি রোজাবস্থায় থাকা জায়েয হবে?

জবাব: প্রথম ওয়াক্তে ইফতার করা যেমন জায়েয, তেমনি প্রথম ওয়াক্তে আযান দেওয়াও জায়েয। অতএব, উভয়ের যেটাই আগে করুক বা পরে করুক, দুই-ই সমান। আমাদের কাছে একটাকে আরেকটার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার কোনো কিছু নেই যে বলব, আগে ইফতার করো তারপর আযান দাও বা আগে আযান দাও তারপর ইফতার করো।[৩৬২]

৩৫৯. মুসনাদ আহমাদ, ২৭২৫৪, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৩৬০. আস-সামারুল মুস্তাতাব, ১/২৪৬

৩৬১. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ২/৪৭০

৩৬২. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ২/৪৭১; তবে আযান শেষ করতে কিছুটা লম্বা সময় লাগে কিন্তু দু'একটি খেজুর খেতে তেমন সময় লাগে না। তাই প্রথমে দু'একটি খেজুর খেয়ে আযান শুরু করলে ইফতার দেরি হবে না এবং

প্রশ্ন ১৬২: ইকামতে 'কাদকামাতিস সালাহ' বলার সময় মুসল্লীরা কি জবাবে 'আকামাহাল্লাহ ওয়া আদামাহ' বলবে?

জবাব: মুস্তাহাব হচ্ছে, ইকামতদাতা 'কাদকামাতিস সালাহ' বললে তার জবাবেও 'কাদকামাতিস সালাহ' বলা। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম ব্যাপকভাবে বলেন,

إِذَا سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ

যখন তোমরা মুআযযিনকে শুনবে, তখন তাই বলো যা মুআযযিন বলে।[৩৬৩]

'কাদকামাতিস সালাহ' বলার সময় 'আকামাহাল্লাহ ওয়া আদামাহ' বলা সংক্রান্ত হাদীসটি দুর্বল। হাদীসটিকে ইমাম নববী, আসকালানীসহ অন্যান্যরা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।[৩৬৪]

প্রশ্ন ১৬৩: মহল্লায় যদি একাধিক মসজিদ থাকে তাহলে কোন মসজিদের আযানের জবাব দিতে হবে?

জবাব: সবচেয়ে বেশি কাছের মসজিদের।

প্রশ্নকারী: সবচেয়ে কাছের মসজিদের না কি যে মসজিদে সে সালাত পড়ে?

জবাব: কাছের মসজিদের।[৩৬৫]

প্রশ্ন ১৬৪: সুরেলাভাবে আযান দেওয়ার বিধান কী?

জবাব: ইসলামে এটা জায়েয নয়।

প্রশ্নকারী: কিন্তু হারাম আন-নববীতে তো এভাবে আযান দেওয়া হয়?

জবাব: কস্মিনকালেও এটা জায়েয নয়। সুরেলাভাবে আযান দেওয়ার ব্যাপারে ইবন উমার ﷺ থেকে একটি আসার বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি ইবন উমার ﷺ-কে বলে, আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। জবাবে তিনি বলেন, আর আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ঘৃণা

আযানও সাথে সাথে দেওয়া যায়। তাই প্রথমে দু'একটি খেজুর খেয়ে ইফতার করার পর আযান দেওয়া সবচেয়ে ভালো মনে হয়, আল্লাহু আলাম।—সংকলক

৩৬৩. মুসনাদ আহমাদ, ৬৫৬৮

৩৬৪. তামামুল মিন্নাহ, ১৪৯

৩৬৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ২/৫২২

করি। লোকটি বলে, আজব ব্যাপার! কেন? তিনি বলেন, তুমি সুরেলাভাবে আযান দাও এবং আযানের বিনিময় গ্রহণ করো।[৩৬৬]

এভাবে সুরেলা আযান মূলত গানের অন্তর্ভুক্ত যা আমরা গায়কদের থেকে গ্রহণ করেছি, যেমনটা বর্তমানে ইসলামী সংগীতের নামে চর্চা করা হচ্ছে।[৩৬৭]

প্রশ্ন ১৬৫: নবজাতকের ডান কানে আযান দেওয়ার হাদীস কি প্রমাণিত?

জবাব: না, প্রমাণিত নয়।[৩৬৮]

প্রশ্ন ১৬৬: আযান ও ইকামতের মাঝে মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা কি জায়েয?

জবাব: এটি একটি বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়। যদি অতি সাধারণ কথা হয়, যেমন: কেউ মসজিদে প্রবেশ করে অনেক দিন সাক্ষাৎ নেই এমন একজনকে দেখে বলল, আস-সালামু আলাইকুম। জবাবে অপরজন বলল, ওয়া আলাইকুমুস সালাম, কেমন আছেন ভাই? এ ধরনের সাধারণ দুনিয়াবী কথাবার্তা জায়েয। কিন্তু কেউ যদি মসজিদে বসে কাজের মজুরি, টাকা-পয়সা, বাজারদর ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, তাহলে তা জায়েয নয়। যদিও প্রসঙ্গ ভিন্ন ছিল- এসব ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মসজিদগুলো এজন্য নির্মাণ করা হয়নি।[৩৬৯]

অতএব, সাধারণ কথা বলা নিষিদ্ধ নয়। দুনিয়াবী মাল-সামান নিয়ে কথা বলা জায়েয নয়।[৩৭০]

প্রশ্ন ১৬৭: আযান চলাকালীন কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে, সে দাঁড়িয়ে থেকে আযানের জবাব দেবে না কি তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা শুরু করবে?

জবাব: এ ক্ষেত্রে দুই অবস্থা রয়েছে :

ক. জুমআর দিন যদি মসজিদে প্রবেশ করে দেখে খতীব মেম্বারে বসে আছেন আর মুআযযিন আযান দিচ্ছেন, তাহলে দাঁড়িয়ে না থেকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া শুরু করবে। কারণ, আযানের জবাব দেওয়া মুস্তাহাব আর খুতবা শোনা ওয়াজিব। আযানের জবাব দেওয়ার

---

৩৬৬. তরহুত তাসরীব, ৩/১১৮-১২০
৩৬৭. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ২/৫৬৫
৩৬৮. সিলসিলাতুয যঈফাহ, ৩২১; তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ২/৫৯২
৩৬৯. সহীহ মুসলিম, ৫৬৮
৩৭০. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ২/৫৯৫

পর তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়লে ওয়াজিব কাজে বিঘ্ন ঘটবে। তাই আযানের জবাব না দিয়ে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে নেবে।

খ. জুমআর দিন ছাড়া অন্যান্য দিন হলে প্রথমে আযানের জবাব দেবে তারপর তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বে।[৩৭১]

সালাতের পদ্ধতি

প্রশ্ন ১৬৮: যা ছাড়া সালাত শুদ্ধ হবে না, এমন রুকনগুলো কী কী?

জবাব: সালাতের রুকনসমূহ হলো: তাকবীরে তাহরীমা, সূরা ফাতিহা পাঠ, রুকু, প্রত্যেক রুকু থেকে ওঠার পর শান্তভাবে দাঁড়ানো, সাজদা করা, দুই সাজদার মাঝে বসা, দ্বিতীয় সাজদা, তাশাহহুদ এবং সর্বশেষে সালাম। এগুলোই আপাতত আমার স্মরণ হচ্ছে।[৩৭২]

প্রশ্ন ১৬৯: কিবলামুখী হওয়া কি সালাতের রুকন?

জবাব: হে মুসলিম! যখন তুমি সালাতে দাঁড়াবে, ফরয হোক বা নফল হোক, তখন কিবলামুখী হও, তুমি যেখানেই থাকো না কেন। এটি সালাতের একটি রুকন। এ ছাড়া সালাত শুদ্ধ হবে না।[৩৭৩]

প্রশ্ন ১৭০: আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা বা অন্যান্য ওজরবশত কিবলা নির্ধারণে ভুল করার কারণে কেউ কিবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে সালাত আদায় করলে, তার সালাত কি শুদ্ধ হবে?

জবাব: জাবির ﷺ বলেন, আমরা কোনো সফরে বা কোনো এক যুদ্ধাভিযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ আমাদেরকে মেঘাচ্ছন্নতা দেখা দিলো। আমরা কিবলা নির্ধারণ করতে শুরু করলাম এবং তা নির্ধারণে মতপার্থক্যও হয়ে গেল। প্রত্যেকে নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সালাত আদায় করল। আমাদের প্রত্যেকেই নিজের সামনে দাগ দিয়ে রাখল যেন আমরা আমাদের জায়গা চিনতে পারি। সকাল হলে আমরা আমাদের দাগ দেখলাম এবং বুঝতে পারলাম, আমরা

৩৭১. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ২/৫৯৫, সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত
৩৭২. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৩/৭
৩৭৩. তালখীসুস সিফাত, ১ম অনুচ্ছেদ

সবাই কিবলা ছাড়া অন্য দিকে সালাত আদায় করেছি। এই ঘটনা আমরা নবী ﷺ-কে জানালে তিনি আমাদের পুনরায় সালাত পড়তে আদেশ দেননি বরং বললেন, তোমাদের সালাত হয়ে গেছে।[৩৭৪]

এটাই আহমাদ ও অন্যান্যদের মত। তিরমিযী আমির ইবন রাবীআর হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন, অধিকাংশ আলেম এই মত পোষণ করেছেন। তারা বলেছেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে কেউ যদি কিবলা ছাড়া অন্য দিকে সালাত আদায় করে এবং সালাত আদায় করার পর জানতে পারে যে, সে অন্যদিকে সালাত আদায় করেছে, তাহলে তার সালাত হয়ে যাবে। এ মত দিয়েছেন সুফইয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, আহমাদ ও ইসহাক।

সঠিক কথা হচ্ছে, এই মাসআলায় হানাফী মাযহাবের মত শাফিয়ী মাযহাবের বিপরীতে, যেমনটি 'হিদায়া' গ্রন্থে রয়েছে। নববীর ভাষ্যমতে শাফিয়ী মাযহাবের বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, কেউ যদি ভুল নিশ্চিত হয় তবে পুনরায় সালাত আদায় করা ওয়াজিব। ইমাম শাফিয়ী 'উম্ম' (১/৮২) গ্রন্থে যে আলোচনা করেছেন তা থেকেও এটি প্রমাণ হয়।

উপর্যুক্ত হাদীসের কারণে এ মাসআলায় সঠিক মত হলো, প্রথম দলের মত অর্থাৎ তার সালাত শুদ্ধ হবে। কিবলা পরিবর্তনের ঘটনায় কুবাবাসীদের বাইতুল মাকদাস থেকে কিবলার দিকে ঘুরে যাওয়া হাদীসও এ দলের পক্ষের দলিল।[৩৭৫] সানআনী এ দলের পক্ষে মত প্রদান করেছেন।[৩৭৬]

প্রশ্ন ১৭১: কেউ যদি সালাত অবস্থায় জানতে পারে যে, সে কিবলা ছাড়া অন্যদিকে সালাত আদায় করছে, তাহলে এ ক্ষেত্রে তার করণীয় কী?

জবাব: কেউ যদি সালাত অবস্থায় থাকে আর জানতে পারে যে, সে কিবলা নির্ধারণে ভুল করেছে, তাহলে সে কিবলার দিকে ঘুরে যাবে; যদিও একাধিকবার হয়। এমনটাই আমাদের আলেমগণ বলেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ 'মুআত্তা'য় বলেন, কেউ যদি কিবলা নির্ধারণে ভুল করে এক বা দুই রাকাআত সালাত আদায় করে নেয় তারপর জানতে পারে যে, সে কিবলা ছাড়া অন্যদিকে সালাত আদায় করছে-তাহলে সে কিবলার দিকে ঘুরে গিয়ে বাকি সালাত আদায় করবে এবং আদায়কৃত রাকাআতও গণ্য করবে। আমরা এই মতই গ্রহণ করব এবং এটাই আবু হানীফারও মত।[৩৭৭]

৩৭৪. ইরওয়াউল গালীল, ১/৩২৩
৩৭৫. সহীহুল বুখারী, ৪০৩
৩৭৬. আসলু সিফাতিস সলাহ, ১/৭২
৩৭৭. মুআত্তা মুহাম্মাদ, ১/১০১; আসলু সিফাতিস সালাহ, ১/৭৮

প্রশ্ন ১৭২: কাতার সোজা করতে হবে আঙুলের অগ্রভাগ দ্বারা না কি পায়ের গিঁট দ্বারা?

জবাব: পায়ের গিঁঠ দ্বারা।

প্রশ্ন ১৭৩: সালাতে নিয়ত করার বিধান কী?

জবাব: মুসল্লী যে সালাত শুরু করতে যাচ্ছে তার জন্য নিয়ত করা এবং সে কোন সালাত আদায় করবে তাও অন্তরে নির্ধারণ করা অপরিহার্য, যেমন; যোহরের না কি আসরের ফরয অথবা যোহরের না কি আসরের সুন্নাত। এটি সালাতের শর্ত ও রুকন। মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করা বিদআত ও সুন্নাহ পরিপন্থি। যেসব ইমামদের তাকলীদ করা হয় সেসব ইমামদের কেউ এমনটি বলেননি।[৩৭৮]

প্রশ্ন ১৭৪: তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্যান্য তাকবীর কি ওয়াজিব?

জবাব: তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্যান্য তাকবীরকে সুন্নাহ মনে করা, সালাত ভুলকারীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে আদেশ দিয়েছিলেন সেই আদেশের পরিপন্থি। হাদীসটি আবু দাউদ ছাড়া অন্যান্য কিতাবে রিফাআহ ইবন রাফি থেকে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন সহীহ আবু দাউদ ৮০৩-৮০৫। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর 'তোমরা সেভাবে সালাত আদায় করো, যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখেছো' বাণীও তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্যান্য তাকবীর ওয়াজিব হওয়াকে শক্তিশালী করে।

ইমাম শাওকানী 'নাইলুল আওতার' ২/২২২-২২৩ ও 'আস-সাইলুল জাররার' গ্রন্থে বলেছেন, সালাত ভুলকারীর হাদীসে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে সেসব বিষয় ওয়াজিব। তিনি 'নাইলুল আওতার' গ্রন্থে এও উল্লেখ করেছেন, এ তাকবীরগুলো কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে। এরপরও 'আস-সাইলুল জাররার' ১/২২৭-২২৮ গ্রন্থে তিনি এসব তাকবীরকে সুন্নাত বলেছেন। পবিত্রতা ঘোষণা করছি এমন সত্তার, যিনি ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না।

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল তাকবীরগুলোকে ওয়াজিব বলেছেন, যেমনটি নববী 'আল-মাজমূ' ৩/৩৯৭ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইমাম নববী তার মতের পক্ষে পূর্বে উল্লিখিত সাধারণ বর্ণনা দলিল হিসেবে পেশ করেছেন আর সালাত ভুলকারীর হাদীস তার কাছে গোপন থেকে গিয়েছে। তাই তিনি তার মাযহাব (শাফিয়ী মাযহাব) এর পক্ষে দলিল দিতে গিয়ে বলেন, 'আহমাদ ইবন

---

৩৭৮. তালখীসু সিফাতিস সালাত, ২৮ নং মাসআলা

হাম্বালের বিপরীতে আমাদের মাযহাবের দলিল হচ্ছে, সালাত ভুলকারীর হাদীস। কারণ, নবী ﷺ তাকে তাকবীরে তাহরীমা বলার আদেশ দিলেও অন্যান্য তাকবীর বলার আদেশ দেননি!' ইমাম নববী, আবু দাউদ এবং অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হাদীস লক্ষ করননি।

প্রশ্ন ১৭৫: তাকবীরের সময় কখন হাত উত্তোলন করতে হবে?

জবাব: হাত উত্তোলন করবে তাকবীর বলার সাথে সাথে বা তার আগে বা তার পরে। তিনটি পদ্ধতিই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।[৩৭৯]

প্রশ্ন ১৭৬: হাত উত্তোলন করার সময় হাতের আঙুল কীভাবে রাখতে হবে?

জবাব: রাসূলুল্লাহ ﷺ আঙুলগুলোকে লম্বা করে দুই হাত উত্তোলন করতেন। আঙুলসমূহের মাঝে ফাঁকাও রাখতেন না আবার মিলিয়েও দিতেন না।[৩৮০]

প্রশ্ন ১৭৭: হাত উত্তোলনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে কি কোনো পার্থক্য আছে?

জবাব: নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয়, তিনি বলেন, 'হে ওয়াইল ইবন হুজর! তুমি সালাত পড়লে তোমার দুই হাত তোমার দুই কান বরাবর করবে আর মহিলারা তাদের বুক বরাবর করবে।'

হাদীসটি দুর্বল। আমি এমন কোনো হাদীসের কথা জানি না যেখানে নারী ও পুরুষের সালাতের মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে। এই পার্থক্য মূলত ব্যক্তিমতামত ও ইজতিহাদের আলোকে করা হয়েছে। সালাফদের থেকে এর বিপরীত মতও প্রমাণিত। দেখুন আমার 'সিফাতুস সালাহ' গ্রন্থের শেষের দিক। নারী-পুরুষের সালাতের মাঝে পার্থক্য নেই এ মত এভাবেও শক্তিশালী হয় যে, প্রমাণিত আছে, নবী ﷺ তাঁর দুই হাতকে কখনো কাঁধ বরাবর করতেন আবার কখনো দুই কান বরাবর করতেন। এ হাদীসগুলো আপনি 'সিফাতুস সালাহ' গ্রন্থে পাবেন। অতএব, হাদীসে বর্ণিত উক্ত পার্থক্য আপত্তিকর।[৩৮১]

প্রশ্ন ১৭৮: সালাতে কোন দিকে তাকাতে হবে?

জবাব: নবী ﷺ যখন সালাত আদায় করতেন তখন মাথা নিচু রাখতেন এবং জমিনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। যখন তিনি কাবায় প্রবেশ করেন তখন থেকে নিয়ে বের হওয়া পর্যন্ত

৩৭৯. তালখীসু সিফাতিস সালাহ, ৩৩ নং মাসআলা
৩৮০. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৩/৪১৮
৩৮১. আস-সিলসিলাতুয যঈফাহ, ১১/২/৮৬৭

তিনি সাজদার জায়গা থেকে তার দৃষ্টি সরাননি।

মুসল্লীকে কোন দিকে দৃষ্টি দিতে হবে তা নিয়ে আলেমদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মালিকের মতে মুসল্লীর দৃষ্টি থাকবে কিবলার দিকে। ইমাম বুখারী তার 'সহীহ বুখারী'-তে এভাবে অধ্যায় এনেছেন; 'সালাতে ইমামের দিকে দৃষ্টি রাখা।' এরপর তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। সেসব হাদীসে রয়েছে, সাহাবীগণ বিভিন্ন সময় সালাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে তাকাতেন।

ইমাম শাফিয়ী ও কূফীদের (হানাফী মাযহাবের সঠিক) মত হচ্ছে, 'মুসল্লীর সাজদার স্থানের দিকে তাকানো মুস্তাহাব। কারণ, খুশু-খুযুর জন্য এটি সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ।' এই মতটাই সঠিক। পূর্বের হাদীস এ মতের পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ বটে।

তবে ইবন হাজার আসকালানী বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলেন, এ ক্ষেত্রে আমরা ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে পার্থক্য করতে পারি। ইমামের জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে, তিনি তার সাজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি দেবেন। মুক্তাদীরাও সাজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি দেবে তবে ইমামকে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন হলে ইমামের দিকে তাকাবে। আর একাকী সালাত আদায় করলে তার বিধান ইমামের মতোই অর্থাৎ সাজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি দেবে।

এভাবে বললে সহীহুল বুখারীতে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং যেসব হাদীসে সাজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কথা এসেছে উভয়পক্ষের হাদীসগুলোর মাঝে সমন্বয় হয়ে যায়। এই সমন্বয় উত্তম। আল্লাহু আলাম।[৩৮২]

প্রশ্ন ১৭৯: সূরা ফাতিহার শুরুতে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তনির রাজীম' বলার কথা কি হাদীসে এসেছে?

জবাব: সুন্নাত হচ্ছে, কখনো এই বাক্যের মাধ্যমে আশ্রয় চাইবে:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

উচ্চারণ: আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রজীম মিন হামযিহি ওয়া নাফখিহি ওয়া নাফসিহি।

আবার কখনো এই বাক্যর মাধ্যমে চাইবে:

أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ

৩৮২. আসলু সিফাতিস সলাহ, ১/২৩০

উচ্চারণ: আউযুবিল্লাহিস সামিয়ীল আলীম মিনাশ শায়ত্বনির রজীম মিন হামযিহি ওয়া নাফখিহি ওয়া নাফসিহি।[৩৮৩]

স্রেফ 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তনির রাজীম' বলার ব্যাপারে আমি কোনো হাদীস পাইনি। তবে 'মারাসীলু আবী দাউদ' গ্রন্থে হাসান থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তনির রাজীম' বলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন।[৩৮৪]

এরপরও হাদীসটিতে স্পষ্টভাবে সালাতের কথা নেই যে, তিনি তা সালাতে বলতেন। তা ছাড়া হাদীসটি মুরসাল। আর অধিকাংশ মুহাদ্দিসের নিকট মুরসাল হাদীস দলিলযোগ্য নয়; বিশেষ করে তা যদি হয় হাসান বাসরীর মুরসাল।

এসব সত্ত্বেও অল্প কজন ব্যতীত শাফিয়ী মাযহাবের মত হচ্ছে, 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তনির রাজীম' বলা উত্তম। তারা তাদের মতে পক্ষে এ আয়াতটি দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে।[৩৮৫]

অজানা নয় যে, এই আয়াতটি সংক্ষিপ্ত। তাতে আশ্রয় চাওয়ার ধরন বর্ণনা করা হয়নি। অতএব, আমাদেরকে সুন্নাহর দিকে ফিরে যেতে হবে। আর আমরা জানতে পেরেছি যে, হাদীসে আরও বর্ধিত করা হয়েছে। অতএব, হাদীসের বর্ধিতাংশ অনুযায়ী আমল করা যুক্তিযুক্ত; বিশেষ করে যখন তাতে বর্ধিত অর্থও রয়েছে।

শাফিয়ী মাযহাবের কেউ এর পক্ষে মত দিয়েছেন। রাফিয়ী 'শারহুল ওয়াজিয' (৩/৩০৫) গ্রন্থে বলেন, কাযী রূয়ানী আমাদের মাযহাবের কারো কারো থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, 'আউযুবিল্লাহিস সামিয়ীল আলীম মিনাশ শায়ত্বনির রাজীম' বলা উত্তম।'

আরও উত্তম হচ্ছে, 'মিন হামযিহি ওয়া নাফখিহি ওয়া নাফসিহি' বাক্য যোগ করা।[৩৮৬]

প্রশ্ন ১৮০: প্রত্যেক রাকাআতে কি 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তনির রজীম' বলা যাবে?

জবাব: প্রত্যেক রাকাআতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো দলিল নেই।

৩৮৩. সুনানু আবী দাউদ, ৭৭৫
৩৮৪. মারাসীলু আবী দাউদ, ৩২
৩৮৫. সূরা নাহল, ১৬:৯৮
৩৮৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৪/৯-১০

এ নিয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। আমি মনে করি, মতবিরোধপূর্ণ দুটি মতের একটিকে নিয়ে গোঁড়ামি করা ঠিক নয়। যে মতের দিকে অন্তর ঝুঁকে এবং বক্ষ প্রসারিত হয় সে মতকে গ্রহণ করবে। তবে আমার কাছে মনে হয়, প্রতি রাকাআতে সূরা ফাতিহার শুরুতে আশ্রয় চাওয়া মতটি প্রাধান্যযোগ্য। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে।[৩৮৭]

তবে এ মতের পক্ষে স্পষ্ট কোনো হাদীস নেই। এ মত আয়াতের ব্যাপকতা থেকে উদঘাটিত ও গবেষণাকৃত।[৩৮৮]

প্রশ্ন ১৮১: সূরা ফাতিহার পর অন্যান্য সূরা পড়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ ও আউযুবিল্লাহ কি পড়া যাবে?

জবাব: সূরা ফাতিহা পড়ার পর অন্যান্য সূরা যদি শুরু থেকে পড়ে তবে বিসমিল্লাহ বলবে; কেননা বিসমিল্লাহ সূরার অন্তর্ভুক্ত। সূরা বারাআহ [তাওবাহ] পড়লে বিসমিল্লাহ বলবে না, যা জানা বিষয়। আর যদি সূরার মধ্যখান বা শেষ থেকে পড়ে, তবে বিসমিল্লাহ বলবে না। আর আউযুবিল্লাহ বলতে হয় কিরাআতের প্রথমে তথা সূরা ফাতিহার শুরুতে।[৩৮৯]

প্রশ্ন ১৮২: মুক্তাদীরাও কি ইমামের সঙ্গে 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে?

জবাব: একটি পরিত্যক্ত সুন্নাত হচ্ছে, অধিকাংশ মুসল্লী, সকল মুসল্লীরা বলছি না, ইমামের সঙ্গে 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে না। মুক্তাদীরা শুধু 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলে। এভাবে একদিকে একটি যিকির নষ্ট করা হয়েছে, আরেকদিকে এক যিকিরকে আরেক যিকিরের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা হয়েছে। এ সময় রুকু থেকে কিয়াম তথা দাঁড়ানো হয়। আর রুকু থেকে কিয়াম করার দুআ হচ্ছে 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ'। ইমাম হোক আর একাকী হোক এই দুআ কখন পড়বে? যখন রুকু থেকে উঠতে যাবে তখন পড়বে। আর রুকুকারী 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' কখন পড়বে? তখন পড়বে যখন সে দাঁড়িয়ে থাকবে। তো বর্তমানে ইমামের সাথে মুক্তাদীরা কী করে? ইমাম যখন 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে তখন তারা বলে

৩৮৭. সূরা নাহল, ১৬:৯৮
৩৮৮. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৪/২২
৩৮৯. অর্থাৎ সূরা ফাতিহায়। - অনুবাদক

'রাব্বানা লাকাল হামদ'। প্রথমত, ইমামের 'আল্লাহু আকবার' বলার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাদীরা যেমন 'আল্লাহু আকবার' বলে, তেমনভাবে তারা এখানে ইমামের সঙ্গে 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' না বলে একটি সুন্নাতকে নষ্ট করেছে। দ্বিতীয়ত, তারা একটি সুন্নাতকে তার স্বস্থানে না রেখে অন্যস্থানে রেখেছে।[৩৯০]

প্রশ্ন ১৮৩: রুকু করার পদ্ধতি কী?

জবাব: দুই হাত হাঁটুর ওপর স্থাপন করবে এবং ভালোভাবে ধরবে। আঙুলসমূহ ফাঁকা রাখবে। মনে হবে, যেন হাঁটুকে ধরে আছে। এগুলো ওয়াজিব। পিঠ এমনভাবে লম্বা ও প্রসারিত করবে যে, পিঠে পানি ঢেলে দিলেও গড়িয়ে পড়বে না বরং স্থির থাকবে। মাথা নিচুও করবে না, উঁচুও করবে বরং পিঠ বরাবর রাখবে। পার্শ্ব থেকে কনুই দূরে রাখবে। রুকুতে তিন বা তার বেশি বার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' বলবে।[৩৯১]

প্রশ্ন ১৮৪: ইমাম ডানদিকে সালাম ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে মুসল্লীরাও কি ডানদিকে সালাম ফেরাবে না কি ইমাম দুইদিকে সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদীরা ডানদিকে অতঃপর বামদিকে সালাম ফেরাবে?

জবাব: এটি একটি চমৎকার প্রশ্ন। মুক্তাদীরা ইমামের দ্বিতীয় সালামের অপেক্ষা করবে না। কারণ, প্রথম সালামের মাধ্যমে সালাত থেকে বের হয়ে যায় বা সালাত শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ দুই সালামের প্রথম সালাম রুকন আর দ্বিতীয় সালাম সুন্নাত। অতএব, ইমাম সালাম ফেরালে আপনিও সালাম ফেরাবেন আর ইমাম সালাম না ফেরালে আপনিও সালাম ফেরাবেন না। ইমামের এক সালাম আপনার জন্য যথেষ্ট। বর্তমানে মানুষেরা ইমামের দ্বিতীয় সালাম শোনার জন্য অপেক্ষা করে। দ্বিতীয় সালাম ফেরালে তারা প্রথম সালাম ফেরায় এরপর দ্বিতীয় সালাম ফেরায়। এমনটা করা এ মাসআলায় প্রাধান্যযোগ্য মত পরিপন্থি।[৩৯২]

প্রশ্ন ১৮৫: কেউ বসে সালাত আদায় করলে কীভাবে বসবে?

জবাব: বসে সালাত আদায় করার সময় চার জানু হয়ে অর্থাৎ এক পায়ের ওপর আরেক পা আড়াআড়ি রেখে বসবে অথবা যেভাবে বসলে আরাম হয় সেভাবে বসবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ চার জানু হয়ে বসতেন।[৩৯৩]

---

৩৯০. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৫/৩৬৫

৩৯১. তালখীসু সিফাতুস সলাহ, ৭৩-৭৭ নং মাসআলা।

৩৯২. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৫/৪৯৯

৩৯৩. সুনানুন নাসায়ী, ১৬৬৪, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

শাওকানী বলেন, এ হাদীস প্রমাণ করে, যে-ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করবে, তার জন্য এভাবে বসা মুস্তাহাব। এ মত দিয়েছেন, আবু হানীফা, মালিক ও আহমাদ। শাফিয়ীর দুই মতের এটি একটি মত। আরেক মত অনুযায়ী শাফিয়ী বলেছেন, দুই সাজদার মাঝে যেভাবে বসে সেভাবে বসবে। নিহায়া গ্রন্থকার হানাফী মাযহাবের কারো থেকে এ মত উল্লেখ করেছেন যে, তাওয়াররুক পদ্ধতিতে বসবে। তাওয়াররুক পদ্ধতি হচ্ছে, বাম দিকের নিতম্ব জমিনে রেখে দেবে, উভয় পা একদিকে বের করবে এবং বাম পা ডান উরুর নিচে রাখবে।

তিনি বলেন, এই মতভিন্নতা আসলে উত্তম-অনুত্তম নিয়ে। কারণ, সবাই একমত যে, সেই ব্যক্তি যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে বসতে পারবে।[৩১৪]

প্রশ্ন ১৮৬: ইমাম যদি সূরা ফাতিহা পাঠ না করেই রুকুতে চলে যায় এবং রুকুতে মনে পড়ে যে, সূরা ফাতিহা পাঠ করা হয়নি, তাহলে ইমাম কী করবে?

জবাব: রুকু করা বাদ দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, এরপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, এরপর সালাত অব্যাহত রাখবে। তবে যদি প্রথম বা দ্বিতীয় রাকাআতে এমন হয় তাহলে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর অন্য আরেকটি সূরা পড়বে বা সূরার কোনো অংশ পড়বে, এরপর রুকুতে যাবে, এরপর স্বাভাবিক নিয়মে সালাত পড়বে। মুক্তাদীরাও ইমামের অনুসরণ করবে।[৩১৫]

প্রশ্ন ১৮৭: সালাতরত ব্যক্তিকে কেউ সালাম দিলে সে কীভাবে সালামের জবাব দেবে?

জবাব: সুন্নাত হচ্ছে, মুসল্লী ইশারায় সালামের জবাব দেবে। উচ্চারণ করে সালামের জবাব দেওয়ার বিধান রহিত হয়ে গেছে। আবু সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতরত থাকলে এক ব্যক্তি তাকে সালাম দেন। নবী ﷺ ইশারায় তার জবাব দেন। সালাম ফেরানোর পর তিনি তাকে বলেন, আমরা আমাদের সালাতে সালামের জবাব দিতাম। পরে তা থেকে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে।[৩১৬]

এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়, ইসলামের সূচনায় মক্কায় বিধান ছিল, মুসল্লী উচ্চারণ করে সালামের জবাব দেবে। পরে মদীনায় তা রহিত করে দেওয়া হয় এবং ইশারায় জবাব দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়। মুসল্লীকে সালাম দেওয়া মুস্তাহাব। কারণ, ইবন মাসউদ ﷺ

৩১৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৩/১১৩-১১৪
৩১৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৫/২১১-২১২
৩১৬. আল-মুজামুল আওসাত, ৮৬৩১; সিলসিলাতুস সহীহাহ, ২৯১৭, আলবানী হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম দিলে তিনি তার সালাম দেওয়ার পক্ষে স্বীকৃতি দেন। ইবন মাসউদ ﷺ ছাড়াও সালাতরত অবস্থায় যারা তাকে সালাম দেন তিনি সবার স্বীকৃতি দেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত প্রসিদ্ধ অনেক হাদীস রয়েছে। সেসব হাদীস বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব, সুন্নাহর সমর্থকদের দায়িত্ব হচ্ছে, এই সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা এবং তা প্রচার ও বাস্তবায়নে কোমল ও নরমপন্থা অবলম্বন করা। কারণ, মানুষ যা জানে না তারা তার দুশমন; বিশেষ করে প্রবৃত্তিপূজারি ও বিদআতীরা।[৩৯৭]

প্রশ্ন ১৮৮: প্রয়োজনে সালাতে কি সামান্য ইশারা করা যাবে?

জবাব: সালাতে বোধগম্যপূর্ণ ইশারা করা জায়েয। নবী সাল্লাল্লাহু ﷺ সালাত পড়তেন। যখন তিনি সাজদায় যেতেন, হাসান-হুসাইন তাঁর পিঠের উপর লাফ দিয়ে উঠে যেত। সাহাবীরা উভয়কে বাধা দিতে চাইলে তিনি ইশারা করতেন, তোমরা উভয়কে ছেড়ে দাও। সালাত শেষ করার পর তিনি উভয়কে তার কোলে বসাতেন এবং বলতেন, যে আমাকে ভালোবাসে সে যেন এ দুজনকে ভালোবাসে।[৩৯৮]

প্রশ্ন ১৮৯: ফরয সালাত অবস্থায় কেউ গলা খাঁকারি দিলে বা ফুঁ দিলে বা সরবে কাঁদলে তার সালাত কি বাতিল হয়ে যাবে?

জবাব: গলা খাঁকারি দিলে সালাত বাতিল হবে না। কারণ, তা কথা বলা নয়। বিশেষ করে যদি প্রয়োজনে গলা খাঁকারি দেয়, তাহলে বাতিল হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

আমরা যদি বিশ্বাস করতাম, সহীহ অ-সহীহ যে-কোনো হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যায়, তবে আমরা আলী ﷺ'র জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গলা খাঁকারি দেওয়ার হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করতাম। কিন্তু এ হাদীসের সনদ দুর্বল। তাই এই হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করার কোনো প্রয়োজন নেই।[৩৯৯]

আমাদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, গলা খাঁকারি দেওয়া কথা বলা নয়। কথার ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে, সালাতে কথা বলা যায় না।[৪০০] আর যা সালাতে বলা যায় না, তা সালাতকে নষ্ট করে দেয়।

৩৯৭. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ২/১/৯৯৯
৩৯৮. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ১/২/৬২২
৩৯৯. সুনানু ইবনু মাজাহ, ৩৭০৮
৪০০. সহীহুল বুখারী, ১২০০; সহীহ মুসলিম, ৫৩৯

সালাত অবস্থায় ফুঁ দেওয়া গলা খাঁকারি দেওয়ার তুলনায় আরও সহজ ও হালকা। প্রমাণিত আছে, নবী ﷺ সাহাবীদের নিয়ে সূর্যগ্রহণের সালাত আদায় করলে সাজদায় তিনি ফুঁ দেন।[৪০১] তা ছাড়া ফুঁ দেওয়া কথা বলা নয়। অতএব, ফুঁ দেওয়ার কারণে সালাত বাতিল হবে না।

আর সরবে কাঁদলে সালাত বাতিল হবে না। তবে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কাঁদলে তা মাকরূহ। কিন্তু কেউ যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে কাঁদে তবে কোনো সমস্যা নেই। আপনারা জানেন, নবী ﷺ সালাতে কাঁদতেন। সেই সময় তার বুকে পানি ফোটানোর টগবগ আওয়াজের মতো আওয়াজ করত।[৪০২]

তাই আমরা বলতে পারি না, কাঁদা মাকরূহ। তবে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কাঁদলে ভিন্ন কথা। তখন তা হবে লৌকিকতা, সুখ্যাতি অর্জন আর নিজেকে জাহির করার অন্তর্ভুক্ত। অথচ নিজেকে জাহির করা পিঠকে ভেঙে দেয়।[৪০৩]

প্রশ্ন ১৯০: অসুস্থ ব্যক্তি যদি জমিনে সাজদা দিতে না পারে, তাহলে কি তার সামনে বালিশ বা উঁচু কিছু রাখা যাবে, যার ওপর সে সাজদা দেবে?

জবাব: কেউ বসে সালাত আদায় করলে, জমিনে উঁচু কিছু রেখে তাতে সাজদা করা জায়েয নয়। যদি সে জমিনে কপাল রাখতে সক্ষম না হয়, তবে সে শুধু রুকুর তুলনায় সাজদায় মাথা বেশি নিচু করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে এসে দেখেন, সে বালিশের ওপর সালাত আদায় করছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নিয়ে ফেলে দেন। আবার সে একটি কাঠ নেয় তাতে সালাত আদায় করার জন্য। তিনি সেটাও নিয়ে ফেলে দেন এবং বলেন, পারলে জমিনের ওপর সালাত আদায় করুন আর না পারলে ইশারায় আদায় করুন। তবে আপনার রুকু থেকে সাজদা নিচু করুন[৪০৪]।[৪০৫]

প্রশ্ন ১৯১: কিয়ামুল লাইলে এক রাকাআতেই কি কিছুক্ষণ বসে ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা যাবে?

জবাব: কিয়ামুল লাইল দাঁড়িয়ে আদায় করা যায় এবং ওজর ছাড়াই বসেও আদায় করা যায়।

---

৪০১. সহীহুল বুখারী, ১২১৩ নং হাদীসের পূর্বে বর্ণিত

৪০২. সুনানু আবী দাউদ, ৯০৪

৪০৩. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৩/৮৫

৪০৪. বুলুগুল মারাম, ৪৪৩, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৪০৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৩/১০৯

এমনকী একই রাকাআত দাঁড়িয়ে ও বসে আদায় করা যায়, যেমন; বসে সালাত শুরু করবে, এরপর রুকুর পূর্বে দাঁড়িয়ে গিয়ে অবশিষ্ট আয়াত তিলাওয়াত করবে, এরপর রুকু ও সাজদা করবে। এভাবে দ্বিতীয় রাকাআত আদায় করবে।[৪০৬]

প্রশ্ন ১৯২: এক হাদীসে বলা হয়েছে, তোমাদের কেউ যদি দেখে কাতার পূর্ণ হয়ে গেছে, তাহলে যেন কাতার থেকে একজন টেনে নিয়ে তার পাশে দাঁড় করায়। সামনের কাতার থেকে কাউকে টেনে নেওয়ার বিধান কী?

জবাব: সামনের কাতার থেকে টেনে নেওয়া সংক্রান্ত হাদীসটি দুর্বল। যখন হাদীসটি দুর্বল, সহীহ নয়, তখন কাউকে টেনে নিয়ে তার সঙ্গে কাতার হওয়া শরীআতসম্মত-বলা সঠিক নয়। কারণ, একথা বলা মানে সহীহ দলিল ছাড়াই শরীআত রচনা করা। তাই টেনে নেওয়া জায়েয নয়। বরং ওয়াজিব হচ্ছে, সে সম্ভব হলে কাতারে প্রবেশ করবে আর সম্ভব নাহলে পেছনে একাই কাতার হয়ে সালাত আদায় করবে। এভাবে সালাত আদায় করলে তার সালাত শুদ্ধ হবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা কোনো ব্যক্তিকে এমন দায়িত্ব দেন না যা তার সাধ্যের বাইরে।

কাতারের পেছনে একাই একজন ব্যক্তি সালাত আদায় করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পুনরায় সালাত আদায় করতে বলেন। এ আদেশ তখন প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ তখন সালাত দোহরাতে হবে যখন কেউ ওয়াজিব আদায়ে অবহেলা করবে; অর্থাৎ কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও সে যদি কাতারে না দাঁড়ায় এবং ফাঁকা পূর্ণ না করে। আর যদি কাতারে ফাঁকা জায়গা না পায় তবে সে অবহেলাকারী নয়। ফাঁকা না পেলেও তার সালাত বাতিল বলা যুক্তিযুক্ত নয়। এটাই শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহর মত। তিনি 'আল-ইখতিয়ারাত' পৃ. ৪৩ গ্রন্থে বলেন, 'ওযরবশত কাতারের পেছনে একাই সালাত আদায়কারীর সালাত শুদ্ধ হবে। এটা হানাফী মাযহাবের মত। শেষের কাতারে যদি দাঁড়ানোর জায়গা না পায় তবে উত্তম হচ্ছে, সে একাই দাঁড়াবে। তার সাথে কাতার হওয়ার জন্য কাউকে টানবে না। কারণ, এর মাধ্যমে টেনে আনা ব্যক্তির ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়। টানার কারণে সে যদি পেছনে চলে আসে তবে টানলেওয়ালা ও টানিত ব্যক্তির জন্য কোনটা ভালো; সামনের কাতার ফাঁকা রেখে দুজন মিলে একসঙ্গে কাতার করা না কি একাকী কাতার করা? এ ছাড়া দুজন ব্যক্তি যদি একসঙ্গে মসজিদে আসে আর শেষ কাতারে একজনের সমান জায়গা ফাঁকা থাকে তবে কোনটা ভালো; কাতার ফাঁকা রেখে দুজন একসঙ্গে দাঁড়ানো না কি একজন ফাঁকা জায়গা পূরণ করা আর অপরজনের একাকী দাঁড়ানো? প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে, ফাঁকা রেখে দুজন মিলে কাতার করা। কারণ, কাতারের ফাঁকা পূরণ করা মুস্তাহাব আর কাতার করা ওয়াজিব।' [ইবন তাইমিয়্যাহর বক্তব্য শেষ]

৪০৬. তালখীসু সিফাতি সলাতিন নবী, ১১ নং মাসআলা

কাতারের ফাঁক পূরণ করা কীভাবে মুস্তাহাব! অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ সহীহ হাদীসে বলেছেন,

مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

যে-ব্যক্তি কাতার পূরণ করে আল্লাহ যেন তার সঙ্গে সম্পর্ক করেন, আর যে কাতার কেটে দেয় আল্লাহ যেন তার সঙ্গে সম্পর্ক কেটে দেন।[৪০৭]

অতএব, হক হচ্ছে, সাধ্যানুযায়ী কাতারের ফাঁক পূরণ করা ওয়াজিব। আর পূরণ করা সম্ভব নাহলে একাকী দাঁড়াবে। আল্লাহু আলাম।[৪০৮]

প্রশ্ন ১৯৩: যদি ইমাম ও মুক্তাদী পাশাপাশি দাঁড়ায় তবে উভয়ে বরাবর দাঁড়াবে না কি ইমাম সামান্য সামনে দাঁড়াবে?

জবাব: ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শেষ রাতে গিয়ে, তাঁর পেছনে সালাত শুরু করি। তিনি আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে তাঁর বরাবর রাখেন। তিনি সালাতে মনোযোগী হলে আমি সরে যাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করে আমাকে বললেন, কী ব্যাপার? আমি তোমাকে আমার বরাবর করলাম আর তুমি সরে গেলে! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার বরাবর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা কি কারো জন্য শোভা পায়!? অথচ আপনি আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন।

এ কথা তাঁর খুব পছন্দ হলো। তিনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করলেন যে, আল্লাহ যেন আমার জ্ঞান ও বোধ বৃদ্ধি করে দেন।[৪০৯]

এই হাদীসে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারী মাসআলা রয়েছে, অনেক ফিকহী কিতাবে যা দেখা মেলে না; বরং অনেক ফিকহী কিতাবে তার বিপরীত মাসআলা উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তা হলো, একজন লোক যদি ইমামের অনুসরণ করে তবে সে ইমামের ডান দিকে ইমামের বরাবর দাঁড়াবে; আগেও দাঁড়াবে না, পেছনেও দাঁড়াবে না।

কোনো কোনো মাযহাবে এর বিপরীতে বলা হয়েছে, মুক্তাদী ইমাম থেকে সামান্য পেছনে থাকবে, মুক্তাদীর পায়ের আঙুলসমূহ ইমামের পায়ের গিঁঠ বরাবর থাকবে। এই মতটি উপর্যুক্ত সহীহ হাদীস পরিপন্থি।

---

৪০৭. সুনানুন নাসায়ী, ৮১৮

৪০৮. সিলসিলাতুয যঈফাহ, ২/৩২২-৩২৩

৪০৯. মুসনাদ আহমাদ, ৩০৬০

উপর্যুক্ত হাদীসের অনুকূলে কিছু সালাফের আমল রয়েছে। ইমাম মালিক তার 'মুআত্তা' ১/১৫৪ গ্রন্থে নাফি থেকে বর্ণনা করেন, নাফি বলেন, আমি কোনো এক সালাতে আবদুল্লাহ ইবন উমারের পেছনে দাঁড়াই। সেই সময় আমার সাথে কেউ ছিল না। তিনি তার হাত দ্বারা ঘুরিয়ে আমাকে তার বরাবর করেন। ইমাম মালিক ১/১৬৯-১৭০ উবাইদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উতবাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'হাজিরাহ নামক জায়গায় আমি উমার ইবন খাত্তাবের কাছে যাই। তাকে সালাত অবস্থায় পাই। আমি তার পেছনে দাঁড়ালে তিনি আমাকে কাছে নিয়ে যান, এমনকী ডান পাশে তার বরাবর করে দেন। এরপর ইয়ারফা আসলে আমি পেছনে সরে যাই এবং আমরা তার পেছনে কাতারবন্দি হই।' এর সনদও সহীহ।

এমনকী সহীহ হাদীসে রয়েছে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ইমামের বরাবর দাঁড়ান। তাঁর অন্তিম অসুস্থতার ঘটনায় রয়েছে, তিনি যখন সালাতের জন্য বের হন তখন আবু বাকর ইমামতি করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার বামদিকে তার বরাবর বসেন।[৪১০] ইমাম বুখারী এভাবে অধ্যায় রচনা করেন; 'যদি দুজন হয় তবে ইমামের বরাবর ডানে দাঁড়াবে।'[৪১১]

প্রশ্ন ১৯৪: কোনো মহিলা যদি মহিলাদের ইমামতি করে, তাহলে মহিলা ইমামও কি পুরুষের মতো মুক্তাদীদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসবে?

জবাব: মহিলাদের বিধান পুরুষের মতো। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যাপকভাবে বলেছেন, মহিলারা পুরুষদের মতোই।[৪১২]

অতএব, কোনো মহিলা যদি মহিলাদের ইমামতি করেন, তাহলে তিনিও চাইলে ডানে বা বামে ঘুরে বসবেন। ডানে কিংবা বামে উভয়টিই রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তার আমল হিসেবে প্রমাণিত।

প্রশ্নকারী: ডানদিকে না কি বামদিকে ঘুরে বসা উত্তম?

জবাব: নিজের উদ্দেশ্য অনুযায়ী। এ বিষয় নির্দিষ্ট কোনো কিছু নেই। উদাহরণস্বরূপ ধরুন, দরজা ডানদিকে আর তিনি সেই দরজা দিয়ে বের হতে চাচ্ছেন, তাহলে তিনি ডানদিকে ঘুরে বসবেন। অথবা দরজা বাম দিকে, এক্ষেত্রে তিনি কষ্ট না করে বামদিকে ঘুরবেন। বিষয়টি প্রশস্ত ও সহজ।[৪১৩]

---

৪১০. সহীহুল বুখারী, ৬৮৩

৪১১. সহীহুল বুখারী, ৬৯৭ নং হাদীসের শিরোনাম; সিলসিলাতুস সহীহাহ, ৬/১/১৭৪-১৭৫

৪১২. সুনানু আবী দাউদ, ২৩৬, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

৪১৩. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৫/৪৬৯

প্রশ্ন ১৯৫: স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে সালাত আদায় করলে তারা কীভাবে দাঁড়াবে?

জবাব: কাতারের দিক থেকে স্ত্রী একজন গাইর মাহরাম নারীর মতো। অতএব, স্ত্রীও পুরুষের পেছনে মানে স্বামীর পেছনে দাঁড়াবে। স্ত্রী একাকী হলেও স্বামী বলে তার পার্শ্বে দাঁড়ানো যাবে না। বরং একদম পেছনে দাঁড়াবে। আর গাইর মাহরামের পেছনে দাঁড়ানো তো আরও যুক্তিযুক্ত। তবে গাইর মাহরাম মহিলা হলে অবশ্যই নির্জনতা অবলম্বন করা যাবে না; যদিও তা সালাতে হয়।[৪১৪]

প্রশ্ন ১৯৬: এক ব্যক্তির মাগরিবের সালাত কাযা হয়ে গেছে। সে মসজিদে গিয়ে দেখল ইমাম ঈশার সালাত শুরু করে দিয়েছেন। অথবা কেউ মাগরিব ও ঈশার সালাত জমা তথা একত্রে পড়তে চাচ্ছে। সে মাগরিব সালাত পড়েনি। মসজিদে গিয়ে দেখল ইমাম ঈশার সালাত শুরু করে দিয়েছেন। ঐ ব্যক্তি কীভাবে মাগরিবের সালাত শেষ করবে; ইমামের সঙ্গে না কি আলাদাভাবে সালাম ফিরিয়ে দেবে?

জবাব: এমন হলে সেই ব্যক্তি ঈশার ফরয সালাত আদায়কারী ইমামের পেছনে সালাত শুরু করবে। তবে সে মাগরিবের ফরয সালাতের নিয়ত করবে। কারণ, মাগরিব সালাত উভয় সালাতের মাঝে আগের সালাত।

এরপর ইমাম চতুর্থ রাকাআতে উঠে গেলে সে ইমামের আর অনুসরণ করবে না বরং তৃতীয় রাকাআতের বসে যাবে এবং তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরিয়ে দেবে। সালাম ফেরানোর পর আবার দাঁড়িয়ে গিয়ে ইমামের অনুসরণ শুরু করবে; তবে এ ক্ষেত্রে সে এবার ঈশার সালাতের নিয়ত করবে। ইমামকে রুকুর পূর্বে পেয়ে যাক বা পরে পাক, সে সোজা ইমামের অনুসরণ করবে। মোটকথা, মাগরিব সালাত শেষ করার পর সে পুনরায় ইমামের পেছনে ঈশার সালাত আদায় করবে।[৪১৫]

প্রশ্ন ১৯৭: কেউ মসজিদে এসে দেখল ইমাম রুকুতে আছেন। সে এখন শুধু তাকবীরে তাহরীমা দেবে না কি তাকবীরে তাহরীমা এবং রুকুর তাকবীর দেবে?

জবাব: দুই তাকবীর দেবে, অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা এবং রুকুর তাকবীর দেবে।[৪১৬]

---

৪১৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৫/৪৭৭
৪১৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৫/৪৮৭
৪১৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৫/৫০০

সুন্নাত ও নফল সালাত

প্রশ্ন ১৯৮: সুন্নাত বাসায় পড়া উত্তম না কি মসজিদে পড়া উত্তম?

জবাব: বাসায় পড়া উত্তম। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

ফরয সালাত ব্যতীত ব্যক্তির সালাত নিজ বাসায় উত্তম।[৪১৭]

প্রশ্ন ১৯৯: দিনের বেলা এক সালামে কি চার রাকাআত সুন্নাত সালাত আদায় করা যাবে?

জবাব: হাদীসে এসেছে; নবী ﷺ ফজরের সালাত আদায় করে অবসর নিতেন। অবশেষে সূর্য আসরের সময় পশ্চিমাকাশে যত উপরে থাকে, পূর্বাকাশে ঠিক ততটা উপরে উঠলে দাঁড়াতেন এবং দুই রাকাআত সালাত আদায় করতেন। এরপর আবার অবসর নিতেন। অবশেষে সূর্য আসরের সময় পশ্চিমাকাশে যত উপরে থাকে, পূর্বাকাশে ঠিক ততটা উপরে উঠলে দাঁড়াতেন এবং চার রাকাআত সালাত আদায় করতেন। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লে যোহরের পূর্বে চার রাকাআত পড়তেন এবং পরে পড়তেন দুই রাকাআত। আসরের পূর্বে চার রাকাআত পড়তেন। প্রত্যেক দুই রাকাআতের মাঝে পৃথক করতেন নিকটবর্তী ফেরেশতা, নবী ও তাঁদের অনুসারী মুসলিমদের ওপর সালাম প্রদানের মাধ্যমে। সর্বশেষে সালাম ফেরাতেন।[৪১৮]

'সর্বশেষে সালাম ফেরাতেন' অংশ প্রমাণ করে, দিনের বেলা চার রাকাআত সুন্নাত এক সালামে আদায় করা সুন্নাহ; দুই রাকাআতের মাঝে সালাম ফেরাতে হবে না। 'প্রত্যেক দুই রাকাআতের মাঝে পৃথক করতেন নিকটবর্তী ফেরেশতা, নবী ও তাঁদের অনুসারী মুসলিমদের ওপর সালাম প্রদানের মাধ্যমে'-হাদীসের এ অংশের কারণে অনেকে মনে করেন, তিনি দুই রাকাআত পর সালাম ফেরাতেন। মোল্লা আলী 'শারহুশ শামাইল' গ্রন্থে তাদের খণ্ডন করে বলেন, 'এ কথা অজানা নয় যে, সালাম ফেরাতে যে সালাম দেওয়া হয়, তাতে শুধু মুসল্লীর সাথে উপস্থিত ফেরেশতা ও মুসল্লীদের ওপর সালাম দেওয়া হয়। এ হাদীসের অংশে ব্যাপকভাবে নিকটবর্তী ফেরেশতা, সমস্ত নবী ও কেয়ামত পর্যন্ত আগত তাদের অনুসারীদের সালাম দেওয়া হয়েছে।'

---

৪১৭. সহীহুল বুখারী, ৭২০৯; তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ২/২৬৩

৪১৮. সুনানু ইবন মাজাহ, ১১৬১, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। তবে 'সর্বশেষে সালাম ফেরাতেন' অংশটুকু সুনানু ইবন মাজাহতে নেই।

এ কারণে মুনাবী 'শারহুশ শামাইল' গ্রন্থে খুব জোরালোভাবে বলেছেন, হাদীসের এ অংশ দ্বারা তাশাহহুদ বোঝানো হয়েছে; সালাম নয়। তার ভাষ্য হচ্ছে, 'তাশাহহুদের আত্তাহিয়্যাতুতে আমরা যখন বলি, আস-সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন, তখন সকলকে সালাম দেওয়া হয়।'

আমি বলব, মুনাবীর কথাকে আরও শক্তিশালী করে বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত ইবন মাসউদ ﷺ'র হাদীস। তিনি বলেন, আমাদের অবস্থা এ ছিল যে, যখন আমরা নবী ﷺ এর সঙ্গে সালাতে থাকতাম, তখন আমরা বলতাম, বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর প্রতি সালাম, অমুকের প্রতি সালাম, অমুকের প্রতি সালাম। এ দেখে নবী ﷺ বলেন, 'আল্লাহর প্রতি সালাম' এ বাক্য তোমরা বলবে না। কারণ, তিনি নিজেই সালাম। বরং তোমরা বলবে, আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু....আস-সালামু আলাইনা ওয়া ইবাদিল্লাহিস সালিহীন।

তোমরা যখন তা বলবে তখন আসমান ও জমিনের আল্লাহর প্রত্যেক বান্দার নিকট তা পৌঁছে যাবে।[৪১৯]

আমি বলব, হাদীসের শেষের বর্ধিতাংশ[৪২০] দ্বারা দ্বিতীয় রাকাআতে সালাম না ফেরানো নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হচ্ছে। আমরা যে বললাম, দিনের চার রাকাআত সুন্নাতের প্রথম তাশাহহুদের সালাম ফেরাতে হবে না-এর পক্ষে এত স্পষ্ট দলিল থাকার পরও এ নিয়ে মতপার্থক্য করার কোনো সুযোগ নেই।

তবে এ হাদীসটি আরেকটি হাদীসের বাহ্যিক অর্থের সাথে বিরোধ হচ্ছে। হাদীসটি হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

রাত ও দিনের সালাত দুই দুই রাকাআত করে।[৪২১]

হাদীসটি সহীহ, যেমনটি আমি আলোচনা করেছি 'আল-হাঅজুল মাওরূদ ফী যাওয়াইদি মুনতাকা ইবন জারূদ' (নং ১২৩) গ্রন্থে।

উভয় হাদীসের সমন্বয় হচ্ছে, আলোচিত হাদীসটি অর্থাৎ এক সালামে চার রাকাআত পড়ার হাদীসটি এক সালামে চার রাকাআত পড়া বৈধ প্রমাণ করে; আর ইবন উমারের হাদীসটি প্রমাণ

৪১৯. সহীহুল বুখারী ৮৩৫; সহীহ মুসলিম, ৭৮৩
৪২০. অর্থাৎ 'সর্বশেষে সালাম ফেরাতেন' অংশটুকু।
৪২১. সুনানু আবী দাউদ, ১২৯৫

করে উত্তম অর্থাৎ দুই রাকাআত করে পড়া উত্তম, যেমনটি রাতের চার রাকাআতের ব্যাপার। আল্লাহু আলাম।[৪২২]

প্রশ্ন ২০০: ফরয সালাত শেষ করেই কি নফল সালাত শুরু করা যাবে?

জবাব: এক সাহাবী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত আদায় করলেন। (সালাত শেষ হতে না হতেই) এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত শুরু করল। উমার তাকে দেখে বললেন, 'বসুন। আহলে কিতাবরা ধ্বংস হয়ে গেছে, কারণ তাদের সালাতে কোনো ব্যবধান ছিল না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ইবন খাত্তাব উত্তম কাজ করেছে।[৪২৩]

উপর্যুক্ত হাদীস এ ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ যে, কথা বলা ছাড়া বা জায়গা পরিবর্তন করা ছাড়া ফরয সালাতের পরপরই সুন্নাত শুরু করা হারাম। এ কাজ অনেক অনারব লোক করে থাকে; বিশেষভাবে তুর্কীরা। হারামাইন শরীফাইন-এ তাদের দেখি যে, ইমাম ফরয সালাত থেকে সালাম ফেরাতে না ফেরাতে তারা এদিক সেদিক তাড়াহুড়ো করে সুন্নাতে দাঁড়িয়ে যায়।[৪২৪]

প্রশ্ন ২০১: দাঁড়ানোর আকৃতি পরিবর্তন ছাড়াই নফল সালাত কি দেওয়াল বা কোনোকিছুর ওপর ভর দিয়ে পড়া যাবে?

জবাব: অপারগ ব্যক্তির জন্য জায়েয আছে।

প্রশ্নকারী: ক্লান্ত ব্যক্তি কি পারবে?

জবাব: এটা তো ওজর। নফল সালাত যখন বসে পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাহলে ভর দিয়ে অনুমতি পাওয়া তো আরও যুক্তিযুক্ত।[৪২৫]

প্রশ্ন ২০২: ফরয সালাত দাঁড়িয়ে গেছে। আরেকজন সুন্নাত সালাতের দ্বিতীয় রাকাআতে তাশাহহুদে আছে বা রুকুতে আছে। এখন সেই ব্যক্তি সুন্নাত সালাত পূর্ণ করবে না কি সুন্নাত ছেড়ে দেবে?

জবাব: এর জবাব বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ। সংক্ষিপ্ত জবাব হচ্ছে, যদি তার প্রবল ধারণা

৪২২. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ১/১/৪৭৪-৪৭৭
৪২৩. মুসনাদ আহমাদ, ১৩১২১, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
৪২৪. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ৬/১/১০৫
৪২৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ২/২৮৪

হয় যে, সালাত শেষ করে ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমা পেয়ে যাবে তবে পূর্ণ করবে, আর নাহয় ছেড়ে দেবে।[৪২৬]

প্রশ্ন ২০৩: আসর সালাতের পর কি দুই রাকাআত সুন্নাত সালাত আদায় করা যাবে?

জবাব: বিস্মৃত সুন্নাত; যে সুন্নাত পুনর্জীবিত করা উচিত। ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুনতাশির তার পিতার ব্যাপারে বলেন, তিনি আসরের পর দুই রাকাআত সালাত আদায় করতেন। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি এই দুই রাকাআত পড়ি, কারণ, আমি মাসরূককে তা পড়তে দেখেছি। আর তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। আমি এ ব্যাপারে আয়েশাহ ﵂-কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের পূর্বে দুই রাকাআত আর আসরের পর দুই রাকাআত সালাত ছাড়তেন না।

আমি বলব, ফিকহের কিতাবসমূহের একটি প্রচলিত ভুল হচ্ছে, এই দুই রাকাআত সালাতকে নিষিদ্ধ সালাতের অন্তর্ভুক্ত করা এবং সুন্নাতে রাতিবার অন্তর্ভুক্ত না করা। অথচ নবী ﷺ ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাতের মতো আসরের পরের এই দুই রাকাআত সালাত স্থায়ীভাবে ও নিয়মিত পড়তেন। এই দুই রাকাআত মানসূখ-রহিত হয়ে যাওয়া বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য খাস হওয়ার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। কীভাবে তা তাঁর জন্য খাস হতে পারে! এ দুই রাকাআতের ব্যাপারে যিনি সর্বোচ্চ জ্ঞান রাখতেন তিনিও নিয়মিত তা আদায় করতেন। আর তিনি হলেন, উম্মুল মুমিনীন আয়েশাহ ﵂। আয়েশাহর সাথে আরও রয়েছেন একদল সাহাবী ও একদল সালাফ।

যেসব হাদীসে ব্যাপকভাবে আসরের পর সালাত আদায়ে নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে, সেসব হাদীসকে অন্যান্য স্পষ্ট হাদীস দ্বারা খাস করে দেওয়া হয়েছে যে, সূর্য হলুদ হওয়ার পূর্বে সালাত আদায় করা বৈধ। আসরের পর সালাত আদায় নিষেধ দ্বারা বোঝানো হয়েছে, সূর্য হলুদ হওয়ার পর নিষিদ্ধ। যেমন, আলী ﵁ কর্তৃক বর্ণিত মারফূ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ

'তোমরা আসরের পর সালাত আদায় করো না তবে তখন আদায় করো যখন সূর্য উঁচুতে থাকবে।'[৪২৭]

৪২৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ২/২৮৫
৪২৭. মুসনাদ আহমাদ, ১০৭৩

এ হাদীস সহীহ। হাদীসটি একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে। আসরের পর দুই রাকাআত শরীআতসিদ্ধ হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন আবু মুহাম্মাদ ইবন হাযম তার 'মুহাল্লা' গ্রন্থে। তিনি এই মতের বিরোধীদের বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে জবাব দিয়েছেন।[৪২৮]

প্রশ্ন ২০৪: মাগরিব ও ঈশা সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে কি কোনো নির্দিষ্ট রাকাআতবিশিষ্ট সালাতের কথা হাদীসে বলা হয়েছে?

জবাব: নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয়, তিনি বলেন, যে-ব্যক্তি মাগরিব ও ঈশার মাঝে বিশ রাকাআত সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করবেন।

হাদীসটি বানোয়াট। ভালোভাবে জেনে রাখুন, মাগরিব ও ঈশার মধ্যবর্তী সময়ে নির্দিষ্ট রাকাআত সালাত আদায়ে উৎসাহমূলক যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার কোনোটাই সহীহ নয়; কোনোটা কোনোটার তুলনায় বেশি দুর্বল। তবে হ্যাঁ, নির্দিষ্ট রাকাআত নির্ধারণ করা ছাড়াই তিনি এ সময়ে সালাত আদায় করতেন, তা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত। এ সংক্রান্ত যতগুলো তাঁর বাচনিক হাদীস বর্ণনা করা হয়, তার কোনোটাই আমলযোগ্য নয়।[৪২৯]

প্রশ্ন ২০৫: মাগরিবের সালাতের পর ছয় রাকাআতবিশিষ্ট সালাতুল আওয়াবীন কি প্রমাণিত?

জবাব: আবু হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> চাশতের সালাত কেবল আওয়াবরা হেফাযত করে। তিনি বলেন, আর এটা হলো সালাতুল আওয়াবীন।[৪৩০]

'আওয়াবীন' শব্দটি 'আওয়াব' এর বহুবচন। আর আওয়াব অর্থ তাওবার মাধ্যমে বেশি বেশি আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করা।

এই হাদীস তাদের খণ্ডন করে যারা মাগরিবের পর ছয় রাকাআতবিশিষ্ট সালাতকে সালাতুল আওয়াবীন বলে। এ নামকরণের কোনো ভিত্তি নেই এবং স্বয়ং এ সালাতই অপ্রমাণিত।[৪৩১]

---

৪২৮. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ৭/১/৫২৭-৫২৮

৪২৯. সিলসিলাতুয যঈফাহ, ১/৬৮০

৪৩০. আল-মুজামুল আওসাত, ৩৮৬৫; সিলসিলাতুস সহীহাহ, ১৯৯৪, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

৪৩১. আত-তা'লীক আলাত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩০৫

প্রশ্ন ২০৬: সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর কি সুন্নাত সালাত কাযা আদায় করা যাবে?

জবাব: যদি নিজের কারণে ছুটে না যায়, তবে কাযা আদায় করা জায়েয। আর কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সময় পার করে দেয়, তাহলে কাযা আদায় করা যাবে না। অর্থাৎ ওজরবশত হলে কাযা করতে পারবে। যেমন, কেউ মসজিদে প্রবেশ করে দেখল, সালাত দাঁড়িয়ে গেছে। অথচ সে ফরয সালাতের পূর্বের সুন্নাত আদায় করেনি। এমন হলে সে পরে উক্ত সুন্নাত পড়ে নেবে। কিন্তু কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করেছে এবং বলেছে, সুন্নাত পড়ব না। এই নিয়তে মসজিদে প্রবেশ করে ফরয আদায় করে নিয়েছে। এরপর মনে মনে ভাবলো, সুন্নাত সে পড়বে। তাহলে এমন ব্যক্তি পড়তে পারবে না।[৪৩২]

প্রশ্ন ২০৭: নিষিদ্ধ সময়ে কেউ যদি মসজিদে প্রবেশ করে তাহলে কি সে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করবে?

জবাব: বসার পূর্বে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেন দুই রাকাআত সালাত আদায় না করা পর্যন্ত না বসে।[৪৩৩]

জুমআর সালাত

প্রশ্ন ২০৮: জুমআর পূর্বে কি কোনো নির্দিষ্ট সুন্নাত আছে?

জবাব: জুমআর পূর্বে নির্দিষ্ট কোনো সুন্নাত নেই। জুমআর সুন্নাত নামে মানুষের মাঝে যা প্রসিদ্ধ আছে, হাদীসে তার কোনো ভিত্তি নেই।

আল্লাহর কিতাবের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ সহীহুল বুখারী থেকে সহীহ সনদে আমি আপনার কাছে একটি হাদীস তুলে ধরছি। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সাইব ইবন ইয়াযিদ। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে প্রথম আযান ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মেম্বারের উপর উঠলে মুআযযিন আযান দিতেন। মুআযযিন আযান শেষ করলে তিনি খুতবা শুরু করতেন।[৪৩৪] এখানে তো জুমআর পূর্বে সুন্নাত পড়ার কোনো সুযোগ ছিল না। এ হাদীসের বাকি অংশ সামনে আসছে ইনশাআল্লাহ।

---

৪৩২. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ২/৩১৯

৪৩৩. সহীহুল বুখারী, ১১৬৩; সহীহ মুসলিম, ১৫৪০; তুরাসুল আলবানী, ২/৩৩৩

৪৩৪. সহীহুল বুখারী, ৯১২-৯১৬

জুমআর দিনের সুন্নাত, যা মুসলিমদের পালন করতে হয়, তা হলো: সকাল সকাল মসজিদ যাওয়া। যে যত সকাল সকাল মসজিদে যাবে সে তত ভালো করবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে-ব্যক্তি প্রথম পর্যায়ে যাবে সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে-ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে যাবে সে যেন একটি গাভি কুরবানী করল। যে-ব্যক্তি তৃতীয় পর্যায়ে যাবে সে যেন একটি দুম্বা কুরবানী করল। যে-ব্যক্তি চতুর্থ পর্যায়ে যাবে সে যেন একটি মুরগি কুরবানী করল। যে-ব্যক্তি পঞ্চম পর্যায়ে যাবে সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল। এরপর খাতা গুটিয়ে নেওয়া হয়।[৪৩৫]

অতএব, যত সকাল সকাল মসজিদে যাবে তত ভালো। সকাল সকাল মসজিদে যাক বা দেরিতে যাক, হিসাব ছাড়াই দুই রাকাআত, চার রাকাআত, ছয় রাকাআত, আট রাকাআত বা যত সম্ভব হবে সালাত আদায় করবে। কারণ, তা নফল সালাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো নির্দিষ্ট রাকাআত সংখ্যার কথা বলেননি। বরং তিনি সহীহ হাদীসে বলেছেন, জুমআর দিন যে-ব্যক্তি (মোথা) ধুবে ও যথাযথ নিয়মে গোসল করবে, কোনো কিছুতে আরোহণ না করে আগে আগে মসজিদে যাবে, এরপর যত পারবে সালাত আদায় করবে, অতঃপর ইমামের কাছাকাছি বসে মনোযোগ দিয়ে (খুতবা) শুনবে, তাহলে তার সেই জুমআ থেকে পরের জুমআর মাঝের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।[৪৩৬]

এখানে বলা হয়েছে যত পারবে অর্থাৎ তার প্রাণবন্ততায় বা সময়ে যত পারবে। বর্তমানে জুমআর পূর্বে যে সুন্নাত পড়া হয় হাদীসে তার কোনো ভিত্তিই নেই। কারণ, আমরা বুখারীর হাদীসের উদ্ধৃতিতে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর যুগে নিজ ঘর থেকে বের হয়ে মেম্বারে উঠলে বেলাল আযান শুরু করতেন। আযান শেষ হলে তিনি খুতবা দিতে শুরু করতেন। এ সময় চার রাকাআত দূরের কথা দুই রাকাআত পড়ারও কোনো সুযোগ ছিল না। অতএব, নিয়ম হচ্ছে, জুমআর দিন যে-ব্যক্তি মসজিদে আসবে, সে নিজ ইচ্ছেমতো সালাত পড়বে। এরপর ইমাম মেম্বারে উঠলে চুপ থাকবে। ব্যস এতটুকুই।[৪৩৭]

প্রশ্ন ২০৯: জুমআর সালাতের পরের সুন্নাত কত রাকাআত? আর জুমআর পরের সুন্নাত মসজিদে পড়তে হবে না কি বাসায় পড়তে হবে?

জবাব: জুমআর সালাতের পর মুসল্লী ইচ্ছা করলে দুই রাকাআত পড়বে আবার ইচ্ছা করলে

৪৩৫. সহীহুল বুখারী, ৮৮১
৪৩৬. সুনানু আবী দাউদ, ৩৪৫; সুনানু ইবন মাজাহ, ১০৮৭, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
৪৩৭. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৬/২৮

চার রাকাআত পড়বে। তবে নিঃসন্দেহে চার রাকাআত উত্তম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

যে-ব্যক্তি জুমআর পর সালাত পড়বে সে যেন চার রাকাআত পড়ে।[৪৩৮]

এ হাদীসে রাকাআতের সংখ্যা বলা হয়েছে। আর চার রাকাআত উত্তম দুই রাকাআতের তুলনায়। উপর্যুক্ত হাদীসে চার রাকাআত পড়া শরীআতসম্মত তা প্রমাণ হয়। আবার দুই রাকাআত ইবন উমারের হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয়। হাদীসটি ইমাম বুখারী তার 'সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হলো:

وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

তিনি জুমআর পর ঘরে না যাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন না। (ঘরে গিয়ে) তিনি দুই রাকাআত সালাত আদায় করতেন।[৪৩৯]

নবী ﷺ যে দুই রাকাআত পড়তেন তা ছিল সুন্নাতে মুআক্কাদা। আর চার রাকাআতের শেষের অতিরিক্ত দুই রাকাআত মুস্তাহাব। অতএব, প্রথম দুই রাকাআত সুন্নাত আর শেষ দুই রাকাআত মুস্তাহাব।

রাকাআত সংখ্যার কথা উল্লেখ করলাম। এবার স্থান নিয়ে কথা হলো, নফল সালাতের ক্ষেত্রে সাধারণ মূলনীতি হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুপ্রসিদ্ধ কথা:

فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

ফরয সালাত ছাড়া লোকেরা ঘরে যে সালাত আদায় করে তা-ই উত্তম।[৪৪০]

আগের সুন্নাতে রাতিবা হোক আর পরের সুন্নাতে রাতিবা হোক, সকল সুন্নাতে রাতিবা বাসায় পড়া উত্তম। তবে এ বিষয়টি ওয়াজিব নয়; বরং তা উত্তম। আর উত্তম পালন করা সম্ভব হলে উত্তমকে আঁকড়ে ধরতে হবে। তবে কেউ যদি মসজিদে পড়ে, তা জায়েয। অতএব, মসজিদে পড়ুক আর ঘরে পড়ুক, জুমআর পর চার ও দুই রাকাআত উভয়টিই জায়েয।

পরবর্তী যুগের কেউ কেউ বলেছেন, চার রাকাআত পড়লে মসজিদে পড়বে আর দুই রাকাআত

৪৩৮. সুনানু আবী দাঊদ, ১১৩৩
৪৩৯. সহীহুল বুখারী, ৯৩৭
৪৪০. সহীহুল বুখারী, ৭৩১

পড়লে ঘরে পড়বে, এমন কথার পক্ষে ইবন উমার ﷺ'র হাদীস ছাড়া আর কোনো ভিত্তি নেই। হাদীসটি হচ্ছে, নবী ﷺ জুমআর পর ঘরে সালাত পড়লে দুই রাকাআত পড়তেন। আমরা আগেই উল্লেখ করলাম, এর অর্থ এই নয় যে, ঐ দুই রাকাআত কেউ মসজিদে আদায় করলে, সে জুমআর পরের সুন্নাত আদায় করেনি।

হ্যাঁ, আমাদের সালাত ঘরে উত্তম। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

যে-ব্যক্তি জুমআর পর সালাত পড়বে সে যেন চার রাকাআত পড়ে।[৪৪১]

এই হাদীসের অর্থ এই নয় যে, সে যেন এই চার রাকাআত সরাসরি ঘরে পড়ে। কেউ মসজিদে পড়লে তার জন্য দুই রাকাআত পড়া জায়েয। আবার কেউ ঘরে গিয়ে চার রাকাআত পড়লে তার এই চার রাকাআত দুই রাকাআত থেকে উত্তম।

মোটকথা, দুই রাকাআত ও চার রাকাআত উভয়টি মসজিদে জায়েয। তবে দুই বা চার যেটাই হোক ঘরে পড়া উত্তম। তবে ঘরে পড়লে দুই রাকাআত আর মসজিদে পড়লে চার রাকাআত, এমন পার্থক্যের পক্ষে কোনো দলিল নেই।[৪৪২]

প্রশ্ন ২১০: হাদীসে জুমআর আযানের কি কোনো হুকুম-আহকাম বর্ণিত হয়েছে?

জবাব: হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং সালাফ কর্তৃক আমলকৃত কিছু হুকুম হচ্ছে:

ক. ইমামের মেম্বারে ওঠার সময় এক আযান যথেষ্ট।

খ. আযান দিতে হবে মসজিদের বাইরে কোনো উঁচু স্থানে।

গ. প্রয়োজন হলে উসমানী আযান মসজিদের বাইরে সে স্থানে দিতে হবে যে স্থানে দিলে বেশি উপকার রয়েছে এবং বেশি মানুষ শুনতে পাবে।

ঘ. যে-কোনো অবস্থায় মসজিদে আযান দেওয়া বিদআত। পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্ব ও পর উভয় সময় জুমআর ওয়াক্ত।

ঙ. কেউ আযানের পূর্বে মসজিদ পৌঁছালে ইচ্ছামতো যত রাকাআত মন চায় নফল সালাত আদায় করবে।

৪৪১. সুনানু আবী দাউদ, ১১৩৩

৪৪২. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৬/৩৮-৩৯

চ. বিদআতী আযান[৪৪৩] ও সুন্নাতী আযানের মধ্যখানে প্রচলিত কাবলাল জুমআ সুন্নাতের কথা হাদীসে নেই; হাদীসে এ সুন্নাতের কোনো ভিত্তি নেই। কোনো সাহাবী ও ইমাম এই সুন্নাত সালাতের কথা বলেননি।[৪৪৪]

প্রশ্ন ২১১: শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারীরা বলেন, যে-ব্যক্তি জুমআর সালাত আদায় করবে সে সতর্কতাবশত যোহরের সালাতও আদায় করবে। এমন কথা বলার কারণ কী? তাদের কি কোনো দলিল আছে?

জবাব: এটি মূলত শাফিয়ী মাযহাবের আলেমদের ব্যক্তিমতামতভিত্তিক মাসআলা। কিতাব ও সুন্নাহয় এর পক্ষে কোনো দলিল নেই। জুমআর সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য তারা কিছু শর্তারোপ করেছেন, সে কারণে সতর্কতাবশত তারা যোহরের সালাতের কথা বলেন।

তারা মনে করেন, সেসব শর্ত পূরণ হওয়া সম্ভব নয়, তাই তারা জুমআর সালাত আদায়কারী মুসল্লীদের আবার যোহরের সালাত আদায় করার আদেশ দেন। এটা একটা ব্যক্তিমত। আর ব্যক্তিমতের পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে যদি দলিল না থাকে, তবে তা শরীআত হতে পারে না। আর কীভাবেই বা হতে পারে! এই মত তো দুটি বিষয় পরিপন্থি। প্রথমটি হলো: আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

হে ঈমানদারগণ! জুমআর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন আল্লাহর স্মরণের দিকে শীঘ্র ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করো। এটাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে। অতঃপর যখন সালাত শেষ হয়ে যাবে তখন জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে।[৪৪৫]

আল্লাহ তাআলা আয়াতে বলেছেন, সালাত শেষ হলে জমিনে ছড়িয়ে পড়ো। এখানে অতি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, জুমআর ফরয সালাত শেষ হয়ে গেলে মুসল্লীদের ওপর আর কোনো ইবাদত ওয়াজিব নয়। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

৪৪৩. বিদআতী আযান দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন ইমামের সামনে আযান দেওয়াকে

৪৪৪. আল-আজবিবাতুন নাফিআহ, পৃ. ৪০

৪৪৫. সূরা জুমআহ, ৬২:৯-১০

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

যখন সালাত শেষ হবে তখন জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, যারা এ মত প্রদান করেছেন তাদের সালাত নিয়ে চিন্তা করলে পাওয়া যায় যে, তারা যখন জুমআর সালাতের নিয়তে কিবলামুখী হন তখন তারা তাদের সালাতের শুদ্ধতার ব্যাপারে হয় নিশ্চিত থাকেন আর নাহয় সন্দিহান থাকেন। আর যদি সালাত বাতিল হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকেন তবে তা আরও গুরুতর ব্যাপার। আর যদি তারা নিশ্চিত থাকেন যে, তাদের সালাত শুদ্ধ হচ্ছে অর্থাৎ সালাত শুদ্ধ হচ্ছে এটি নিশ্চিত হয়ে নিয়ত করেন- নিয়ত অন্তরের ব্যাপার যেমনটি আপনারা হয়তো জানেন; এবং সেভাবে সালাত আদায় করেন যেভাবে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন, তাহলে তাদের সালাত শুদ্ধ হবে। অপরপক্ষে যদি সালাতের শুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দিহান থাকেন তাহলে তাদের সালাত হবে না। আর যদি সালাত বাতিল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হন তাহলে তো আরও সালাত হবে না। কোনো মুসল্লী যদি তার সালাতের শুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দিহান হয় তবে সবার ঐকমত্যে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

অতএব, এসব শাফিয়ীদের বলতে হবে, যখন আপনারা সালাত শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তাকবীর দিয়ে সালাত শুরু করেন তখন পুনরায় যোহর পড়ার কোনো অর্থই থাকে না। আর যদি সালাতের শুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দিহান থাকেন তবে জুমআ পড়ার কোনো অর্থ থাকে না; বরং যোহর পড়া আপনাদের ওপর ওয়াজিব। তারা যেদিকে যাক ও যেদিকে মুখ করুক তাদের সবদিক শরীআত পরিপন্থি। আপনারা একটা আয়াত জানলেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

যখন সালাত শেষ হবে তখন জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো।

এখন তারা কেন পুনরায় যোহরের সালাত আদায় করে তার কারণ মাত্রই উল্লেখ করলাম। যা কি না স্রেফ ব্যক্তিমতামত। এ ব্যক্তিমতামতের পক্ষে শরীআতের কোনো দলিল নেই।[৪৪৬]

প্রশ্ন ২১২: জুমআর দিন যদি একদল লোক পাওয়া না যায় এবং খুতবা দেওয়ার মতো কেউ না থাকে, তাহলে কি তারা যোহরের সালাত আদায় করে নেবে?

জবাব: জুমআর দিনের মূলই হচ্ছে জুমআর সালাত। একদল লোক যদি পাওয়া না যায় এবং খুতবা দেওয়ার মতো কেউ না থাকে, তাহলে তারা যোহরের সালাত আদায় করে নেবে।[৪৪৭]

৪৪৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৬/৯০-৯১
৪৪৭. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৬/৯৯

প্রশ্ন ২১৩: অনেক খতীব দ্বিতীয় খুতবাকে কেবল দুআর জন্য খাস করে নেন। তারা তাতে দুআ ছাড়া কিছুই করেন না। এক্ষেত্রে আপনার বক্তব্য কী?

জবাব: প্রথম খুতবা ও দ্বিতীয় খুতবার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। উভয় খুতবা উপদেশের জন্য। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

যখন জুমআর দিন সালাতের জন্য ডাকা হবে তখন আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হও।[৪৪৮]

অতএব, উভয় খুতবা উপদেশ ও তালীমের জন্য। প্রথম খুতবা ছাড়া দ্বিতীয় খুতবাকে দুআ ও দরুদের জন্য খাস করে দেওয়া নিঃসন্দেহে বিদআত।[৪৪৯] বিশেষ করে সেসব দুআ শাসক ও নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট করে নেওয়া আরও কঠিন বিদআত।[৪৫০]

প্রশ্ন ২১৪: খতীব মসজিদে প্রবেশ করলে তিনি কি তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বেন?

জবাব: খতীবের ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ নিয়ম হচ্ছে, তিনি মসজিদে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মেম্বারে উঠবেন। খতীব এমনটা করলে তাকে আর তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়তে হবে না। আর যদি তিনি মসজিদে প্রবেশ করে মেম্বারে না উঠেন বরং মসজিদে বসতে চান তবে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়তে হবে।[৪৫১]

প্রশ্ন ২১৫: কেউ যদি জুমআর দিন মসজিদ গিয়ে ইমামকে তাশাহহুদ অবস্থায় পায়, তবে সে কত রাকাআত পড়বে; চার রাকাআত না কি দুই রাকাআত?

জবাব: চার রাকাআত পড়বে।[৪৫২]

প্রশ্ন ২১৬: হাদীসে বলা হয়েছে, জুমআর দিন এমন একটা সময় রয়েছে যখন দুআ কবুল করা হয়। সেই সময়টা কখন?

---

৪৪৮. সূরা জুমআহ, ৬২:৯
৪৪৯. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৬/১২৯
৪৫০. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৬/১৩৬
৪৫১. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৬/১৪৭
৪৫২. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৬/১৭৪ অর্থাৎ কেউ যদি ইমামের সাথে এক রাকাআত পায়, তাহলে সে জুমআ পেয়েছে বলে গণ্য হবে এবং ইমাম সালাম ফেরালে দাঁড়িয়ে আরেক রাকাআত একা পড়ে নেবে। কিন্তু কেউ যদি এক রাকাআত না পায়, বরং দ্বিতীয় রাকাআতের রুকুর পর ইমামকে পায়, তাহলে তাকে যোহরের চার রাকাআত পড়তে হবে।—সংকলক

জবাব: মুনযিরী বলেন, কোনো কোনো সাহাবীসহ একদল আলেমের মত হচ্ছে, যে সময় দুআ কবুল করার আশা করা যায় সেই সময়টা হচ্ছে আসরের পর থেকে নিয়ে মাগরিব পর্যন্ত। এ মত দিয়েছেন আহমাদ ও ইসহাক। আহমাদ ইবন হাম্বাল বলেন, 'অধিকাংশ হাদীসে বলা হয়েছে, যে সময়ে দুআ কবুল করার আশা করা যায় সেই সময়টা হচ্ছে আসরের পর।'

আমি বলব, এ ব্যাপারে আরও অনেক মত রয়েছে। হাফিয ইবন হাজার আসকালানী সেসব মত 'ফাতহুল বারী' (২/২৪৫-২৫১) গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। সেখানে এ ব্যাপারে ৪৩টি মত উল্লেখ করা হয়েছে। মুনযিরীসহ প্রমুখগণ আহমাদ ও ইসহাক থেকে যে মত উল্লেখ করেছেন, আসকালানীও সেই মত সমর্থন করেছেন। এ মতের স্বপক্ষে আহমাদ ও ইসহাকের পক্ষে আরও অনেকে মত দিয়েছেন। আমার কাছেও এ মত সঠিক। কারণ, এ সংক্রান্ত অধিকাংশ হাদীস থেকে একথা প্রমাণ হয়। এর বিপরীতে যেসব হাদীস রয়েছে কোনোটাই সহীহ নয়।[৪৫৩]

প্রশ্ন ২১৭: খুতবার পূর্বে বয়ান করার বিধান কী?

জবাব: জুমআর দিন যেকোনো ধরনের হালাকা ও বয়ান করতে নিষেধ করা হয়েছে। এরপরও কেন একই প্রশ্ন সবসময় করা হয় জানি না। যারা সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে থাকবে তাদের মাঝে নিত্যনতুন সংশয়-সন্দেহ কোনো প্রভাব ফেলবে না। আপনারা জানেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সরাসরি সাহাবীদেরকে এবং তাদের অধীনে পরবর্তী লোকদের জুমআর দিন সকাল সকাল মসজিদে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আপনারা বুখারীর হাদীসও জানেন, 'যে-ব্যক্তি প্রথম পর্যায়ে মসজিদ যায় সে যেন একটি উট কুরবানী করে।'...[৪৫৪]

এরপর অন্য হাদীসে আছে, 'জুমআর দিন যে-ব্যক্তি (মাথা) ধুবে ও যথাযথ নিয়মে গোসল করবে, কোনো কিছুতে আরোহণ না করে আগে আগে মসজিদে যাবে, এরপর যত পারবে সালাত আদায় করবে। অতঃপর ইমামের কাছাকাছি বসে মনোযোগ দিয়ে (খুতবা) শুনবে। তাহলে তার সেই জুমআ থেকে পরের জুমআর মাঝের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।'[৪৫৫]

এই যে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব বিষয়ে এত জোরালো উৎসাহিত করেছেন এসব বিষয় কীভাবে পালন করা সম্ভব, যদি খুতবার পূর্বে বয়ান করার বৈধতা দেওয়া হয়? এটা কীভাবে সম্ভব যে, খুতবার পূর্বে বয়ান করা হবে এরপর মেম্বারে উঠবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘ জীবনে এমনটা কখনো করেছেন বলে কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় না।

---

৪৫৩. আত-তালীক আলাত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩২১

৪৫৪. সহীহুল বুখারী, ৮৮১

৪৫৫. সুনানু আবী দাউদ, ৩৪৫; সুনানু ইবন মাজাহ, ১০৮৭, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

জুমআর দিন হালাকা করার নিষেধাজ্ঞা হাদীসে না আসলেও আমাদের জন্য প্রথমত এটাই যথেষ্ট যে, এ কাজ কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ করেননি। দ্বিতীয়ত, বয়ান করার বৈধতা দেওয়া হলে জুমআর দিন সকাল সকাল মসজিদে আগত মুসল্লীদের যিকির-আযকার ও ইচ্ছামতো সালাত আদায় করার যে নিয়ম দেওয়া হয়েছে সেই নিয়ম নষ্ট হয়ে যাবে। এসব যিকির-আযকারকারী ও সালাত আদায়কারীদের ব্যাঘাত ঘটিয়ে কীভাবে খুতবার পূর্বে বয়ান করা সম্ভব হতে পারে? এ ছাড়া একদিন নবী ﷺ মসজিদে জোরে আওয়াজ শুনতে পান অথচ সেদিন জুমআর দিন ছিল না। তিনি পর্দা সরিয়ে বলেন, হে মানুষ সকল, তোমাদের প্রত্যেকে তার রবের সাথে চুপি চুপি কথা বলছে। অতএব, তোমরা পরস্পরের তুলনায় সরবে কিরাআত করে মুমিনদের কষ্টে ফেলে দিয়ো না।[৪৫৬]

খুতবার পূর্বে বয়ান করার তুলনায় এমন কী জিনিস আছে যা জুমআর দিন উপস্থিত লোকদের ব্যাঘাত ঘটিয়ে অধিকাংশ মুসল্লীদের সবচেয়ে বেশি কষ্টে ফেলে দেয়?[৪৫৭]

দুই ঈদের সালাত

প্রশ্ন ২১৮: ঈদের সালাত কি ওয়াজিব?

জবাব: 'ফিকহুস সুন্নাহ' গ্রন্থকার সাইয়্যিদ সাবেক বলেন, ঈদের সালাত সুন্নাতে মুআক্কাদা। নবী ﷺ নিরবচ্ছিন্নভাবে তা আদায় করেন। তিনি নারী-পুরুষদেরকে ঈদের সালাতের জন্য বের হওয়ার আদেশ দেন।

ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকারের উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলব, উল্লিখিত আদেশ প্রমাণ করে ঈদের সালাত ওয়াজিব। কারণ, বের হওয়া ওয়াজিব হলে সালাত ওয়াজিব হওয়া আরও যুক্তিযুক্ত; যা অজানা নয়। অতএব, হক হচ্ছে, ঈদের সালাত ওয়াজিব; সুন্নাত নয়। ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে এটাই দলিল হিসেবে যথেষ্ট যে, একদিনে ঈদ ও জুমআ হলে ঈদের সালাত জুমআর সালাতকে বিলোপ করে দেয়। আর যা ওয়াজিব নয় তা ওয়াজিবকে বিলোপ করতে পারে না, যেমনটি সিদ্দীক হাসান খান আর-'রওযাদুন নাদিয়্যাহ' গ্রন্থে বলেছেন।[৪৫৮]

---

৪৫৬. মুসনাদ আহমাদ, ৫৩৪৯; সহীহুল জামি, ১৯৫১, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
৪৫৭. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৬/১৯৭-১৯৮
৪৫৮. তামামুল মিন্নাহ, ৩৪৪

প্রশ্ন ২১৯: ঈদের সালাত আদায়ের জন্য ঈদগাহে মহিলাদের যাওয়া কি ওয়াজিব?

জবাব: হ্যাঁ, ঈদগাহে মহিলাদের বের হওয়া ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

وَجَبَ الْخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ

(দুই ঈদে) প্রত্যেক যুবতি নারীকে বের হওয়া ওয়াজিব।[৪৫৯]

প্রশ্ন ২২০: ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরগুলোতে হাত তোলার বিধান কী?

জবাব: 'ফিকহুস সুন্নাহ' গ্রন্থকার সাইয়্যিদ সাবেক ঈদের তাকবীরগুলোতে হাত উত্তোলন করা সুন্নাত বললে তার জবাবে আমি [আলবানী] বলব, সঠিক কথা হচ্ছে, হাত উত্তোলন করা সুন্নাত নয়। কারণ, তা নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়। উমার ও আবদুল্লাহ ইবন উমার থেকে হাত উত্তোলনের কথা বর্ণিত হলেও তাকে সুন্নাত গণ্য করা যায় না। স্বয়ং লেখক সাইয়্যিদ সাবিক জানাযার তাকবীরের ক্ষেত্রে আমাদের মতোই কথা বলেছেন। আমাদের মতোই তিনি দলিল পেশ করেছেন। অথচ আবদুল্লাহ ইবন উমার ﷺ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, তিনি জানাযার হাত উত্তোলন করতেন। ঈদের সালাতে হাত উত্তোলনের কারণে তা যদি সুন্নাত হয় তবে জানাযার ক্ষেত্রেও হাত উত্তোলন করাকে সুন্নাত বলুন; অন্যথা বলুন, ঈদ ও জানাযায় কোনোটাতেই হাত উত্তোলন করা শরীআতসম্মত নয়। শরীআতসম্মত নয়, এটাই হক ও সঠিক; বিশেষ করে যখন এ ব্যাপারে উমার ও আবদুল্লাহ ইবন উমারের বর্ণনা সহীহ নয়।

উমারের হাদীস বাইহাকী দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। আর আবদুল্লাহ ইবন উমারের হাদীস এখনো পাইনি। ইমাম মালিক বলেছেন, আমি এ ব্যাপারে কোনো কিছুই শুনিনি।[৪৬০] [৪৬১]

প্রশ্ন ২২১: ইমাম বুখারী আতা থেকে মুআল্লাক সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, তার ঈদের সালাত ছুটে গেলে দুই রাকাআত সালাত কাযা আদায় করতেন। আর হাফিয ইবন হাজার 'ফাতহুল বারী'-তে ইবন মাসউদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন, তার ঈদের সালাত ছুটে গেলে চার রাকাআত কাযা আদায় করতেন। ইবন হাজার এ হাদীসের সনদকে সহীহ বলেছেন। আপনার কাছে কোনটি প্রাধান্যযোগ্য মনে হয়?

৪৫৯. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ৫/৫৩২

৪৬০. তামামুল মিন্নাহ, ৩৪৮

৪৬১. দুই ঈদ ও জানাযায় অতিরিক্ত তাকবীরগুলোতে হাত উত্তোলন করা উত্তম বলেছেন শাইখ ইবন বায রাহিমাহুল্লাহ।—সম্পাদক (সালাফী)

জবাব: যতটুকু সালাত ছুটবে ততটুকু কাযা করতে হবে। এই ফিকহী কায়েদা কিছু কিছু হাদীস থেকে গৃহীত। আর ঈদের সালাত দুই রাকাআত। তাই শরয়ী ওযরবশত যার ঈদের সালাত ছুটে যাবে সে দুই রাকাআত আদায় করবে, যেমনটি ইমাম আদায় করেছেন। আর চার রাকাআত আদায় করার ব্যাপারটা ব্যক্তিমতামত। এ মতের পক্ষে হাদীস থেকে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৪৬২]

প্রশ্ন ২২২: ঈদের সালাতে অতিরিক্ত তাকবীর সংখ্যা কত?

জবাব: আবদুর রহমান বলেন, আমাকে কোনো এক সাহাবী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ ঈদের দিন আমাদের ইমামতি করেন। তিনি চার চার করে তাকবীর দেন। এরপর সালাম ফিরিয়ে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফেরালেন এবং বললেন, তোমরা ভুলবে না জানাযার সালাতের ন্যায় (চার) তাকবীর দিতে। এরপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি গুটিয়ে নিয়ে আঙুলসমূহ দ্বারা ইশারা করলেন।

উপর্যুক্ত হাদীসের পক্ষে বেশকিছু আসার উল্লেখ করেছি আমি। তবে হক হচ্ছে, ঈদের তাকবীরের বিষয়টি প্রশস্ত। কেউ চাইলে উল্লিখিত হাদীস ও আসারসমূহের ওপর ভিত্তি করে চার চার তাকবীর দেবে। আর যে চাইবে সে বাইহকী যে মারফূ হাদীসের দিকে ইশারা করেছেন তার ওপর ভিত্তি করে প্রথম রাকাআতে সাত তাকবীর আর দ্বিতীয় রাকাআতে পাঁচ তাকবীর দেবে। বারো তাকবীরের পক্ষে একদল সাহাবী থেকে বর্ণনা পাওয়া যায়। সবগুলো মিলে সহীহর স্তরে উন্নীত হবে। ইরওয়াউল গালীল (নং ৬৩৯) গ্রন্থে আমি এর তাহকীক করেছি। তাহাবী হাদীসগুলোকে দুর্বল বললেও তার কোনো কারণ নেই। অনুরূপ এর বিপরীতে যারা এই দলিলগুলো দুর্বল বলবে তাদেরও একই অবস্থা। হক হচ্ছে, উভয়টি জায়েয। উভয়টির যে-কোনো একটি পালন করলে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। এ নিয়ে গোঁড়ামি ও ফিরকাবাজির কিছুই নেই। তবে সাত ও পাঁচ করে তাকবীর আমার কাছে বেশি প্রিয়। কারণ, তা বেশি।[৪৬৩]

প্রশ্ন ২২৩: ঈদের সালাতের পূর্বে ও পরে কি কোনো সুন্নাত আছে?

জবাব: ইবন আব্বাস ﷺ বলেন,

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا

৪৬২. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৬/২৫৫
৪৬৩. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ৬/২/১২৬৩

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন বের হন, অতঃপর দুই রাকাআত সালাত আদায় করেন। এর পূর্বে বা পরে সালাত পড়েননি।[৪৬৪]

এ ব্যাপারে আবু সাঈদ খুদরী ؓ থেকে বর্ণিত হয়েছে,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لاَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئً ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের পূর্বে কিছু পড়তেন না। তিনি তাঁর ঘরে ফিরে এলে দুই রাকাআত সালাত আদায় করেন।[৪৬৫]

উভয় হাদীসের মাঝে সমন্বয় হচ্ছে, প্রথম হাদীসে ঈদের সালাতের পর যে সালাতকে অস্বীকার করা হয়েছে তা মূলত ঈদগাহের।[৪৬৬]

প্রশ্ন ২২৪: ঈদের তাকবীর কি সালাতের পর পড়তে হয়? সালাতের পর পড়তে হলে আগে ঈদের তাকবীর পড়বে না কি সালাত পরবর্তী যিকির-আযকার আগে পড়বে?

জবাব: আমার জানামতে, ঈদের তাকবীর নির্দিষ্ট করে সালাতের পর পড়ার কথা হাদীসে নেই। তাকবীর তো এ দিনগুলোর (যুলহাজ্জাহ মাসের ১০, ১১, ১২ এবং ১৩ তারিখের) নিদর্শন। আমি মনে করি, সালাতের পর তাকবীরকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া বিদআত। নবী ﷺ-এর যুগে এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এ কারণে স্বতঃসিদ্ধ জবাব হচ্ছে, সালাত পরবর্তী প্রসিদ্ধ যিকিরগুলোকে আগে পড়া সুন্নাত। আর তাকবীর যে-কোনো সময় দেওয়া জায়েয।[৪৬৭]

সালাত সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়

প্রশ্ন ২২৫: কোনো কাফির ব্যক্তি যদি এ শর্তে ইসলাম গ্রহণ করতে চায় যে, সে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে না, তবুও কি শাসক তার ইসলাম গ্রহণ মেনে নেবে?

জবাব: কোনো কাফির যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে না চায়, তবুও শাসকের জন্য

৪৬৪. সহীহুল বুখারী, ৯৮৯
৪৬৫. সুনানু ইবন মাজাহ, ১২৯৩, হাদীসটি হাসান
৪৬৬. ইরওয়াউল গালীল, নং ৬৩১। অর্থাৎ ঈদগাহে ঈদের সালাতের আগে ও পরে কোনো সুন্নাত পড়া যাবে না, কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে কেউ পড়তে চাইলে পড়তে পারে।—সংকলক
৪৬৭. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৬/২৭০

বৈধ তার ইসলাম মেনে নেওয়া। নাসর ইবন আসিম আল-লাইসী বর্ণনা করেন এক ব্যক্তি থেকে; সেই ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে এই শর্তে যে, সে কেবল দুই ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার থেকে তা গ্রহণ করেন।[৪৬৮] এ হাদীস মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।[৪৬৯]

প্রশ্ন ২২৬: এক ব্যক্তি সম্পদ রেখে মারা গেছে। সে সালাত আদায় করত না। তার সম্পদ কি তার সন্তানদের মাঝে ভাগ করা যাবে?

জবাব: এ প্রশ্নের জবাব পূর্বের প্রশ্নের জবাব সংশ্লিষ্ট। এ প্রশ্নের পূর্বে আরেক ভাই সালাত পরিত্যাগকারীর বিধান সম্পর্ক জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি আরও জানতে চেয়েছিলেন, সালাত পরিত্যাগকারীর কুফরীর ব্যাপারে সাহাবীদের মাঝে কি ইখতিলাফ ছিল?

পূর্বের জবাবকে সংক্ষিপ্ত করে এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, যদি জানা যায়, মৃতব্যক্তি সালাত অস্বীকার করত এবং মুসল্লীদের নিয়ে উপহাস করত, তবে সে কাফির। মুসলিমদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা যাবে না এবং তার রেখে যাওয়া সম্পদ বণ্টন করা যাবে না।

আর যদি জানা যায়, সে সালাতে বিশ্বাসী ছিল এবং সালাত স্বীকার করত কিন্তু সে নিয়মিত সালাত পড়ত না বা মাঝেমধ্যে পড়ত আবার মাঝেমধ্যে পড়ত না-তাহলে তার সন্তানরা তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে।[৪৭০]

প্রশ্ন ২২৭: কোনো সালাত পরিত্যাগকারী যদি পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সালাম দেয়, তাহলে কি তার সালামের জবাব দেওয়া যাবে?

জবাব: হ্যাঁ, আপনি তার সালামের জবাব দেবেন, তবে যখন আপনি তার সঙ্গে থাকবেন তখন তাকে বোঝাবেন।[৪৭১]

প্রশ্ন ২২৮: কেউ যদি সালাত আদায় না করে কিন্তু রোজা রাখে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে কি তার রোজা ও যাকাতের ফরয আদায় হয়ে যাবে?

---

৪৬৮. মুসনাদ আহমাদ, ২০২৮৭
৪৬৯. আস-সামারুল মুস্তাতাব, ১/৫১
৪৭০. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ২/১১১-১১২
৪৭১. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ২/১১২

জবাব: হ্যাঁ, তার ফরয আদায় হয়ে যাবে। যে-ব্যক্তি সালাত আদায় করে না কিন্তু রোজা রাখে এবং যাকাত প্রদান করে-এমন ব্যক্তি তার মতো নয়, যে সালাতও আদায় করে না এবং রোজাও রাখে না, আবার যাকাতও প্রদান করে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

যে-ব্যক্তি অণু পরিমাণ ভালো করবে সে তা দেখতে পাবে। আর যে-ব্যক্তি অণু পরিমাণ খারাপ করবে সেও তা দেখতে পাবে।[৪৭২]

তবে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে আশঙ্কা আছে, সে তার রোজা ও যাকাত থেকে উপকৃত হবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحَاسَبُ بِصَلَاتِهِ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ.

কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। যদি সালাত ঠিক হয় তবে সেই বান্দা সফল হবে এবং মুক্তি পেয়ে যাবে। আর যদি সালাত নষ্ট হয়ে যাবে তবে সে ব্যর্থ হবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে।[৪৭৩]

তবে কিছু খারাপ ও ক্ষতি, অন্য কিছু ক্ষতি ও খারাপ থেকে হালকা। অতএব, যে-ব্যক্তি সালাত আদায় করে না কিন্তু রোজা রাখে এবং যাকাত প্রদান করে-এমন ব্যক্তি তার থেকে উত্তম, যে সালাতও আদায় করে না এবং রোজাও রাখে না, আবার যাকাতও প্রদান করে না।[৪৭৪]

প্রশ্ন ২২৯: যে-ব্যক্তি ফজরের সালাত নিয়মিত সূর্যোদয়ের পর আদায় করে, তার ব্যাপারে আপনার নসীহত কী?

জবাব: নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা মানুষকে উত্তম বিন্যাসে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে দ্বারস্থ করেছেন খাবার, পানি, বিশ্রাম এবং ঘুমের। প্রত্যেক মানুষের প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন; বিশেষ করে যুবা বয়সে আরও বেশি ঘুমের প্রয়োজন। যদি ঈশা সালাতের পর দুই ঘণ্টা জাগ্রত থাকে তবে তা অভ্যাসে পরিণত হয় এবং ফজরের সালাত ছুটে যায়।

প্রথমত, আমি তার উদ্দেশ্যে বলব, প্রাত্যহিক জীবনে নিয়মানুবর্তিতা গড়ে তুলুন। বিশ্রাম ও

৪৭২. সূরা যিলযাল, ৯৯:৭-৮

৪৭৩. সুনানুত তিরমিযী, ৪১৩; সুনানুন নাসায়ী, ৪৬৬, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৪৭৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ২/১১২

ঘুমের সময় নিয়মতান্ত্রিকভাবে মেনে চলুন। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যান এবং সকাল সকাল ঘুম থেকে জাগ্রত হোন। এমনটা করলে আপনার জন্য সূর্যোদয়ের পর নয় বরং সঠিক সময়ে ফজরের সালাত আদায় করা সহজ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত, শুধু ফজরের সালাত নয় বরং অন্যান্য সালাত জামাআতের সাথে আদায় করুন, যেমনটি একজন মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এরপর তাকে বলব, এই যে আপনি সূর্যোদয়ের পর সালাত আদায় করেন, আপনার এই সালাতের কোনো মূল্য নেই। তবে এক সময় মূল্য আছে, যখন আপনি সুন্নাহর অনুসরণ করে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যান, কিন্তু ঘুম আপনাকে পরাস্ত করে ফেলার কারণে সূর্যোদয়ের পর জাগ্রত হন। এ ক্ষেত্রে যখন সালাতের কথা স্মরণ হবে তখন আদায় করুন। স্মরণ করার সাথে সাথে আদায় করে নেওয়াটাই এর কাফফারা।

আর যে-ব্যক্তি প্রাত্যহিক জীবনকে শরীআতের উলটো পথে পরিচালনা করে জীবনের গতিবিধিকে পরিবর্তন করে ফেলে এবং অর্ধেক রাত জেগে থেকে দুপুরে জাগ্রত হয়ে বলে, 'আল্লাহর কসম আমি ফজরের সময় উঠতে পারি না।' এমন ব্যক্তিকে আমি বলব, ভাই আমার, প্রথম রাতেই আপনি ঘুমিয়ে যান। দেখবেন ঠিকই শেষ রাতে জেগে গেছেন।

অতএব, যে-ব্যক্তি নিয়মিত সূর্যোদয়ের পর ফজরের সালাত আদায় করে, শরীআতে তার সালাতের কোনো মূল্য নেই।[৪৭৫]

প্রশ্ন ২৩০: কেউ ওজর ছাড়াই ইচ্ছাকৃত সালাত ছেড়ে দিলে বা সালাতের নির্দিষ্ট ওয়াক্ত পার করে দিলে, সে কি কাযা আদায় করবে?

জবাব: কেউ সালাতের নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় না করে ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াক্ত পার করে দিলে, উক্ত সালাত কাযা করা তার জন্য শরীআতসম্মত নয়। তার কোনো আপত্তিও গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, ঘুম ও ভুলে যাওয়া শরীআতসম্মত ওজর। তাই কেউ সালাতের কথা ভুলে গেলে বা ঘুমের কারণে জাগ্রত হতে না পারলে, তার দায়িত্ব হচ্ছে, যখন স্মরণ হবে তখন তাড়াতাড়ি সালাত আদায় করে নেবে। স্মরণ হওয়া বা জাগ্রত হওয়াটাই তার সালাতের সময়। তো কেউ ইচ্ছাকৃত সময় পার করে দিলে তার সময় আসলে কোনটা?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

৪৭৫. তুরাসুল আলবানী ফিকহ, ২/১৭৪-১৭৫

যার আসরের সালাত ছুটে গেল, তার পরিবার ও সম্পদ যেন ধ্বংস হয়ে গেল।[৪৭৬]

যা ছুটে গেছে তা আর পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। পাওয়ার সুযোগ থাকলে একে ছুটে গেছে বলা হতো না। দেখুন ইবনুল কায়্যিমের 'আস-সালাত' গ্রন্থ।

এটি দাউদ যাহিরীর মাযহাব। ইবন হাযমেরও একই মত। তিনি এই মতকে সঠিক প্রমাণ করতে লম্বা-চওড়া আলোচনা করেছেন। তার মতো আলোচনা কেউ করেননি। তিনি বলেন, আমার মতের পক্ষে মত দিয়েছেন উমার ইবনুল খাত্তাব, তার সন্তান আবদুল্লাহ, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, সালমান, ইবন মাসউদ, কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর, বুদাইল আল-উকাইলী, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, মুতাররিফ ইবন আবদুল্লাহ, আবদুল আযীয প্রমুখ। একই মত দিয়েছেন হাসান বাসরী। তিনি বলেন, কেউ যদি এক ওয়াক্ত সালাত ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয়, তাহলে সে তা কাযা করতে পারবে না।[৪৭৭]

এরপর ইবন হাযম বলেন, আমরা যেসব সাহাবীর কথা উল্লেখ করলাম, তাদের বিপরীতে কেউ মত দিয়েছেন বলে আমরা জানি না।[৪৭৮]

অতএব, কেউ ওজর ছাড়াই ইচ্ছাকৃত সালাত ছেড়ে দিলে বা সালাতের নির্দিষ্ট ওয়াক্ত পার করে দিলে, সে কাযা আদায় করতে পারবে না।

প্রশ্ন ২৩১: একজন বয়স্ক অবস্থায় দ্বীনের পথে ফিরে এসেছে। সে জীবনভর সালাত পরিত্যাগ করে এসেছে। পূর্বের কর্মকাণ্ডের জন্য তাওবাও করেছে। এখন তাকে কি পূর্বের ছুটে যাওয়া সালাত কাযা আদায় করতে হবে?

জবাব: সে যদি একনিষ্ঠচিত্তে তাওবার শর্ত পূরণ করে তাওবা করে থাকে, তাহলে তার সেই তাওবাই যথেষ্ট। এটিই তার জন্য উপকারী। কাযা আদায় করা আবশ্যক নয়। বরং আমি অতি স্পষ্টভাষায় বলব-তার জন্য কাযা আদায় করা জায়েয নয়।

কাযা আদায় করা ওয়াজিব-এমনটা বলা শরীআতের বিধান প্রদান করা এবং শরীআত রচনা করার নামান্তর। আর কেউ শরীআতের বিধান দিতে পারে না এবং রচনাও করতে পারে না। এটি একমাত্র বিশ্বজগতের রব আল্লাহ তাআলার জন্য নির্ধারিত। যেমনটি আল্লাহ তাআলা

৪৭৬. সহীহুল বুখারী, ৩৬০২
৪৭৭. আস-সালাত, ১০৭
৪৭৮. আল-মুহাল্লা, ২/২৩৫-২৪৪

বলেন,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ

তাদের কি অংশীদার আছে যারা তাদের জন্য দ্বীনের শরীআত রচনা করে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি।[৪৭৯]

যেসব প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ আলেম কাযা ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেছেন, তাদের আমরা সমালোচনা করব না। মর্যাদাবান ও বিজ্ঞ সেসব আলেম উম্মাহকে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে কুরআন ও হাদীস থেকে ফয়সালা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। আর এ কথা কুরআনেও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। তাদের নসীহত মেনে এবং আহবানে সাড়া দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ফয়সালা নিতে গিয়ে আমরা তাদের পক্ষে এমন কোনো দলিল পাইনি, যা থেকে তাদের মত প্রমাণ হয় যে, কাযা আদায় করা ওয়াজিব। তবে পূর্ববর্তী কোনো কোনো আলেম সরাসরি ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেননি; কেবল বলেছেন, কাযা আদায় করবে।

তারা তাদের মতের পক্ষে যেসব দলিল পেশ করেন তা তাদের মতকে শক্তিশালী করে না; বরং গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে তাদের বিপক্ষে চলে যায়। সময় সংরক্ষণের জন্য আমরা সেসব দলিল নিয়ে বিস্তর আলোচনা করব না। কেউ তাদের মতের পক্ষে নিচের এই হাদীসটি দলিল হিসেবে পেশ করেন। নবী ﷺ বলেন,

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَإِنَّ كَفَّارَتَهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

যে সালাতের কথা ভুলে গেছে বা সালাত থেকে ঘুমিয়ে গেছে, তার কাফফারা হচ্ছে, যখন সালাতের কথা স্মরণ হবে তখনই তা আদায় করে নিবে।[৪৮০]

তারা বলেন, নবী ﷺ যখন ভুলকারী ও ঘুমন্ত ব্যক্তিকে কাযা আদায়ের আদেশ দিয়েছেন, তখন ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত পরিত্যাগকারীকে আদেশ দেবেন-তা আরও যুক্তিযুক্ত।

তাদের উদ্দেশ্যে বলব, এমন কিয়াস সম্পূর্ণ উলটো। কারণ, ভুলকারী ও ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে আর ইচ্ছাকৃত ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়নি। তাহলে যার থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে তার সাথে কীভাবে তার কিয়াস চলে, যার থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়নি!

৪৭৯. সূরা শূরা, ৪২:২১
৪৮০. সহীহ মুসলিম, ১৪৫৪

এই কিয়াসের মাঝে ইবন হাযমের কথা শতভাগ বাস্তবায়ন হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'এটি কিয়াস আর কিয়াস সমূলে বাতিল।' যদিও ইবন হাযম কিয়াসের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেন এবং কিয়াসকে সমূলে অস্বীকার করেন।

বাস্তবতা হচ্ছে, এই কিয়াস সম্পূর্ণ বাতিল, যেমন আরেকটি মাসআলায় তাদের কিয়াস সম্পূর্ণ বাতিল। সেই মাসআলাটি হচ্ছে, কেউ যদি ভুলে বা না জানার কারণে সালাতে কথা বলে ফেলে, তারা বলেন, তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। তারা এই মত দেন ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলার সাথে কিয়াস করে। অথচ অনিচ্ছাকৃতের সাথে ইচ্ছাকৃতের কিয়াস কীভাবে বৈধ হতে পারে!

অতএব, যে-ব্যক্তি অতীতে সালাত আদায় করেনি কিন্তু পরবর্তীকালে তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে-তার ওপর অতীতের সালাত কাযা করা ওয়াজিব নয় এবং জায়েযও নয়। কারণ, কাযা করার পক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি।[৪৮১]

প্রশ্ন ২৩২: কারো দুই বা ততোধিক সালাত কাযা হয়ে গেলে, সেই সালাত কি ধারাবাহিকভাবে আদায় করতে হবে?

জবাব: কেউ যদি দুই বা ততোধিক সালাত ভুলে যায়, তবে তা ধারাবাহিকভাবে আদায় করার পর উপস্থিত সালাত আদায় করবে। খন্দক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনটি করেছেন। যুদ্ধের ব্যস্ততার কারণে সেদিন তিনি সময়মতো সালাত আদায় করতে পারেননি।

আবু সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, খন্দকের দিন আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি, এমনকী রাতের একটা অংশ কেটে যায় এরপর আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ كَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۚ وَ كَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا

যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ হলেন মহাশক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী।[৪৮২]

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলালকে ডাকেন। তিনি বিলালকে আদেশ দিলে বিলাল ইকামত দেন। নবী ﷺ খুব উত্তমভাবে যোহরের সালাত আদায় করেন, যেভাবে নির্ধারিত সময়ে আদায় করতেন। এরপর আসরের সালাতের জন্য ইকামতের আদেশ দেন। তিনি আসর সালাতও যোহরের মতো উত্তমভাবে আদায় করেন। এরপর মাগরিবের সালাতের জন্য ইকামতের

৪৮১. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ২/২৪০-২৪১
৪৮২. সূরা আহযাব, ৩৩:২৫

আদেশ দেন। তিনি মাগরিবের সালাতও অনুরূপভাবে আদায় করেন। এরপর ঈশার সালাতের জন্য ইকামতের আদেশ দেন। তিনি ঈশার সালাতও একইভাবে আদায় করেন। আর এটা ছিল ভীতিকালীন সালাত আদায়ের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ঘটনা;

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

যদি তোমরা ভয় করো তবে হেঁটে বা আরোহণ করে...[৪৮৩]। হাদীসটি সহীহ।[৪৮৪]

ছুটে যাওয়া সালাত ধারাবাহিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব কি না-এটা নিয়ে আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। শাফিয়ী মাযহাব ওয়াজিব হওয়াকে নাকচ করেছে। তাদের মতে তা মুস্তাহাব। এটি তাউস, হাসান বাসরী, মুহাম্মাদ ইবন হাসান, আবু সাওর এবং দাউদ যাহিরীর মত।

আবু হানীফাহ ও মালিক বলেন, একদিন ও একরাতের বেশি সালাত না ছুটলে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। তারা আরও বলেন, কেউ যদি উপস্থিত সালাতরত থাকে আর সেই সময় ছুটে যাওয়া সালাতের কথা স্মরণ হয়, তবে উপস্থিত সালাত বাতিল হয়ে যাবে। প্রথমে ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করবে এরপর উপস্থিত সালাত আদায় করবে।

যুফার ও আহমাদ ইবন হাম্বাল বলেন, ছুটে যাওয়া সালাত কম হোক বা বেশি হোক, ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। আহমাদ ইবন হাম্বাল বলেন, যদি ছুটে যাওয়া সালাতের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়, তবে পরবর্তীকালে যেসব সালাত আদায় করেছেন তা সঠিক হবে। আহমাদ ইবন হাম্বাল ও ইসহাক বলেন, উপস্থিত সালাত আদায় করার সময় যদি কারো ছুটে যাওয়া সালাতের কথা স্মরণ হয়, তবে চলতি সালাত আদায় করে নেবে, এরপর ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করবে। এরপর আবার উপস্থিত সালাত দোহরানো ওয়াজিব।

তাদের দলিল হচ্ছে, ইবন উমার ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীস।

নবী ﷺ বলেন, যে-ব্যক্তি সালাতের কথা ভুলে গেছে অতঃপর ইমামের সাথে সালাত অবস্থায় স্মরণ হয়েছে-তাহলে সে চলতি সালাত শেষ করার পর ভুলে যাওয়া সালাত আদায় করবে। এরপর যে সালাত ইমামের সাথে আদায় করেছে সে সালাত আবার আদায় করবে।

এ হাদীসটি দুর্বল। হাফিয আসকালানী মূসা ইবন হারূন আল-হাম্মালকে দুর্বল বলেছেন। আবু

---

৪৮৩. সূরা বাকারাহ, ২:২৩৯

৪৮৪. সুনানুন নাসায়ী, ৬৬২

যুরআ রাযী ও বাইহাকী বলেছেন, সঠিক কথা হচ্ছে, এটি মাওকূফ তথা ইবন উমারের বক্তব্য। এমনটি 'আল-মাজমূ' (৩/৭০-৭১) গ্রন্থে রয়েছে।

এরপর ইমাম নববী বলেন, আমাদের মাযহাবের অনুসারীরাও দুর্বল হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেন। স্পষ্ট দলিল ছাড়া ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব প্রমাণিত হবে না। আর তাদের কাছে কোনো স্পষ্ট দলিলও নেই। যে-ব্যক্তি ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ছাড়াই সালাত আদায় করেছে, সে সেই সালাত আদায় করে নিয়েছে, যে সালাত আদায় করার তাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অতিরিক্ত কোনো কিছু স্পষ্ট দলিল ছাড়া আবশ্যক নয়। আল্লাহু আলাম। অতএব, কারো দুই বা ততধিক সালাত কাযা হয়ে গেলে, সেই সালাত ধারাবাহিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব নয়।[৪৮৫]

প্রশ্ন ২৩৩: পাগল ব্যক্তি কি ছুটে যাওয়া সালাতগুলো কাযা আদায় করবে?

জবাব: পাগল ব্যক্তি ছুটে যাওয়া সালাতগুলো কাযা আদায় করবে না; তাতে সে বেশি সময় পাগল থাকুক বা কম সময় পাগল থাকুক। এটি শাফিয়ী মাযহাবের মত। এ মত মালিক ও আহমাদ থেকে বর্ণনা করা হয়, যেমনটি 'আল-মাজমূ' (২/৬-৭) গ্রন্থে রয়েছে। ইবন হাযমেরও এটি মত (২/২৩৩-২৩৪)। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ এই মত গ্রহণ করেছেন (১৯)।[৪৮৬]

প্রশ্ন ২৩৪: বেহুঁশ ব্যক্তি কি ছুটে যাওয়া সালাত কাযা আদায় করবে?

জবাব: বেহুঁশ ব্যক্তি কাযা আদায় করবে না। এটি ইবন উমার, তাউস, যুহরী, হাসান বাসরী, ইবন সীরীন ও আসিম ইবন বাহদালাহ এর মত; যেমনটি ইবন হাযম উল্লেখ করেছেন।[৪৮৭]

প্রশ্ন ২৩৫: বাচ্চার বয়স সাত বছর হলে তাকে সালাতের হুকুম দেওয়া কি অভিভাবকদের জন্য ওয়াজিব?

জবাব: বালিগ না হওয়া পর্যন্ত বাচ্চাদের ওপর সালাত ফরয হয় না। কারণ, হাদীসে এসেছে,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

---

৪৮৫. আস-সামারুল মুস্তাতাব, ১/১০৮

৪৮৬. আস-সামারুল মুস্তাতাব, ১/৫৫

৪৮৭. আস-সামারুল মুস্তাতাব, ১/৫৫

তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে: ক. ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, খ. বাচ্চা, যতক্ষণ না বালিগ হয়, ঘ. পাগল, যতক্ষণ না বোধ আসে।[৪৮৮]

তবে বাচ্চার বয়স সাত বছর হয়ে গেলে সালাতের আদেশ দেওয়া এবং দশ বছর হয়ে গেলে সালাতের জন্য প্রহার করা অভিভাবকের ওপর ওয়াজিব। কারণ, হাদীসে এসেছে,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

তোমরা তোমাদের সন্তানদের সালাতের আদেশ দাও যখন তারা সাত বছরের হবে। তাদেরকে (হালকা) প্রহার করো যখন তারা দশ বছরের হবে এবং তাদের বিছানাও আলাদা করে দাও।[৪৮৯]

হাদীসটি দুটি সনদে হাসান অথবা সহীহ; দেখুন 'নাকদুত তাজ' (৮০)।

ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন শাফিয়ী মাযহাব,[৪৯০] শাওকানীও (১/২৬০) এই মত দিয়েছেন।[৪৯১]

প্রশ্ন ২৩৬: সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে চাররাত খুব লম্বা হয়; এমনকী বিশ ঘণ্টা রাত থাকে আর দিন হয় চার ঘণ্টা। আবার কখনো এর বিপরীতও ঘটে থাকে। এসব স্থানে কীভাবে সালাত আদায় করবে?

জবাব: তাদের সবচেয়ে কাছের যে স্থানে স্বাভাবিকভাবে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়, সেই স্থান অনুযায়ী তারা নিজেদের সালাতের সময় নির্ধারণ করবে।

আমার এই জবাব সেই শহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে ভিন্ন আঙ্গিকে পাঁচ ওয়াক্ত সময়ের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না; যদিও খুব স্বল্প সময়ের মাঝেই ওয়াক্ত নির্ধারণ করা যায়। যদি আলাদা আলাদাভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় নির্ধারণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তার সবচেয়ে কাছের শহর যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত সময় হয়, সেই শহর অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় নির্ধারণ করবে।[৪৯২]

---

৪৮৮. সুনানু আবী দাউদ, ৪৪০৫, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
৪৮৯. সুনানু আবী দাউদ, ৪৯৫
৪৯০. মাজমু, ২/১১
৪৯১. আস-সামারুল মুস্তাতাব, ১/৫৪
৪৯২. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ২/১৪৭

প্রশ্ন ২৩৭: কেউ যদি সূর্যোদয়ের পূর্বেই ফজরের সালাত শুরু করে কিন্তু সালাত শেষ হওয়ার পূর্বেই সূর্যোদয় হয়ে যায়, তাহলে তার সালাতের বিধান কী?

জবাব: আবু হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

যে-ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাকাআত পাবে, সে ফজরের সালাত পেয়ে গেছে। আর যে-ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাকাআত পাবে, সে আসরের সালাত পেয়ে গেছে।[৪৯৩]

আবু হুরাইরাহ ﷺ থেকে আরো বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ

তোমাদের কেউ যদি সূর্যাস্তের পূর্বে আসর সালাতের এক সাজদা পায়, তাহলে সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয়। আর যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজর সালাতের এক সাজদা পায়, তাহলে সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয়।[৪৯৪]

উপর্যুক্ত হাদীসদ্বয় হানাফীদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ, যারা বলে, সূর্যোদয়ের মাধ্যমে ফজরের সালাত বাতিল হয়ে যাবে;[৪৯৫] কেননা সালাত আদায়কারী সালাতের নিষিদ্ধ সময়ে প্রবেশ করেছে। কিন্তু সূর্যাস্তের ক্ষেত্রে তারা এর বিপরীতে কথা বলে থাকে।[৪৯৬]

প্রশ্ন ২৩৮: যদি কোনো ইমাম নিয়মিত দেরিতে সালাত আদায় করে, তার পেছনে সালাত আদায় করা যাবে কি?

---

৪৯৩. সহীহ মুসলিম, ৬০৮

৪৯৪. সহীহুল বুখারী, ৫৫৬

৪৯৫. হানাফী মাযহাব মতে, কেউ যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সালাত আদায় শুরু করে কিন্তু সালাত শেষ করার আগেই সূর্যোদয় হয়, তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে; কেননা সে নিষিদ্ধ সময়ে সালাত অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু তারা আসর সালাতের ক্ষেত্রে বলে, কেউ যদি সূর্যাস্তের পূর্বেই সালাত শুরু করে কিন্তু সালাত শেষ করার আগেই সূর্যাস্ত হয়ে যায়, তাহলে তার সালাত বাতিল হবে না; বরং সালাত হয়ে যাবে।—সংকলক

৪৯৬. মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/১৯১

জবাব: যদি কোনো ইমাম নিয়মিত উত্তম সময়ে সালাত আদায় না করে দেরিতে সালাত আদায় করে, তাহলে একজন মুসলিমের দায়িত্ব হচ্ছে, সে বাসায় উত্তম সময়ে সালাত আদায় করে নেবে। এরপর পুনরায় সে তাদের সাথে জামাআতে সালাত আদায় করবে। জামাআতের সাথে দ্বিতীয় সালাত তার নফল সালাত বলে গণ্য হবে।

আবু যার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> হে আবু যার! আমার পরে অচিরেই এমন আমীর বা শাসকদের আবির্ভাব ঘটবে, যারা একেবারে শেষ ওয়াক্তে সালাত আদায় করবে। এরূপ হলে তুমি কিন্তু সময়মতো সালাত আদায় করে নেবে। পরে যদি তাদের সাথে সালাত আদায় করো, তাহলে তা তোমার জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি তা না হয় তাহলে তুমি অন্তত তোমার সালাত রক্ষা করতে সক্ষম হবে।[৪৯৭]

ফায়েদা: ইমাম নববী মুসলিমের ব্যাখ্যা ও 'আল-মাজমূ' (৩/৪৮) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসে বর্ণিত 'তারা সালাতকে তার সময় থেকে বিলম্ব করে দেবে' দ্বারা উদ্দেশ্য, সালাতের উত্তম সময় থেকে বিলম্ব করবে; গোটা ওয়াক্ত থেকে বিলম্ব করবে উদ্দেশ্য নয়। কারণ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আমীর-উমারাদের ব্যাপারে পাওয়া যায়, তারা উত্তম সময় থেকে বিলম্ব করতেন; তাদের কেউ পুরোপুরি ওয়াক্ত থেকে বিলম্ব করতেন না। অতএব, এই হাদীসগুলোকে বাস্তবতার সাথে প্রয়োগ করা আবশ্যক। হাদীসে বর্ণিত 'সালাতকে তার সময়ে আদায় করো' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রথম ওয়াক্তে আদায় করো। এরপর ইমাম নববী আরও বলেন, শাসক যদি সালাতকে প্রথম ওয়াক্ত থেকে বিলম্ব করে তবে মুক্তাদীর জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে, সে একাকী সালাতকে প্রথম ওয়াক্তে পড়ে নেবে, এরপর আবার ইমামের সঙ্গে পড়বে। এভাবে সে প্রথম ওয়াক্ত নিজে পড়বে এবং পরে জামাআতে ইমামের সাথে সালাত আদায় করবে।

যদি কেউ দুবার সালাত না পড়ে একবার পড়তে চায়, তবে তার জন্য কোনটি উত্তম; প্রথম ওয়াক্তে একাকী না কি শেষ ওয়াক্তে জামাআতের সাথে?

এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে; যে মতানৈক্য অনেক প্রসিদ্ধ। তবে উত্তম মত হলো, যদি অনেক বেশি বিলম্ব না করে তবে জামাআতের জন্য অপেক্ষা করা মুস্তাহাব।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ 'আল-ইখতিয়ারাত' (পৃ. ১৯) গ্রন্থে বলেন, অধিকাংশ আলেম মনে করেন, সালাত আগে পড়া উত্তম; তবে বিলম্বে পড়াতে কল্যাণ থাকলে ভিন্ন কথা,

৪৯৭. সহীহ মুসলিম, ১৩৫২

যেমন: পানি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তায়াম্মুমকারী শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করবে এবং জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার জন্য একাকী ব্যক্তি শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করবে।

আমি বলব, দলিলসমৃদ্ধ সঠিক মত হচ্ছে, ইমাম নববী যা উল্লেখ করেছেন এবং যে মত দিয়েছেন-যদি অনেক বেশি বিলম্ব না করে তবে জামাআতের জন্য অপেক্ষা করা মুস্তাহাব।[৪৯৮]

প্রশ্ন ২৩৯: গরমের সময় কি যোহরের সালাত দেরিতে আদায় করা মুস্তাহাব?

জবাব: গরমের সময় যোহরের সালাত দেরিতে আদায় করা মুস্তাহাব। আনাস ইবন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ গরমের সময় (যোহরের সালাত) বিলম্বে আদায় করতেন আর ঠান্ডার সময় তাড়াতাড়ি আদায় করতেন।[৪৯৯] এ হাদীসের সনদ বুখারীর শর্তে সহীহ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন গরম তীব্র হয়ে যাবে তখন ঠান্ডা করে সালাত আদায় করো। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের অংশবিশেষ।[৫০০]

আর এটাই ইবনুল মুবারাক, আহমাদ ও ইসহাকের মত।

মসজিদ দুরে হোক কিংবা কাছে হোক, সর্বাবস্থায় গরমে বিলম্বে সালাত আদায় করার বিধান প্রযোজ্য। কারণ, আবু যার ﷺ'র হাদীসে[৫০১] বলা হয়েছে, তারা সফর অবস্থায় ঠান্ডা করে সালাত আদায় করেছেন অথচ তারা সবাই এক জায়গায় একত্র অবস্থায় ছিলেন।[৫০২]

প্রশ্ন ২৪০: কোনো ইমাম যদি টাখনুর নিচে পোশাক পরে এবং স্বর্ণ ব্যবহার অথচ সে জানে এসব হারাম, তাহলে কি তার পেছনে সালাত আদায় করা যাবে?

জবাব: সালাত শুদ্ধ হবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইমামদের ব্যাপারে বলেছেন, তারা তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করবে। তারা সঠিক করলে তোমরা ও তারা সাওয়াব পাবে, আর তারা ভুল করলে তোমরা সাওয়াব পাবে, তবে তাদের পাপ হবে।[৫০৩]

তবে একজন মুসলিমের দায়িত্ব হচ্ছে, একজন সৎ, জ্ঞানী ও কারীর পেছনে সালাত আদায় করা...

৪৯৮. আস-সামারুল মুস্তাতাব, ১/৮৬
৪৯৯. সুনানুন নাসায়ী, ৫০০
৫০০. সহীহুল বুখারী, ৫৩৩
৫০১. সুনানুত তিরমিযী, ২৯৬
৫০২. আস-সামারুল মুস্তাতাব, ১/৫৭
৫০৩. সহীহুল বুখারী, ৬৯৪

প্রশ্নকারী: কিন্তু ইমাম শুধু স্বর্ণ ব্যবহার করে এবং টাখনুর নিচে পোশাক পরে...

জবাব: আমি জবাব দিয়েছি। বারাকাল্লাহু ফীক। জবাবের পর বলছিলাম, একজন মুসলিমের দায়িত্ব হচ্ছে, একজন সৎ, জ্ঞানী এবং মুত্তাকী ইমাম বাছাই করা। তবে এমন ইমাম যিনি হারাম জিনিস দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত হন, তাহলে তিনি পাপী হবেন এবং তার নিজের পাপ নিজে বহন করবেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

কোনো বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।[৫০৪]

এমন ইমামের এ ধরনের পাপের সাথে সালাতের কোনো সম্পর্ক নেই। উদাহরণস্বরূপ যে ইমাম দাড়ি কাটে বা প্যান্ট পরে সালাত পড়ে বা এ ধরনের কাজ করে, তাহলে তার পাপ তার ওপর বর্তাবে। যারা তার পেছনে সালাত আদায় করবে তাদের কোনো কিছু হবে না এবং তারা তার পাপের দায়ভার বহন করবে না।[৫০৫]

প্রশ্ন ২৪১: কারুকাজখচিত জায়নামাযে সালাত পড়ার বিধান কী?

জবাব: নিঃসন্দেহে তা অপছন্দনীয়। একজন মুসলিমের দায়িত্ব হচ্ছে, সালাতের জন্য এমন জায়গায় বাছাই করা, যা হবে অবিমিশ্র ও সাদাসিধে; যেখানে থাকবে না সজ্জিত জায়নামায এবং কিবলার দিকেও থাকবে না কোনো কারুকর্ম।[৫০৬]

প্রশ্ন ২৪২: মেম্বার কত স্তরবিশিষ্ট হতে হবে?

জবাব: মেম্বারের ক্ষেত্রে সুন্নাত হচ্ছে, তা তিন স্তরবিশিষ্ট হবে; এর বেশি নয়। এর বেশি করা উমাইয়া খিলাফতের বিদআত। তিনের বেশি স্তর করার কারণে কাতার কেটে যায়। কাতার কেটে যাওয়া থেকে বাঁচার জন্য তা মসজিদ বা মেম্বারের পশ্চিম কোণে রাখা আরেকটি বিদআত। অনুরূপভাবে মসজিদের দক্ষিণ দেয়ালে বেলকনির মতো উঁচু করে রাখা এবং সিঁড়ির মাধ্যমে তাতে ওঠা আরেকটি বিদআত। আর একমাত্র উত্তম পথপ্রদর্শন তো মুহাম্মাদ ﷺ-এরই পথপ্রদর্শন।[৫০৭]

---

৫০৪. সূরা আনআম, ৬:১৬৪
৫০৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৫/৪০০-৪০১
৫০৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৩/২৫৩
৫০৭. আসলু সিফাতিস সালাত, ১/১১৩

প্রশ্ন ২৪৩: অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদেরকে ছোটো প্যান্ট বা ট্রাউজার পরিয়ে মসজিদে নিয়ে যায়। এটা কতটুকু ঠিক?

জবাব: বাচ্চাদের আদব-আখলাক ও শিষ্টাচার শেখানো কর্তব্য। অতএব, অভিভাবকদের জন্য জায়েয নয়, তারা তাদের বাচ্চাদের ছোটো পায়জামা বা ট্রাউজার পরিয়ে মসজিদে উপস্থিত করা। কারণ, হাদীসে বলা হয়েছে, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের সালাতের আদেশ দাও যখন তারা সাত বছরের হবে।'[৫০৮] আর নিঃসন্দেহে সালাতের শর্ত ও রুকন-আরকান পূরণ করার আদেশও এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, এ ব্যাপারে সজাগ হোন, গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।[৫০৯]

প্রশ্ন ২৪৪: কেউ ছবিযুক্ত পোশাকে সালাত আদায় করলে তার সালাতের বিধান কী?

জবাব: ছবিযুক্ত পোশাকে সালাত আদায় করা মাকরূহ। তাই তার সালাত মাকরূহ হবে। তবে সালাত হয়ে যাবে।

মাকরূহ হওয়ার কারণ হচ্ছে, আমরা জানি অনেক হাদীসে ছবি চর্চা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং ছবি তুলতেও নিষেধ করা হয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না যে ঘরে ছবি বা কুকুর থাকে।[৫১০]

এমন কোনো শরয়ী দলিল পাওয়া যায় না, যা থেকে প্রমাণ হয়, ছবিযুক্ত পোশাকে সালাত আদায়কারীর সালাত বাতিল হয়ে যাবে। এ কারণে আমরা বলি, তার সালাত হয়ে যাবে; তবে তা মাকরূহ।[৫১১]

প্রশ্ন ২৪৫: মদ, সিগারেট বা এ জাতীয় হারাম জিনিস সাথে নিয়ে কেউ সালাত আদায় করলে তার সালাত কি শুদ্ধ হবে?

জবাব: কেউ যদি সালাত আদায় করে আর তার পকেটে স্বর্ণ থাকে অথবা কেউ যদি রেশমের পোশাক পরে সালাত আদায় করে, তবে সে হারাম কাজে লিপ্ত বলে গণ্য হবে; কিন্তু সালাত হয়ে যাবে। কারণ, রেশমের পোশাক নাপাক নয় এবং স্বর্ণও নাপাক নয়। আর রৌপ্য হারাম হওয়া নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। অতএব, উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি স্বর্ণ সাথে নিয়ে বা রেশম

৫০৮. সুনানু আবী দাউদ, ৪৯৫, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।
৫০৯. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৩/৩৪৬
৫১০. সহীহুল বুখারী, ৩২২৫; সহীহ মুসলিম, ৫৪০৮
৫১১. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৩/৩৪৮

সাথে নিয়ে বা মদের বোতল সাথে নিয়ে সালাত আদায় করে, তবে তার সালাত শুদ্ধ হবে। কারণ, তার সাথে নাপাক জিনিস নেই। এসব জিনিস হারাম তবে নাপাক নয়।[৫১২]

প্রশ্ন ২৪৬: কেউ যদি টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা অবস্থায় সালাত আদায় করে তাহলে কি তার সালাত শুদ্ধ হবে?

জবাব: কেউ টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করলে, তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে মর্মে কোনো কিছু পাওয়া যায় না। তবে নিঃসন্দেহে সে গুনাহগার হবে। কারণ, সালাতের বাইরে টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করলে যদি গুনাহগার হয়, তাহলে সালাতেও একইভাবে কাপড় পরিধান করলে গুনাহগার হওয়া আরও বেশি যুক্তিযুক্ত।

তবে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে বলতে গেলে খাস প্রমাণ লাগবে। ইমাম নববী 'রিয়াযুস সালিহীন' গ্রন্থে যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তা ছাড়া এ মর্মে কোনো হাদীস পাওয়া যায় না।[৫১৩] আর সে হাদীসটি দুর্বল। কারণ, তাতে আবু জাফর মাদীনী নামক একজন অপরিচিত বর্ণনাকারী আছে।[৫১৪]

প্রশ্ন ২৪৭: কেউ যদি সালাত শেষ করে জানতে পারে যে, সে অজু ছাড়াই সালাত আদায় করেছে, তাহলে তার করণীয় কী?

জবাব: (অজু করে) সে পুনরায় উক্ত সালাত আদায় করবে।[৫১৫]

প্রশ্ন ২৪৮: কারো কাছে যদি পানি না থাকে আর সে জানতে পারে যে, পরবর্তী সালাতের সময় সে পানি পেয়ে যাবে, তাহলে কি সে উক্ত সালাত বিলম্ব করবে এবং যখন পানি পাবে তখন দুই সালাত একত্রে আদায় করবে?

জবাব: না, সে বিলম্ব করবে না। বিলম্ব করার কিছুই নেই। বরং সে তায়াম্মুম করে নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করে নেবে।[৫১৬]

---

৫১২. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৩/৩৫১

৫১৩. হাদীসটি হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ সেই ব্যক্তির সালাত কবুল করবেন না, যে টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে সালাত আদায় করে। রিয়াযুস সালিহীন, ৮০১; সুনানু আবী দাউদ, ৬৩৮

৫১৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৩/৩৫৫-৩৫৬

৫১৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৩/৩৮৬

৫১৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৩/৩৮৬

প্রশ্ন ২৪৯: এক ব্যক্তি বিমানবন্দর পর্যবেক্ষণের চাকুরি করে। সালাতের সময় তার ডিউটি থাকে। ডিউটি না করে সে যদি সালাত আদায় করতে যায়, তাহলে শত শত যাত্রীর বিমান ছুটে যাবে। আর ডিউটি শেষ করে সালাত পড়তে গেলে সালাতের সময়ও শেষ হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে করণীয় কী?

জবাব: যদি এমনটা হয়ে থাকে তবে তাকে সালাতের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হবে। সে দুই ওয়াক্ত সালাতকে একত্র করে পড়বে। দুই ওয়াক্ত সালাতের সময় শেষ করবে না। মুকীম অবস্থাতেও দুই সালাত একত্র করা যায়। আল্লাহ তাআলা এ বিষয়টি মুসলিমদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। কারণ, ইবন আব্বাসের হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় ওযর ও বৃষ্টি ছাড়াই যোহর ও আসরের সালাত একত্র করে পড়েছেন।[৫১৭]

প্রশ্ন ২৫০: আমি একটি রেস্টুরেন্টে চাকুরি করি। কিন্তু এখন আমি যদি প্রতি ওয়াক্ত সালাত জামাআতে পড়ার জন্য যাই তবে তারা আমাকে চাকুরিচ্যুত করবে। এ ক্ষেত্রে করণীয় কী?

জবাব: স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য করা যায় না। অতএব, জামাআতের সাথে সালাত পড়া থেকে বিরত থাকা আপনার জন্য জায়েয নয়। আপনি হয়তো এ নিয়ে খুতবাও শুনেছেন যে, জামাআত ত্যাগ করার শাস্তি কী। আপনার কর্তৃপক্ষ আপনাকে চাকুরিচ্যুত করবে এই অজুহাতে জামাআতের সাথে সালাত পরিত্যাগ করা আপনার জন্য জায়েয নয়। প্রথম কথা হলো, রিযিক তো আল্লাহ আপনাকে দেন; আপনার কর্তৃপক্ষ নয়। দ্বিতীয় কথা হলো, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

যে-ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার উত্তরণের ব্যবস্থা করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দেন যা সে কল্পনাও করে না।[৫১৮]

আমি আশাবাদী, আপনি আপনার রবের আনুগত্য করে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার কারণে আপনাকে চাকুরিচ্যুত করা হলে, আপনি কি মনে করেন আপনার রব তাঁর আনুগত্যের কারণে আপনাকে শাস্তি দেবেন না কি আপনার অকল্পিত উৎস থেকে রিযিক দেবেন? নিঃসন্দেহে ব্যাপারটা এরকম। আমি মনে করি না আপনি তাদের মতো, যারা দুনিয়ার

৫১৭. তুরাসুল আলবানী ফিকহ, ৫/৩৩
৫১৮. সূরা তালাক, ৬৫:২-৩

প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দেয়। তবে ভাই আমার, একটি জিনিস আবশ্যক। আপনাকে উপায় অবলম্বন করতে হবে এরপর আমাদের রব বান্দাদের রিযিক দেন। আমরা বলব, হ্যাঁ, আল্লাহর কাছে যা আছে তা হারামের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। অতএব, রবের নাফারমানী করে বান্দার আনুগত্য করা আপনিসহ অন্যদের জন্য হারাম।[৫১৯]

প্রশ্ন ২৫১: হাদীসে বলা হয়েছে, 'যে-ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাআতে আদায় করবে এরপর বসে আল্লাহর যিকির করবে।' প্রশ্ন হচ্ছে, যেখানে সালাত আদায় করেছে সেখানেই বসে থাকতে হবে, না কি মসজিদের যে-কোনো স্থানে বসতে পারবে?

জবাব: হাদীস শুনে সহজেই মনে হবে, যেখানে সালাত পড়েছে সেখানেই বসে থাকবে। তবে আমার কাছে মনে হয়, এটা মূল উদ্দেশ্য নয়। তবুও বিরাট নেকি অর্জনের উদ্দেশ্যে সতর্কতাবশত যেখানে সালাত পড়েছে সেখানেই বসে থাকবে। তবে পড়ার জন্য কুরআন নেওয়া বা অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজন হলে স্থান ত্যাগ করাতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।[৫২০]

৫১৯. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৫/৪৩

৫২০. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ২/৩৫১

মুসাফিরের সালাত

প্রশ্ন ২৫২: মুসাফিরের জন্য নির্দিষ্ট কোনো দূরত্ব ও দিন আছে কি?

জবাব: এ মাসআলায় আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, তা হলো, নিজ শহর থেকে এত এত দূর গেলে মুসাফির হবে, শরীআতে এমন কোনো নির্দিষ্ট দূরত্বের কথা বলা হয়নি। অন্যান্য অনেক শব্দের ন্যায় 'সফর' শব্দটিরও প্রচলিত আভিধানিক অর্থ রয়েছে। আর শরীআত এ শব্দের কোনো সংজ্ঞা বা নতুন কোনো সীমা ও শর্ত প্রদান করেনি। যেমন, রামাদান মাসের সিয়ামের ব্যাপারে আমাদের রব উল্লেখ করেছেন,

فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ ও সফরে রয়েছে, সে অন্য মাসে তা কাযা করবে।[৫২১]

এ আয়াতে 'সফরের' ন্যায় 'অসুস্থতাকে'ও শর্তহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতে অসুস্থতার সীমা নির্ধারণ করা হয়নি যে, এতটুকু অসুস্থ হলে তার ওপর থেকে রোজার ফরযিয়্যাত দূর হয়ে যাবে এবং সে রোজা ভাঙতে পারবে। তা না করে বরং শর্তহীনভাবে অসুস্থতার কথা বলা হয়েছে। অতএব, যে-ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা যাবে সে অসুস্থ বা সে অসুখে পীড়িত, তার জন্য রামাদানের রোজা ভেঙে ফেলা এবং অন্য মাসে তা কাযা করা বৈধ। একইভাবে আয়াতে সফর ও অসুস্থতাকে একসঙ্গে উল্লেখ করে আল্লাহ বলেছেন,

فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ ও সফরে রয়েছে সে অন্য মাসে তা কাযা করবে।[৫২২]

অসুস্থতার ন্যায় সফরের ব্যাপারেও শরীআতে কোনো শর্ত ও সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। তা শর্তহীন রাখা হয়েছে এবং 'সফর' শব্দটি আরবী ভাষায় যে অর্থে প্রচলন আছে তার ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

অতএব, কেউ যদি এতদিনের জন্য নিজ এলাকা ছেড়ে অন্য কোথায় যায় যতদিন তাকে শাব্দিকভাবে মুসাফির বলা যাবে, তাহলে সে ততদিন মুসাফিরের বিধানে থাকবে। নিজ দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত ততদিন তার ওপর সফরের বিধান প্রযোজ্য হবে। এমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ

৫২১. সূরা বাকারাহ, ২:১৮৪
৫২২. প্রাগুক্ত

বিদায় হজের সফরে করেছেন। আনাস ইবন মালিক ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবী ﷺ মদীনা থেকে বের হওয়া থেকে শুরু করে মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত দুই দুই রাকাআত করে সালাত আদায় করতেন।[৫২৩]

প্রশ্ন ২৫৩: যদি কোনো মুসাফির মাগরিবের সময় মাগরিব ও ঈশার সালাতকে জমা করে তথা একত্রে পড়ে, তাহলে বিতর সালাত কখন পড়বে?

জবাব: বিতর সালাত ঈশার সঙ্গে সংযুক্ত। সফরের ছাড়ের কারণে ওয়াক্তের আগে যদি ফরয সালাত আদায় করা জায়েয হয়, তাহলে সুন্নাত বিতর সালাত ওয়াক্তের আগে পড়ার বৈধতা আরও যুক্তিযুক্ত।[৫২৪]

প্রশ্ন ২৫৪: আমরা যখন আমেরিকার বিমানে উঠি তখন যোহরের সময় যোহর ও আসর একত্রে আদায় করি। আবার যখন আমরা আমেরিকাতে অবতরণ করি তখনও যোহরের সময় থাকে। এক্ষেত্রে আমরা কী করব? আমরা কি আবার যোহর ও আসর সালাত পড়ব?

জবাব: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لاَ صَلاَةَ مَكْتُوبَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ

এক দিনে দুইবার ফরয সালাত নেই।[৫২৫]

আপনি শরীআত অনুমোদিত সময়ে যোহর ও আসরের সালাত আদায় করেছেন, তাই আমেরিকাতে গিয়ে আবার আপনি যোহর ও আসরের সালাত আদায় করবেন না।[৫২৬]

প্রশ্ন ২৫৫: ইবন উমার ﷺ বলেন, 'যদি আমি তাসবীহ পাঠ করতাম তবে আমার সালাত পূর্ণ করতাম।' তার এ উক্তি থেকে কি আমরা বুঝতে পারি না যে, সফরে ফরয সালাতের পর তাসবীহ পাঠ করা জায়েয নয়?

জবাব: আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। ইবন উমার ﷺ'র এ আসার সহীহ।

৫২৩. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৬/৩৮৫
৫২৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৬/৩৩৯
৫২৫. সুনানু আবী দাঊদ, ৫৭৯; সুনানু নাসায়ী, ৮৬১, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।
৫২৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৬/৩৬৯

এ আসার সহীহুল বুখারীতে রয়েছে।[৫২৭] তার আসার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'যদি আমি নফল পড়তাম এবং সুনানে রাতিবা সংরক্ষণ করতাম তবে ফরয পূর্ণ আদায় করতাম। কিন্তু এখানে নিজস্ব মতামতের কোনো সুযোগ নেই। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি কসর করতেন এবং সুন্নাত পড়তেন না।' এটাই মূলত ইবন উমারের উদ্দেশ্য ছিল।[৫২৮]

প্রশ্ন ২৫৬: আমরা ছাত্র। তিন মাস বা তিন মাসের অধিক থেকে আমরা মক্কায় পড়াশোনা করছি। আমরা সালাত কসর করব না কি পূর্ণ করব? যারা বলেন, 'যতদিন আপনি লেখাপড়া করছেন ততদিন কসর করবেন', তাদের ব্যাপারে আপনার মত কী?

জবাব: সালাফদের কথা থেকে আমি যা জানি তা হলো, যে-ব্যক্তি নিজ এলাকা থেকে বের হয়ে অন্য এলাকায় অস্থায়ীভাবে অবস্থান করছে এবং সেখানে থাকার নিয়ত করেনি, তারা তাকে মুসাফির হিসেবে গণ্য করতেন; যদিও সে এক মাস অবস্থান করে। আর যে-ব্যক্তি অবস্থান করার নিয়ত করেছে, সে সেখানে স্থির হয়েছে এবং সেখানকার অধিবাসীরা যেভাবে কাজকর্ম করে সেও সেভাবে কাজকর্ম করছে, তারা তাকে মুকীম গণ্য করতেন। এভাবেই তারা উভয়ের মাঝে পার্থক্য করতেন।

এর ওপর ভিত্তি করে আমি বলব, যে ছাত্ররা নিজ এলাকা থেকে কয়েক মাস বা এক বছর বা দুবছরের জন্য মক্কায় সফর করবে, তাদের ক্ষেত্রে আমি মনে করি, সেখানে অবস্থান করার জন্য তারা বুকের গভীরে নিয়ত করে থাকে। এর বিপরীতে যে-ব্যক্তি কোনো প্রয়োজনে কোনো এলাকায় আগমন করে আর সে জানে না কখন সে নিজ এলাকায় ফিরে যাবে বরং সে বলে আজ চলে যাব, আজ হলে, বলে পরশু চলে যাব-এভাবে কয়েক মাস চলে যায়। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা যায়, সে অবস্থান করার নিয়ত করেনি বরং অবস্থান করা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকে আর আজ বা কাল বা যত তাড়াতাড়ি পারা যায় চলে যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্পী থাকে। ফলে সে চলে যাওয়ার দৃঢ়সংকল্পী হওয়ার কারণে মুসাফির বলে গণ্য হবে। অতএব, যে-ব্যক্তি কোনো এলাকায় এক মাস বা আরও কম এক সপ্তাহ থাকার পরিকল্পনা করেছে এবং সেই এলাকায় অবস্থান করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, সে ব্যক্তি মুকীম বলে গণ্য হবে এবং তার ওপর মুকীম ব্যক্তির বিধান কার্যকর হবে।[৫২৯]

---

৫২৭. সহীহুল বুখারী, ১০৮২

৫২৮. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৬/৪৩৬-৪৩৭। ইবন উমার বোঝাতে চেয়েছেন, যদি সফরে সুন্নাত সালাত পড়ার বিধান থাকত, তাহলে ফরয সালাত কসর করার বিধান দেওয়া হতো না। ফরয সালাত কসর করার বিধান থেকে প্রমাণ হয়, সফরে সুন্নাত সালাত পড়তে হবে না।—সংকলক

৫২৯. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৬/৪৪০-৪৪১

প্রশ্ন ২৫৭: সফর অবস্থায় সালাত কসর করার বিধান কী? মুকীম ইমামের পেছনে মুসাফিরের ইক্তিদা করা কি মাকরূহ?

জবাব: 'ফিকহুস সুন্নাহ' গ্রন্থকার সাইয়্যিদ সাবিক সফরে সালাত কসর করার বিধান সম্পর্কে বলেন, মালিকীরা বলেছেন, কসর সুন্নাতে মুআক্কাদা, জামাআতের থেকে বেশি তাকীদসমৃদ্ধ। মুসাফির ব্যক্তি যদি ইক্তিদা করার মতো আরেকজন মুসাফির ব্যক্তিকে না পায়, তবে একাকী সালাত আদায় করবে। মুকীমের পেছনে মুসাফিরের ইক্তিদা করা মাকরূহ।

সাইয়্যিদ সাবিকের মতের পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমি দেখলাম, মাকরূহ বলার পক্ষে কোনো দলিল নেই। এ কথা দলিলবিহীন। তা ছাড়া এ মত সুন্নাহ পরিপন্থিও বটে। হাবরুল উম্মাহ আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস ﷺ থেকে উক্ত সুন্নাহ প্রমাণিত। মুসা ইবন সালামাহ বলেন, আমরা মক্কায় ইবন আব্বাসের সাথে ছিলাম। আমি তাকে বললাম, আমরা আপনার সঙ্গে থাকলে চার রাকাআত আদায় করি আর আমাদের সফরের আসবাবপত্রের কাছে ফিরে গেলে দুই রাকাআত আদায় করি। তিনি বলেন, এটাই আবুল কাসিম ﷺ-এর সুন্নাত।[৫৩০]

সফরে সালাত কসর করার ব্যাপারে প্রাধান্যযোগ্য মত কোনটি তাও লেখক স্পষ্টভাবে বলেননি। অনেক মাসআলার ক্ষেত্রেই তিনি এমনটা করেন। তবে আমি নিশ্চিতভাবে বলব, যারা বলেছেন কসর করা ওয়াজিব তাদের মত সঠিক। কারণ, তাদের পক্ষে অনেক দলিল রয়েছে এবং সেসব দলিলের বিপরীতে কোনো দলিল নেই। শাওকানী সেসব দলিল 'আস-সাইলুল জাররার' ১/৩০৬-৩০৭ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি দলিল হলো, আয়েশাহ ﷺ থেকে বর্ণিত,

فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

সালাত দুই রাকাআত দুই রাকাআত করে ফরয করা হয়েছে।[৫৩১]

শাওকানী বলেন, যে-ব্যক্তি দুই রাকাআতের ওপর বৃদ্ধি করবে, সে তার মতো যে মুকীম অবস্থায় চার রাকাআতের ওপর বৃদ্ধি করে। আয়েশাহ ﷺ সফর অবস্থায় পূর্ণ সালাত আদায় করতেন-এ কথা যে বর্ণনায় রয়েছে তার ওপর নির্ভর করা সঠিক হবে না। কারণ, তা দলিল নয়। দলিল তার বর্ণনা, তার ব্যক্তি মতামত নয়।

৫৩০. হাদীসটি সহীহ সনদে আহমাদ ইবন হাম্বাল বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া মুসলিম, আবূ আওয়ানাহ এবং অন্যান্যরা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। দেখুন, ইরওয়াউল গালীল, ৫৭১

৫৩১. সহীহুল বুখারী, ৩৫০; সহীহ মুসলিম, ৬৮৫; সুনানু আবী দাউদ, ১২০০

হাফিয ইবন হাজার আসকালানী 'আত-তালখীস' ২/৪৪ গ্রন্থে বলেন, উরওয়া বলেছেন, উসমান ﷺ'র মতো আয়েশাহ ﷺ তাবীল-ব্যাখ্যা করতেন। আয়েশার কাছে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা থাকলে, উরওয়া তার ব্যাপারে বলতেন না যে, তিনি তাবীল-ব্যাখ্যা করতেন। বুখারী ও মুসলিমে তার মতের বিপরীতে হাদীস রয়েছে।

ইবন হাজার আসকালানী আয়েশাহ ﷺ থেকে বর্ণিত দারাকুতনীর দুর্বল হাদীসের দিকে ইশারা করেছেন। হাদীসটি হলো:

قَصَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَأَتَمَّ

রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে কসর করেছেন এবং পূর্ণও করেছেন।

হাদীসটি দুর্বল হওয়ার সাথে সাথে সেসব স্পষ্ট সহীহ হাদীস পরিপন্থি যেসব সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে তিনি সফর অবস্থায় কসর করতেন। আমি সেসব হাদীসের মধ্য থেকে কিছু হাদীস 'ইরওয়াউল গালীল' ২/৩-৯ গ্রন্থে উল্লেখ করেছি এবং উপরে উল্লিখিত হাদীস দুর্বল হওয়ার কারণও তুলে ধরেছি।[৫৩২]

প্রশ্ন ২৫৮: কোনো মুসাফির যদি মুকীমের পেছনে চার রাকাআতবিশিষ্ট সালাতের ইক্তিদা করে, তবে কি মুসাফির ব্যক্তিও চার রাকাআত আদায় করবে?

জবাব: মুসাফির ব্যক্তি যদি মুকীমের ইক্তিদা করে তবে মুসাফিরের সালাত মুকীমের সালাতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মুসাফির ব্যক্তি যদি মুকীম ইমামকে সালাম ফেরানোর কিছুক্ষণ পূর্বে পায় এবং ইমাম সালাম ফিরিয়ে দেয় আর মুক্তিদা দাঁড়িয়ে যায়, তবুও মুসাফিরকে পূর্ণ সালাত আদায় করতে হবে। কারণ, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তাকে মুসাফিরদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তারা যখন সফরের আসবাবপত্রের কাছে সালাত আদায় করে তখন কসর করে। তবে এখানে অর্থাৎ মক্কায়, ইমামের পেছনে সালাত আদায় করলে কীভাবে আদায় করবে? তিনি বলেন, পূর্ণ সালাত আদায় করবে। এটা আবুল কাসিম ﷺ-এর সুন্নাত।[৫৩৩]

এই মাসআলায় এটা একেবারেই স্পষ্ট প্রমাণ। বুখারী ও মুসলিমের ব্যাপক হাদীসও একে শক্তিশালী করে। নবী ﷺ বলেন,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

৫৩২. তামামুল মিন্নাহ, ৩১৭
৫৩৩. ইরওয়াউল গালীল, ৫৭১

ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য।[৫৩৪]

অতএব, মুসাফির ব্যক্তি মুকীমের ইক্তিদা করলে তার সালাত মুকীমের সালাতে পরিবর্তন হয়ে যায়। তাই সব রাকাআত ছুটে গেলেও তাকে সালাত পূর্ণ আদায় করতে হবে।[৫৩৫]

প্রশ্ন ২৫৯: কোনো ব্যক্তি যদি সফর থেকে আসে তবে কি ঘরে প্রবেশের পূর্বে প্রথমেই মসজিদে দুই রাকাআত নফল সালাত আদায় করতে পারবে?

জবাব: কেন পারবে না? সফর থেকে ফিরে এসে মসজিদে প্রথমেই দুই রাকাআত সালাত আদায় করা তো সুন্নাত।

প্রশ্নকারী: উক্ত দুই রাকাআত কি বাসায় পড়বে না?

জবাব: না, বাসায় পড়বে না। সফর থেকে আগত ব্যক্তি তা মসজিদে পড়বে।[৫৩৬]

প্রশ্ন ২৬০: অশ্লীল কাজ বা মদ পান বা এ জাতীয় পাপাচার-অবাধ্য কাজের জন্য যে-ব্যক্তি সফর করে, তার জন্য সালাত কসর করা কি বৈধ?

জবাব: এ ব্যাপারে অনেক প্রসিদ্ধ মতপার্থক্য রয়েছে। তবে আমি বলব, যে-ব্যক্তি পাপ করার উদ্দেশ্যে সফর করবে তার জন্য সালাত কসর করার ছাড় নেই। তবে যে-ব্যক্তি সচরাচর ইসলামপরিপন্থি কাজ করে কিন্তু সেই সফরটি নাফারমানী ও ইসলামপরিপন্থি কাজের উদ্দেশ্য করেনি-এমন ব্যক্তি সেই সফরে গিয়ে নাফারমানী ও ইসলামপরিপন্থি কাজ করলেও, তার জন্য কসর করার ছাড় রয়েছে।[৫৩৭]

প্রশ্ন ২৬১: মুসাফির ব্যক্তি কি কিয়ামুল লাইল আদায় করতে পারবে? এ ব্যাপারে কি কোনো দলিল আছে?

জবাব: কিয়ামুল লাইল মূলত সালাতুল লাইল। কিয়ামুল লাইল গোটা বছর আদায় করা শরীআতসিদ্ধ। তা রামাদানে আদায় করা আরও বেশি যুক্তিযুক্ত। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৫৩৪. সহীহুল বুখারী, ৩৭৮; সহীহ মুসলিম, ৪১১

৫৩৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৬/৪৫৭-৪৫৮

৫৩৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৬/৪৫৬

৫৩৭. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৬/৪৬২

যে-ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও একান্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে রামাদান মাসের তারাবীহ পড়ে তার পূর্বের সব পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[৫৩৮]

নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত, তিনি সফর অবস্থায় সুন্নাতে রাতিবা আদায় করতেন না তবে রাতের সালাত আদায় করতেন।

অতএব, সফর বা মুকীম কোনো অবস্থায় সালাতুল লাইল বাদ যাবে না। সালাতুল লাইল, ফজরের সুন্নাত ও বিতরের সঙ্গে যুক্ত হবে। আর আপনারা জানেন বিতর সালাত কিয়ামুল লাইলের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

রাতের সালাত দুই দুই করে। তোমাদের কেউ যখন সুবহে সাদিকের আশঙ্কা করবে তখন এক রাকাআতে পড়ে নেবে। (সেই) এক রাকাআত তার আদায়কৃত সালাতকে বেজোড় করে দেবে।[৫৩৯]

আর বিতর ও ফজরের সুন্নাত মুকীম ও মুসাফির উভয় অবস্থায় পড়তে পারার ব্যাপারে কোনো ইখতিলাফ নেই। কিয়ামু রামাদান মূলত কিয়ামুল লাইল। তাই মুসাফিরের জন্য কিয়ামুল লাইল শরীআতসম্মত। একইভাবে কিয়ামু রামাদানও মুসাফিরের জন্য শরীআতসম্মত।

শরীআতসম্মত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সফর অবস্থায় সুন্নাতে রাতিবা আদায়কারীকে যেভাবে আমরা সুন্নাতের খেলাফকারী বলি সেভাবে কিয়ামু রামাদান আদায়কারীকে আমরা সুন্নাতের খেলাফকারী বলি না। বরং তার ক্ষেত্রে আমরা বলি, সে আম সুন্নাত পালন করেছে। তবে সে তার ইচ্ছা করলে আদায় করবে আবার ইচ্ছা করলে পরিত্যাগ করতে পারে; এমনকী মুকীম অবস্থাতেও কিয়ামুল লাইল আদায় করা না করার ইখতিয়ার রাখে। কারণ, তা ওয়াজিব নয়। তবে মুসাফির ব্যক্তির জন্য কিয়ামুল লাইল শরীআতসম্মত হওয়াকে আমরা অস্বীকার করি না। কারণ, তা কিয়ামুল লাইল। আর কিয়ামুল লাইল সফর ও মুকীম উভয় অবস্থায় আদায় করা যায়।[৫৪০]

---

৫৩৮. সহীহ মুসলিম. ১৬৬৫

৫৩৯. সহীহুল বুখারী, ৯৯০; সহীহ মুসলিম, ৭৪৯

৫৪০. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৬/৪৬৭-৪৬৮

প্রশ্ন ২৬২: মুসাফির ব্যক্তি আযান শুনলে তার ক্ষেত্রে জামাআতে সালাত আদায় করার বিধান কী?

জবাব: মুসাফির ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে, তাদের ওপর জুমআর সালাত ওয়াজিব নয়। আর জুমআর সালাত জামাআতে সালাত আদায় করার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও তাগিদপূর্ণ ফরয। মুসাফির ব্যক্তি থেকে জুমআর সালাতের ফরযিয়্যাত দূর হয়ে গেলে জামাআতে সালাত আদায় করার ফরযিয়্যাত দূর হয়ে যাওয়া আরও বেশি যুক্তিযুক্ত।

তবে এখানে মুসাফির ব্যক্তির ওপর আরেকটি বিষয় ফরয। তা হলো, যদি সে মুসাফিরদের জামাআতে থাকে অথবা মুকীমদের জামাআতে থাকে আর সালাত দাঁড়িয়ে যায়, তবে সেসময় জামাআতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব। কারণ, সহীহুল বুখারীতে মালিক ইবন হুওয়াইরিস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

যখন তোমরা দুজন সফর করবে তখন তোমরা আযান দেবে এবং ইকামত দেবে আর তোমাদের মাঝে যে বড়ো সে যেন ইমামতি করে।[৫৪১]

নবী ﷺ তাদেরকে মুসাফিরদের নিয়ে খাস করে জামাআত করতে আদেশ দিয়েছেন।[৫৪২]

প্রশ্ন ২৬৩: দুই সালাত একত্রে আদায় করলে কি সুন্নাত আদায় করতে হবে?

জবাব: দুই ফরয সালাত একত্রে আদায় করার ক্ষেত্রে উভয় সালাতের মাঝে সুন্নাত আদায় করতে হবে বলে আমি মনে করি না। তবে দ্বিতীয় ফরয সালাতের পর সুন্নাত থাকলে আদায় করা যাবে, যেমন; বিতর সালাত।[৫৪৩]

প্রশ্ন ২৬৪: সফর অবস্থায় ফরয সালাতের পর পঠিতব্য যিকিরগুলো কি করা যাবে?

জবাব: সফর অবস্থায় ফরয সালাতের পর যিকিরের কথা নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়নি। তবে আমার কাছে মনে হয়, দুই ফরয সালাতের মাঝে যিকির করা আর দ্বিতীয় ফরয সালাত আদায় করার পর যিকির করার মাঝে পার্থক্য আছে। নবী ﷺ সফর অবস্থায় জমা করতেন অর্থাৎ দুই

৫৪১. সহীহুল বুখারী, ২৮৪৮; সুনানুত তিরমিযী, ২০৫
৫৪২. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৬/৪৭৩-৪৭৪
৫৪৩. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৬/৪৮৮, পরিমার্জিত।

সালাত একসঙ্গে পড়তেন। বোঝা যায়, দুই ফরয সালাতের মাঝামাঝিতে কোনো বিরতি ছিল না। আর দ্বিতীয় ফরয আদায় করার পর তিনি কোনো বিরতি দিতেন না-এমনটি বোঝা যায় না। তাই বলা যায়, তিনি দ্বিতীয় ফরয আদায় করার পর যিকির-আযকার করতেন[৫৪৪]।[৫৪৫]

প্রশ্ন ২৬৫: কাফির রাষ্ট্রে কুরআন নিয়ে যাওয়া যাবে কি?

জবাব: কাফির দেশে কুরআন ও মুসহাফ নিয়ে সফর করা জায়েয নয়। তবে তখন জায়েয যখন কুরআন অপমানিত ও অপদস্থ হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। যখন মুসহাফকে অবমাননা করা হবে না বলে নিশ্চিত হওয়া যাবে, তখন তা সাথে নিয়ে কাফির দেশে যাওয়া জায়েয। কেননা হতে পারে তারা তা পড়বে এবং তা নিয়ে গবেষণা করবে।[৫৪৬]

জানাযা

প্রশ্ন ২৬৬: কোনো অমুসলিম ব্যক্তি অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া যাবে কি?

জবাব: বারা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে জানাযার অনুসরণ ও অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন।[৫৪৭]

'মানারুস সাবীল' গ্রন্থকার এ হাদীসের মাধ্যমে দলিল গ্রহণ করেছেন যে, মুসলিম ব্যক্তি অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া সুন্নাত। অথচ এই হাদীসটির অর্থ আরো ব্যাপক। এ হাদীস শুধু

---

৫৪৪. ইমাম আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বোঝাতে চেয়েছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর অবস্থায় দুই সালাত একত্র করে পড়তেন। অর্থাৎ যোহর ও আসর একসঙ্গে পড়তেন আর মাগরিব ও ঈশা একসাথে পড়তেন। তিনি দুই সালাত একসঙ্গে পড়ার সময় প্রথম সালাত শেষ করার পর আর দ্বিতীয় সালাত শুরু করার মাঝে কোনো যিকির করতেন না। তবে দ্বিতীয় সালাত শেষ করে যিকির-আযকার হয়তো করতেন। উদাহরণস্বরূপ, যোহর ও আসর একসাথে পড়ার সময় তিনি যোহরের সালাত শেষ করার পর আর আসরের সালাত শুরু করার আগে কোনো যিকির করতেন না; কিন্তু আসর সালাত শেষ করার পর যিকির-আযকার করতেন।—সংকলক।

৫৪৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ২/৩৫১

৫৪৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৬/৪৮৯

৫৪৭. সহীহুল বুখারী, ১২৩৯

মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য নয়; অমুসলিমদের জন্যও প্রযোজ্য। সহীহ হাদীসে রয়েছে, নবী ﷺ এক ইহুদী বাচ্চাকে দেখতে যান; যে বাচ্চা তাঁর খেদমত করত। তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। অতএব, তাদেরকে দাওয়াতের নিয়তে দেখতে যাওয়া শরীআতসম্মত।[৫৪৮]

প্রশ্ন ২৬৩: কেউ অন্তিম মুহূর্তের মুখোমুখি হলে কী করতে হবে? আর অনেকেই বলে অন্তিম মুহূর্তে কালিমা পড়ার আদেশ দেওয়া যায় না। তাদের এ কথা কি ঠিক?

জবাব: কেউ মুমূর্ষু অবস্থায় বা অন্তিম মুহূর্তের মুখোমুখি হলে তার আশেপাশে যারা থাকবে, তাদের বেশ কিছু দায়িত্ব আছে। যেমন:

ক. কালিমায়ে শাহাদাতের তালকীন দেওয়া। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلِمَتِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عِنْدَ الْمَوْتِ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ

তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর তালকীন দাও। কারণ, মৃত্যুর সময় যার সর্বশেষ কথা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', সে একদিন জান্নাতে যাবে; যদি এর পূর্বে সে শাস্তিও পায়।[৫৪৯]

তিনি আরও বলেন,

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

যে-ব্যক্তি মারা গেছে এ কথা জানা অবস্থায় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৫৫০]

তিনি আরও বলেন,

مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

যে-ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার স্থাপন করা ছাড়াই মারা গেছে, সে জান্নাতে যাবে।[৫৫১]

---

৫৪৮. ইরওয়াউল গালীল, ৯/১৭-১৮

৫৪৯. সহীহ ইবন হিব্বান, ৩০০৪, হাদীসটিকে আলবানী সহীহ বলেছেন।

৫৫০. সহীহ মুসলিম, ২৬

৫৫১. সহীহুল বুখারী, ৭৪৮৭; সহীহ মুসলিম, ৯৪

খ. তার জন্য দুআ করবে এবং তার সামনে ভালো কথা ছাড়া অন্য কিছু বলবে না। উম্মু সালামা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ.

যখন তোমরা অসুস্থ অথবা মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হবে তখন ভালো কথা বলো। কারণ, তোমরা যা বলো তার জন্য ফেরেশতারা আমীন বলে।[৫৫২]

'তালকীন' মানে নিছক মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করে তাকে শোনানো নয়; বরং তালকীন মানে তাকে তা উচ্চারণ করতে বলা। অনেকেই এর বিপরীতে মনে করে যে, তাকে তা বলতে বলা যাবে না। তাকে বলতে বলার প্রমাণ হচ্ছে, আনাস ﷺ'র হাদীস। তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا خَالُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ أَخَالٌ أَمْ عَمٌّ فَقَالَ لَا بَلْ خَالٌ قَالَ فَخَيْرٌ لِي أَنْ أَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারী ব্যক্তিকে দেখতে যান। তিনি তাকে বলেন, হে মামা! বলুন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। লোকটি বলল, মামা না চাচা? তিনি বললেন, মামা। লোকটি আবার বলল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা কি আমার জন্য কল্যাণকর? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[৫৫৩]

প্রশ্ন ২৬৭: কেউ মারা গেলে তার আশেপাশের লোকদের দায়িত্ব কী?

জবাব:

ক. শুরুতে তারা তার দুই চোখ বন্ধ করে দেবে এবং তার জন্য দুআ করবে। উম্মু সালামা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু সালামাকে দেখতে আসেন; তখন তার চোখ খোলা ছিল। তিনি তার চোখ বন্ধ করে দিলেন আর বললেন, যখন রূহ কবজ করা হয় তখন চোখ তার অনুসরণ করে। আবু সালামার পরিবারের লোকেরা কান্না শুরু করে দিলে তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে ভালো কথা ছাড়া কোনো খারাপ কিছু বলাবলি করো না। কেননা তোমরা যা বলো তার স্বপক্ষে ফেরেশতারা আমীন বলে। এরপর তিনি এভাবে দুআ করেন,

৫৫২. সহীহ মুসলিম, ৯১৯
৫৫৩. মুসনাদ আহমাদ, ১২৫৬২, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আহকামুল জানাইয, ১৯, ২০

'হে আল্লাহ! আবু সালামাকে ক্ষমা করো এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যে তার মর্যাদাকে উঁচু করে দাও। তুমি তার বংশধরদের অভিভাবক হয়ে যাও। হে রাব্বুল আলামীন, তাকে ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তার কবরকে প্রশস্ত করো এবং তা আলোকিত করে দাও।'[৫৫৪]

খ. এরপর তার পুরো শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে দেবে। আয়েশাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করলে ইয়ামানী চাদর দিয়ে তাঁকে ঢেকে দেওয়া হয়।[৫৫৫]

গ. উপর্যুক্ত বিধান যিনি ইহরাম বেঁধেছেন তিনি ছাড়া অন্যান্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইহরাম অবস্থায় থাকলে তার মাথা ও চেহারা ঢাকা যাবে না। ইবন আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরাফার ময়দানে থাকাবস্থায় হঠাৎ উটনী থেকে পড়ে যায়। এতে তার ঘাড় মটকে যায় অথবা উটনী তার ঘাড় মটকে দেয়। তাতে সে মারা গেলে নবী ﷺ বলেন, তাকে বরই পাতামিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দিয়ে দাও এবং দুই কাপড়ে কাফন দাও। তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা ও চেহারা আবৃত করবে না। কারণ, কিয়ামতের দিন সে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উত্থিত হবে।[৫৫৬]

ঘ. মৃত্যু নিশ্চিত হলে তাড়াতাড়ি তাকে কাফন পরিয়ে প্রস্তুত করে দাফনের উদ্দেশ্যে বের করবে। কারণ, আবু হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা জানাযা নিয়ে তাড়াতাড়ি করবে।[৫৫৭]

ঙ. সে যে দেশে মারা গেছে, সে দেশে তার দাফনের ব্যবস্থা করবে, সে দেশ থেকে অন্য দেশে লাশ নিয়ে যাবে না। কারণ, অন্য দেশে লাশ নিয়ে যাওয়া মানে উল্লিখিত হাদীসে জানাযা নিয়ে যে তাড়াতাড়ি করতে বলা হয়েছে তার লঙ্ঘন। জাবির ইবন আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন নিহতদের লাশ 'বাকী' কবরস্থানে দাফনের জন্য বহন করা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘোষক ঘোষণা দেন, নবী আপনাদের আদেশ দিয়েছেন যে, আপনারা নিহতের সেখানেই দাফন করুন সেখানে তারা নিহত হয়েছেন। এ ঘোষণা শোনার পর আমি আমার মা, বাবা ও মামাকে 'বাকী' কবরস্থানে দাফন করার জন্য 'নাযিহ' নামক স্থানে নিয়ে যাওয়ার পর আবার ফিরিয়ে আনি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমরা তাদের অন্যান্য নিহতদের সাথে সেখানে নিয়ে এলাম যেখানে তারা নিহত হন।[৫৫৮]

---

৫৫৪. সহীহ মুসলিম, ২০১৫
৫৫৫. সহীহুল বুখারী, ৫৮১৪
৫৫৬. সহীহুল বুখারী, ১২৬৫
৫৫৭. সহীহুল বুখারী, ১৩১৫
৫৫৮. কাছাকাছি বর্ণনা রয়েছে সহীহুল বুখারীতে, ৩১৬৫

আয়েশাহ ﷺ'র ভাই হাবশাদের উপত্যকায় ইন্তিকাল করার পর তাকে নিয়ে আসা হলে তিনি বলেন, আমি তার মৃত্যু নিয়ে কোনোরকম চিন্তিত নই। তবে আমার ইচ্ছে হচ্ছে, তাকে যদি তার ইন্তিকালের জায়গায় দাফন করা হতো!

ইমাম নববী তার 'আযকার' গ্রন্থে বলেন, কেউ যদি তার লাশ অন্য দেশে স্থানান্তরিত করার অসিয়াত করে যায়, তবে তার অসিয়াত কার্যকর হবে না। কারণ, গ্রহণযোগ্য সঠিক মত অনুযায়ী লাশ স্থানান্তর করা হারাম। এটি অধিকাংশের মত। মুহাক্কিক আলেমগণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ মত দিয়েছেন।

চ. মাইয়্যেতের সম্পদ থেকে তাড়াতাড়ি তার ঋণ আদায় করবে। ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে তার সমস্ত সম্পদ শেষ হয়ে গেলেও আদায় করবে। আর তার যদি কোনো সম্পদ না থাকে তবে রাষ্ট্র তার ঋণ পরিশোধ করবে। আর রাষ্ট্র তা আদায় না করলে কেউ যদি তার পক্ষ থেকে আদায় করতে চায় তবে আদায় করতে পারে। এ ব্যাপারে বেশ কিছু হাদীস রয়েছে:

সা'দ ইবন আতওয়াল থেকে বর্ণিত, তার ভাই ইন্তিকাল করার সময় ৩শ দিরহাম ও কজন অসহায় সন্তান রেখে যায়। আমি সেই অর্থগুলো তার সন্তানদের জন্য খরচ করার মনস্থ করি। নবী ﷺ বলেন, তোমার ভাই ঋণের কারণে আটকে রয়েছে। অতএব, তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করো। সা'দ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহি! আমি তার পক্ষ থেকে সব ঋণ পরিশোধ করেছি, কেবল এক মহিলার দাবিকৃত দুটি দীনার বাকি আছে। তার কাছে কোনো প্রমাণ নেই। তিনি বলেন, তাকে তা দিয়ে দাও। কারণ, সে সত্যবাদিনী।[৫৫৯]

প্রশ্ন ২৬৮: মৃত্যু সংবাদ প্রচার করার বিধান কী?

জবাব: জাহিলিয়্যাতের যুগের মৃত্যু-সংবাদ প্রচারের সাথে সাদৃশ্য না রাখলে এটা প্রচার করা জায়েয। কখনো কখনো মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করা ওয়াজিব; যখন তার গোসল, কাফনদাফন ও অন্যান্য কার্যাবলি করার মতো তার কাছে কেউ না থাকবে। এ ব্যাপারে একাধিক হাদীস রয়েছে। যেমন :

ক. আবু হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

৫৫৯. সুনানু ইবন মাজাহ, ২৪৩৩, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আহকামুল জানাইয, ২৫-২৮

নাজ্জাশী যেদিন মারা যান রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিন তার মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেন। তিনি মুসল্লায় বের হন, এরপর সাহাবীদের নিয়ে কাতারবন্দি হন এবং চার তাকবীর দিয়ে (সোলাত আদায় করেন)।[৫৬০]

খ. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللهِ لَتَذْرِفَانِ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ

(মুতার যুদ্ধে) যাইদ পতাকা বহন করে শহীদ হয়েছে। অতঃপর জাফর পতাকা হাতে নিয়ে সেও শহীদ হয়েছে। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা পতাকা নিয়ে সেও শহীদ হয়েছে। একথা বলছিলেন আর তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। অতঃপর খালিদ ইবন ওয়ালীদ ﷺ পরামর্শ ছাড়াই পতাকা হাতে তুলে নেন এবং তার দ্বারাই বিজয় লাভ হয়।[৫৬১]

হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন এবং এ হাদীস ও পূর্বের হাদীসের জন্য অধ্যায় রচনা করেছেন এভাবে; 'মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনের কাছে তার মৃত্যু সংবাদ প্রদান করা।'

হাফিয ইবন হাজার আসকালানী বলেন, এই অধ্যায়ে বোঝানো হয়েছে যে, সব ধরনের মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা নিষিদ্ধ নয়। সেসব মৃত্যু সংবাদ নিষিদ্ধ যা জাহিলিয়্যাতের যুগের লোকেরা করত। তারা মানুষের ঘরে ঘরে ও হাটে-বাজারে মৃত্যু সংবাদ প্রদানের জন্য লোক পাঠাত।

আমি বলব, যদি এ কথা গ্রহণযোগ্য হয় তবে মিনারের মাথায় ঘোষণা দেওয়া নিষিদ্ধ মৃত্যু-সংবাদ প্রচারের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আরও বেশি যুক্তিযুক্ত। এ কারণে পূর্বের অনুচ্ছেদে নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি জোরালোভাবে বলেছি।

এ নিষিদ্ধ মৃত্যু সংবাদ প্রচারের সাথে আরেকটি হারাম জিনিস হলো, ঘোষণা দেওয়ার জন্য পারিশ্রমিক নেওয়া এবং তার এমন সব প্রশংসা করা যা তার মাঝে ছিল না।[৫৬২]

প্রশ্ন ২৬৯: বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও লিফলেটে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা হয় এবং বিশেষ সংখ্যা বের করা হয়। এগুলো কতটুকু শরীআতসম্মত?

৫৬০. সহীহুল বুখারী, ১২৪৫
৫৬১. সহীহুল বুখারী, ১২৪৬
৫৬২. আহকামুল জানাইয, পৃ. ৪৫-৪৬

জবাব: বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও লিফলেটে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা এবং বিশেষ সংখ্যা বের করা নিষিদ্ধ। অধুনা এ সংস্কৃতিতে অধিকাংশ মানুষ জড়িয়ে পড়েছে। সকল শ্রেণির মানুষ একে আজ অনুসরণীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে।[৫৬৩]

প্রশ্ন ২৭০: কেউ পুড়ে মারা গেলে তাকে কি গোসল দিতে হবে?

জবাব: যদি তার দেহ সংরক্ষিত থাকে তবে অবশ্যই গোসল দিতে হবে। আর যদি পুড়ে ছাই হয়ে যায় তবে তো গোসল দেওয়ার কিছুই নেই।[৫৬৪]

প্রশ্ন ২৭১: নারী ও পুরুষকে কত কাপড়ে কাফন দিতে হবে? আর অনেক দামি কাপড়ে কাফন দেওয়া কতটুকু ঠিক?

জবাব: কত কাপড়ে কাফন দিতে হবে, এ ব্যাপারে আয়েশা ﷺ'র হাদীসের কাছে থেমে যাওয়া ওয়াজিব। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর তিন কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়।[৫৬৫] তাই সুন্নাহর অনুসরণার্থে এবং সম্পদ অপচয় না করার জন্য তিন কাপড়ের বেশি দেওয়া যাবে না। ইবন আবী শাইবাহ ৩/২৫৯ সহীহ সনদে যা বর্ণনা করেছেন তা কতই না চমৎকার! রাশিদ ইবন সা'দ বলেন, উমার ﷺ বলেন, তোমরা পুরুষকে তিন কাপড়ে কাফন দাও। সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না। তিন কাপড়েই আবু বাকর ﷺ-কে কাফন দেওয়া হয়।

কাফনের কাপড়ের ব্যাপারে নারীরা নিঃসন্দেহে পুরুষের মতোই। কারণ, বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষেরাই মূল। এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা থেকেই বোঝা যায়। তিনি বলেন,

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

নারীরা পুরুষের মতোই।[৫৬৬]

হাদীসটি সহীহ। এমন কথা উমার ﷺ থেকেও রয়েছে।

---

৫৬৩. আত-তা'লীক আলাত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/১২৭২; টীকা নং ৫

৫৬৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৯/৯২

৫৬৫. সহীহুল বুখারী, ১২৬৪; সহীহ মুসলিম, ২০৬৮

৫৬৬. সহীহ আবূ দাউদ, ২৩৪; মিশকাত, ৪৪১

সিদ্দীক হাসান খান 'আর-রওযাতুন নাদিয়্যাহ' ১/১৬৫ গ্রন্থে বলেন, বহু মূল্যবান কাফনের কাপড় দেওয়া প্রশংসনীয় কাজ নয়। কাফন দেওয়ার কথা শরীআতে বলা না হলে কাফন দেওয়াটাই সম্পদ নষ্ট করার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হতো। কারণ, কাফনের কাপড় দ্বারা মৃতব্যক্তি কোনো ধরনের উপকার পায় না এবং জীবিতদেরও কোনো লাভ হয় না। আবু বাকর সিদ্দীকের ওপর আল্লাহ দয়া করুন! তিনি তার নিজের জন্য কাফনের কাপড় নির্ধারণ করলে তাকে বলা হয় এটা তো পুরাতন কাপড়। তখন তিনি বলেন, জীবিত লোকদের নতুন কাপড়ের প্রয়োজন[৫৬৭]।[৫৬৮]

প্রশ্ন ২৭২: কবরে লাশ রাখার পর কাফনের বাঁধন খুলে ফেলা হয়। এটা কতটুকু সঠিক?

জবাব: নাঈম ইবন মাসউদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কবরে রাখার পর তিনি তার মুখ থেকে বাঁধন খুলে ফেলেন।

হাদীসটি দুর্বল। ইবন আবী শাইবাহ এক ব্যক্তির সূত্রে, আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন, আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه বলেন, আমি আলা আল-হাযরামী জানাযায় উপস্থিত হই। আমরা তাকে দাফন করার পর বাঁধন খুলতে ভুলে যাই এমনকী তাকে কবরে প্রবেশ করিয়ে দিই। এরপর আমরা তার থেকে ইট উঠাই কিন্তু কবরে কোনো কিছু দেখতে পাইনি।

ইবন আবী শাইবাহ এ ব্যাপারে বেশকিছু তাবিয়ী থেকে আরও কিছু আসার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোনো আসারই দুর্বলতা মুক্ত নয়। তবে সবগুলো আসার একত্রে করলে মনে প্রশান্তি ও আস্থা আসে যে, সালাফদের যুগে কবরে মৃতব্যক্তির কাফনের বাঁধন খুলে ফেলার প্রচলন ছিল। এ কারণে হাম্বালী মাযহাব, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বালের অনুসরণে এ মতের প্রবক্তা। ইমাম আবু দাউদ তার 'মাসাইল' (১৫৮) গ্রন্থে বলেন, আমি আহমাদ ইবন হাম্বালকে জিজ্ঞেস করি অথবা কেউ তাকে জিজ্ঞেস করে, কবরে বাঁধন খুলে ফেলা কি বৈধ? তিনি বলেন, হ্যাঁ বৈধ। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বালের ছেলে আবদুল্লাহ তার 'মাসাইল' (১৪৪/৫৩৮) গ্রন্থে বলেন, আমার ছোটো ভাই মারা যায়। আমি যখন তাকে কবরে রাখি তখন আমার পিতা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আবদুল্লাহ! বাঁধন খুলে ফেলো। তখন আমি বাঁধন খুলে ফেলি।[৫৬৯]

---

৫৬৭. সহীহুল বুখারী, ১৩৮৭

৫৬৮. সিলসিলাতুয যঈফাহ, ১২/২/৭৫৪; অধিকাংশ আলিমের মতে মহিলাদের ক্ষেত্রে পাঁচ কাপড়ে কাফন দেওয়া মুস্তাহাব। পাঁচ কাপড় হলো: ইযার বা লুঙ্গি, ওড়না, জামা ও অতিরিক্ত দুটি চাদর।-সম্পাদক (সালাফী)

৫৬৯. সিলসিলাতুয যঈফাহ, ৪/২৪৮

প্রশ্ন ২৭৩: লাশ বহন করার সময় লাশের সামনে কিংবা ডানে-বামে দিয়ে কি যাওয়া যাবে?

জবাব: লাশের সামনে, পেছনে কিংবা ডানে-বামে চলা যাবে, লাশের সাথে সাথে অথবা কাছাকাছিও চলা যাবে। তবে আরোহী ব্যক্তি পেছনে পেছনে যাবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ

বাহনে আরোহী লাশের পেছনে পেছনে চলবে এবং হেঁটে চলা ব্যক্তি লাশের পেছনে, সামনে, ডানে-বামে কিংবা সাথে সাথেও যেতে পারবে। অপূর্ণাঙ্গভাবে প্রসব হওয়া বাচ্চার জানাযা পড়তে হবে এবং তার পিতামাতার জন্য ক্ষমা ও রহমতের দুআ করতে হবে।[৫৭০]

লাশের সামনে ও পেছনে হাঁটা নবী ﷺ-এর কর্ম হিসেবে প্রমাণিত। আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাকর ও উমার লাশের সামনে ও পেছনে হাঁটতেন।[৫৭১]

তবে জানাযার পেছনে পেছনে চলা উত্তম। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ

তোমরা জানাযার অনুসরণ করো।[৫৭২]

আর অনুসরণ হয় পেছনে পেছনে। আলী ﷺ'র কথা একে আরও শক্তিশালী করে। তিনি বলেন, লাশের সামনে চলার চেয়ে পেছনে চলা তেমন বেশি উত্তম, যেমন একাকী সালাত আদায় করার চেয়ে জামাআতে আদায় করা বেশি উত্তম।[৫৭৩]

প্রশ্ন ২৭৪: জানাযা দেখে দাঁড়ানোর বিধান কী?

জবাব: দাঁড়ানো দুই প্রকার। আর উভয় প্রকার দাঁড়ানোর বিধান মানসূখ তথা রহিত বা অকার্যকর করা হয়েছে। যথা:

৫৭০. সুনানু আবী দাউদ, ৩১৮০, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
৫৭১. শারহু মাআনিয়াল আসার, ২৭৫৫, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
৫৭২. সহীহ ইবন হিব্বান, ২৯৫৫, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
৫৭৩. আহকামুল জানাইয, পৃ. ৯৫-৯৬

ক. পাশ দিয়ে জানাযা গেলে তা দেখে দাঁড়ানো।

খ. কবরে লাশ না রাখা পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত ব্যক্তিদের দাঁড়িয়ে থাকা।

মানসূখ তথা রহিত বা অকার্যকর করে দেওয়ার দলিল হচ্ছে আলী ﷺ'র হাদীস। তার হাদীস বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। যেমন:

ক. قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجَنَازَةِ فَقُمْنَا ثُمَّ جَلَسَ فَجَلَسْنَا

জানাযার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ান, আমরাও দাঁড়াতাম। অতঃপর তিনি বসেন, আমরাও বসতাম।[৫৭৪]

খ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقُومُ فِي الْجَنَائِزِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدُ

রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাযায় দাঁড়াতেন। পরবর্তীকালে তিনি বসে থাকতেন।[৫৭৫]

গ. ওয়াকিদ ইবন আমর ইবন সা'দ ইবন মুআয বলেন,

قَالَ شَهِدْتُ جَنَازَةً فِي بَنِي سَلِمَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ لِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ اجْلِسْ فَإِنِّي سَأُخْبِرُكَ فِي هَذَا بِثَبْتٍ حَدَّثَنِي مَسْعُودُ بْنُ الْحَكَمِ الزُّرَقِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَحَبَةِ الْكُوفَةِ وَهُوَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجِنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ

আমি বনু সালামা গোত্রের এক জানাযায় অংশগ্রহণ করি। আমি দাঁড়িয়ে যাই। তা দেখে নাফি ইবন জুবাইর আমাকে বলেন, বসে পড়ুন। আমি এ ব্যাপারে আপনাকে একটি প্রমাণিত হাদীস শোনাব। আমাকে মাসউদ ইবন হাকাম যুরকী বর্ণনা করেছেন, তিনি আলী ইবন আবী তালিব ﷺ থেকে কূফার মুক্তাঙ্গনে শুনেছেন। আলী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে জানাযায় দাঁড়াতে আদেশ দিতেন। পরবর্তীকালে তিনি বসে যেতেন এবং আমাদেরকে বসে যাওয়ার আদেশ দিতেন।[৫৭৬]

ঘ. قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَعَ الْجَنَائِزِ حَتَّى تُوضَعَ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، ثُمَّ قَعَدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ.

---

৫৭৪. সহীহ মুসলিম, ৯৬২; সুনানুত তিরমিযী, ১০৪৪; সুনানু ইবন মাজাহ, ১৫৪৪; সুনানু আবী দাউদ, ৩৭৫

৫৭৫. সুনানু আবী দাউদ, ৩১৭৫; আস-সুনানুল কুবরা, ৭১৩৩, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৫৭৬. মুসনাদ আহমাদ, ৬২৩

জানাযা রাখা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাযার সাথে দাঁড়াতেন। মানুষেরাও তাঁর সাথে দাঁড়াত। পরবর্তীকালে তিনি বসে যেতেন এবং তাদেরকে বসে যেতে আদেশ দিতেন।[৫৭৭]

ঙ. ইসমাঈল ইবন মাসউদ ইবন হাকাম আয-যুরকী থেকে বর্ণিত, তার পিতা বলেন,

شَهِدْتُ جِنَازَةً بِالْعِرَاقِ فَرَأَيْتُ رِجَالًا قِيَامًا يَنْتَظِرُونَ أَنْ تُوضَعَ وَرَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُشِيرُ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ بَعْدَ الْقِيَامِ

আমি ইরাকের এক জানাযায় অংশগ্রহণ করি। মানুষদের দেখলাম তারা লাশ রাখার জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। আলী ইবন আবী তালিব ﷺ'কে দেখলাম, তিনি তাদের দিকে ইশারা করছেন, আপনারা বসে যান। কারণ, নবী ﷺ আমাদের দাঁড়ানোর পর বসে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[৫৭৮]

শেষের দুই হাদীসে একেবারেই স্পষ্ট শব্দে বলে দেওয়া হয়েছে যে, লাশ রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকার বিধান রহিত হয়ে গেছে।[৫৭৯]

প্রশ্ন ২৭৫: কাদের জানাযা পড়া জায়েয তবে ওয়াজিব নয়?

জবাব: নিম্নে উল্লিখিত শ্রেণির লোকদের জানাযা পড়া জায়েয তবে ওয়াজিব নয়:

ক. যে বাচ্চা এখনো প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি এবং অকালপ্রসূত কোনো ভ্রূণ।

খ. আল্লাহর রাস্তায় মারা গেছে এমন শহীদ।

গ. আল্লাহর দণ্ডবিধি কায়েম করার কারণে যে-ব্যক্তি মারা গেছে।

ঘ. হারাম কাজে লিপ্ত পাপাচারী ও অবাধ্য ব্যক্তি। যেমন, সালাত ও যাকাত ওয়াজিব মনে করা সত্ত্বেও উভয় ত্যাগকারী, যেনাকারী, মদপানকারী বা এ জাতীয় ফাসিকদের জানাযা পড়া যাবে, তবে যারা জ্ঞানী ও দ্বীনদার তাদের উচিত এমন লোকদের জানাযায় অংশগ্রহণ না করা। যাতে এমন লোকদের মতো যারা রয়েছে তারা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। এমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ করতেন।

---

৫৭৭. শারহু মাআনিয়াল আসার, ২৭৯৯
৫৭৮. শারহু মাআনিয়াল আসার, ২৮০২, আলবানী এ হাদীসের সনদকে হাসান বলেছেন।
৫৭৯. আহকামুল জানাইয, ১০০

ঙ. যে-ব্যক্তি ঋণ রেখে মারা গেছে এবং ঋণ পরিশোধ করার মতো কোনো সম্পদ রেখে যায়নি। এমন লোকের জানাযা পড়া যাবে তবে প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জানাযা পড়েননি।

চ. জানাযা না পড়েই যাকে দাফন দেওয়া হয়েছে বা কিছু লোক জানাযা পড়ে দাফন দিয়ে দিয়েছে। এমন লোকের কবরে জানাযা পড়া যাবে। তবে দ্বিতীয় সুরতে কবরের ওপর কেবল ইমাম জানাযা পড়তে পারবেন, যদি তিনি জানাযায় অংশগ্রহণ না করে থাকেন।

ছ. কেউ এমন দেশে মারা গেছে যেখানে সরাসরি জানাযা পড়ার মতো কেউ নেই। এমন হলে একদল মুসলিম তার গায়েবানা জানাযা আদায় করবে। কারণ, নবী ﷺ নাজ্জাশীর গায়েবানা জানাযা পড়েছেন।[৫৮০]

প্রশ্ন ২৭৬: জানাযার সালাতের জামাআতের জন্য সর্বনিম্ন কতজন লোক হতে হবে?

জবাব: জানাযার সালাতের জামাআতের জন্য সর্বনিম্ন তিন জনের কথা এসেছে। আবদুল্লাহ ইবন আবী তালহার হাদীসে রয়েছে,

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ دَعَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى عُمَيْرِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حِينَ تُوُفِّيَ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَصَلَّى عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِهِمْ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَاءَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَرَاءَ أَبِي طَلْحَةَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ.

উমাইর ইবন আবু তালহা মারা গেলে আবু তালহা ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উমাইর ইবন আবু তালহার জন্য ডেকে পাঠান। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে আসেন এবং তাদের বাসায় তার জানাযার সালাত আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে যান, আবু তালহা ছিল তাঁর পেছনে আর আবু তালহার পেছনে ছিল উম্মু সুলাইম। এ তিনজন ছাড়া তাদের সঙ্গে অন্য কেউ ছিল না।[৫৮১]

একজন পুরুষ হলেও সে অন্যান্য সালাতের ন্যায় ইমামের সঙ্গে না দাঁড়িয়ে পেছনে দাঁড়াবে।[৫৮২]

প্রশ্ন ২৭৭: জানাযার সালাতে সর্বনিম্ন কত কাতার হওয়া মুস্তাহাব?

জবাব: ইমামের পেছনে তিন বা তার চেয়ে বেশি কাতার[৫৮৩] হওয়া মুস্তাহাব। কারণ, এ ব্যাপারে দুটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে:

৫৮০. আহকামুল জানাইয, ১০৪-১১৫, সংক্ষেপিত। বিস্তারিত দলিল-আদিল্লার জন্য মূল বই দেখুন।
৫৮১. শারহু মাআনিয়াল আসার, ২৮৯৮, হাদীসটিকে আলবানী মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন।
৫৮২. আহকামুল জানাইয, ১২৬, ১২৮
৫৮৩. শাওকানী বলেছেন, সর্বনিম্ন দু'জন দাঁড়ালে তাকে কাতার বলা হয়। আর সর্বোচ্চের কোনো সীমা নেই। (নাইলুল আওতার, ৪/৪৭)

ক. আবু উমারাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ وَمَعَهُ سَبْعَةُ نَفَرٍ فَجَعَلَ ثَلَاثَةً صَفًّا وَاثْنَيْنِ صَفًّا وَاثْنَيْنِ صَفًّا

নবী ﷺ জানাযার সালাত পড়ান। তাঁর সঙ্গে সাতজন লোক ছিল। তিনি প্রথম কাতারে রাখেন তিনজন, দ্বিতীয় কাতারে দুইজন এবং তৃতীয় কাতারে রাখেন দুইজন।[৫৮৪]

খ. মালিক ইবন হুবাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ أَوْجَبَ

কোনো মুসলিম মারা যাওয়ার পর তিন কাতার মুসলিম তার জানাযা পড়লে তার জন্য (জান্নাত) ওয়াজিব হয়ে যায়।[৫৮৫] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

মারসাদ ইবন আবদুল্লাহ আল-ইয়াযনী বলেন, জানাযায় লোক কম হয়ে গেলে হাদীসটির কারণে মালিক লোকদের তিন কাতারে ভাগ করে দিতেন।[৫৮৬]

প্রশ্ন ২৭৮: যদি একাধিক মাইয়্যেতের জানাযা একসঙ্গে হয় তবে কার লাশ কোথায় রাখতে হবে?

জবাব: যদি একাধিক নারী-পুরুষের কফিন একসঙ্গে হয়, তবে সবার একসঙ্গে একবার জানাযা পড়তে হবে। এক্ষেত্রে পুরুষদের কফিন ইমামের দিকে রাখতে হবে যদিও পুরুষ বাচ্চা হয় আর নারীদেরকে কিবলার দিকে রাখতে হবে। এ ব্যাপারে একাধিক হাদীস রয়েছে:

ক. নাফি বলেন, তার ধারণা মতে, ইবন উমার ﷺ একত্রে ৯ জনের জানাযার সালাত আদায় করেছিলেন। পুরুষদের জানাযা ইমামের সম্মুখে আর মহিলাদের জানাযা কিবলার দিকে রেখেছিলেন। সমস্ত জানাযা এক কাতারে রাখা ছিল। উম্মু কুলসুম বিনত আলী, উমার ইবন খাত্তাবের স্ত্রী এবং যাইদ নামে তার এক ছেলে, তাদের জানাযা একত্রে রাখা হয়েছিল। সেদিন ইমাম ছিলেন, সাঈদ ইবন আস। আর উপস্থিত লোকদের মধ্যে ছিলেন ইবন উমার, আবু হুরাইরাহ, আবু সাঈদ ও আবু কাতাদা প্রমুখ। ইমামের সম্মুখে পুরুষদের রাখা হয়েছিল।

৫৮৪. আল-মুজামুল কাবীর, ৭৭৮৫, আলবানী হাদীসটিকে শাহেদের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য বলেছেন।
৫৮৫. সুনানু আবী দাউদ, ৩১৬৮; সুনানুত তিরমিযী, ১০২৮; আস-সুনানুল কুবরা, ৭১৫৪, আলবানী হাদীসটিকে শাহেদের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য বলেছেন।
৫৮৬. আহকামুল জানাইয, ১২৭

বর্ণনাকারী বলেন, এক ব্যক্তি বলল, (পুরুষদের জানাযা ইমামের সম্মুখে রাখা) আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ইবন আব্বাস, আবু হুরাইরাহ, আবু সাঈদ ও আবু কাতাদার দিকে তাকালাম, আর বললাম, এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত কী? তারা বললেন, এটাই সুন্নাত।[৫৮৭]

খ. হারিস ইবন নাওফালের মুক্তদাস আম্মার থেকে বর্ণিত, তিনি উম্মু কুলসুম ও তার পুত্রের জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। ছেলেকে ইমামের সম্মুখে রাখা হলে আমি তার প্রতিবাদ করি। উপস্থিত লোকদের মধ্যে ইবন আব্বাস, আবু সাঈদ খুদরী, আবু কাতাদাহ ও আবু হুরাইরাহ ছিলেন। তারা বলেন, এটাই সুন্নাত[৫৮৮]।[৫৮৯]

প্রশ্ন ২৭৯: জানাযার সালাতে কতটি পর্যন্ত তাকবীর দেওয়া যায়?

জবাব: জানাযার সালাতে চার থেকে নিয়ে নয়টি পর্যন্ত তাকবীর দেওয়া যায়।[৫৯০]

প্রশ্ন ২৮০: জানাযার সালাত এক সালামে না কি দুই সালামে আদায় করতে হবে?

জবাব: ফরয সালাতের ন্যায় ডানদিকে এবং বামদিকে দুই সালাম ফেরাবে। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ثَلاَثُ خِلاَلٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَفْعَلُهُنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ إِحْدَاهُنَّ التَّسْلِيمُ عَلَى الْجَنَازَةِ مِثْلَ التَّسْلِيمِ فِى الصَّلاَةِ.

তিনটি বৈশিষ্ট্য বা কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ করতেন যা মানুষেরা ছেড়ে দিয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, সালাতে সালাম ফেরানোর ন্যায় জানাযায় সালাম ফেরানো।[৫৯১]

সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ থেকে প্রমাণিত আছে, নবী ﷺ সালাতে দুই সালাম ফেরাতেন। অতএব, এখান থেকে প্রমাণ হয়, উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত 'সালাতে সালাম ফেরানোর ন্যায়' দ্বারা উদ্দেশ্য দুই সালাম।

---

৫৮৭. সুনানুন নাসায়ী, ১৯৮২, হাদীসটিকে আলবানী সহীহ বলেছেন।

৫৮৮. সুনানু আবী দাউদ, ৩১৯৩, হাদীসটিকে আলবানী সহীহ বলেছেন।

৫৮৯. আহকামুল জানাইয, ১৩২

৫৯০. সিলসিলাতুয যঈফাহ, ৭/৮৭; দলিলসহ বিস্তারিত জানতে দেখুন, আহকামুল জানাইয, ১৪১-১৪৪

৫৯১. আস-সুনানুল কুবরা, ৭২৩৯, আলবানী হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন।

তবে এটাও সম্ভাবনা আছে যে, তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন, এক সালাম ফেরাতেন। কারণ, সালাতে এক সালাম ফেরানোও নবী ﷺ-এর সুন্নাত। তিনি কখনো এক সালাম ফেরাতেন আবার কখনো দুই সালাম ফেরাতেন। তবে বেশিরভাগ সময় দুই সালাম ফেরাতেন। কিন্তু উল্লিখিত হাদীস দ্বারা এক সালাম উদ্দেশ্য নেওয়ার সম্ভাবনা দূরবর্তী। কারণ, এক সালাম ফেরানো নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত হলেও ইবন মাসউদ ﷺ তা বর্ণনা করেননি। অতএব, মনে হয় না, 'সালাতে সালাম ফেরানোর ন্যায়' দ্বারা এক সালাম ফেরানো উদ্দেশ্য। আল্লাহু আলাম।

দুই সালাম ফেরানোর পক্ষে মত দিয়েছে হানাফী মাযহাব, যেমনটি 'আল-মাবসূত' ২/৬৫ গ্রন্থে রয়েছে। আহমাদ ইবন হাম্বালের এটি একটি মত, যেমনটি 'আল-ইনসাফ' ২/৫২৫ গ্রন্থে রয়েছে। এটি শাফিয়ী মাযহাবেরও মত, যেমনটি 'শারহু ইবন কাসিম গুযযী' ১/৪৩১ গ্রন্থে রয়েছে। তবে তিনি বলেছেন, 'ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ' পর্যন্ত বৃদ্ধি করা মুস্তাহাব।

এক সালাম ফেরানোও জায়েয। আবু হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً.

রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাযার সালাত পড়ান। তিনি তাতে চার তাকবীর দেন এবং এক সালাম ফেরান।[৫৯২]

এই মতকে শক্তিশালী করে একদল সাহাবীর আমল। ইমাম হাকিম উপর্যুক্ত হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন, এক সালামের পক্ষে আলী ইবন আবী তালিব, আবদুল্লাহ ইবন উমার, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, জাবির ইবন আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবন আবী আওফা ও আবু হুরাইরাহ থেকে সহীহ বর্ণনা রয়েছে। তারা সবাই জানাযায় এক সালাম ফেরাতেন।

ইমাম যাহাবীও হাকিমের সাথে একমত পোষণ করেছেন। বাইহাকী উল্লিখিত অধিকাংশ আসারের সনদ উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি ওয়াসিলা ইবন আসকা, আবু উমামাহ এবং অন্যান্য সাহাবীকেও যুক্ত করেছেন।

তবে আবদুল্লাহ ইবন আবী আওফার বর্ণনার শুদ্ধতা নিয়ে আমার আপত্তি রয়েছে। কারণ, তার বর্ণনার সনদে জাররাহ ইবন মুলাইহ নামক একজন রয়েছেন। আর তিনি ছিলেন দুর্বল। তবে হাকিমের কাছে আরেকটি সনদ রয়েছে।[৫৯৩]

৫৯২. আস-সুনানুল কুবরা, ৭২৩৩; সুনানুদ দারাকুতনী, ১, আলবানী হাদীসটির সনদকে হাসান বলেছেন।
৫৯৩. আহকামুল জানাইয, ১৬৩

প্রশ্ন ২৮১: শোকপত্র বা পত্রের মাধ্যমে কি শোক প্রকাশ করা যাবে?

জবাব: শোকপত্র না পাঠিয়ে সরাসরি তার বাসায় বা তার ব্যবসাকেন্দ্রে বা তার প্রতিষ্ঠানে কেন যাবে না?

প্রশ্নকারী: যদি সে দূরে কোথাও থাকে, যেমন, সৌদি আরবে?

জবাব: আপনি যেমনটা উল্লেখ করলেন, তেমনটি হলে পত্রের মাধ্যমে শোকপ্রকাশ করবে।[৫৯৪]

প্রশ্ন ২৮২: কবরের পাশে কি কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে?

জবাব: নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয়, তিনি বলেছেন,

مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَرَأَ عِنْدَهُ يٰس غَفَرَ اللهُ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا

যে-ব্যক্তি প্রতি জুমআ পিতামাতা বা উভয়ের একজনের কবর যিয়ারত করে এবং তার পাশে সূরা ইয়াসিন পড়ে, তার প্রতিটি হরফের বিনিময়ে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।

হাদীসটি থেকে প্রমাণ হয়, কবরের পাশে কুরআন তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। কিন্তু হাদীসটি বানোয়াট। সহীহ হাদীসে উক্ত হাদীসটির পক্ষে কোনো কিছু নেই। বরং সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণ হয়, কবরের পাশে শুধু কবরবাসীকে সালাম দেওয়া এবং যিয়ারতের মাধ্যমে পরকালকে স্মরণ করা শরীআতসম্মত। এমনটাই ছিল সালাফদের আমল। তাই কবরের পাশে কুরআন তিলাওয়াত করা ঘৃণিত বিদআত। একে দ্ব্যর্থহীনভাষায় পূর্ববর্তী একদল আলেম বিদআত বলেছেন। যেমন: আবু হানীফা, মালিক ও এক বর্ণনানুযায়ী আহমাদ; যেমনটি যাবীদীর 'শারহুল ইয়াহইয়া' ২/২৮৫ গ্রন্থে রয়েছে। আহমাদ ইবন হাম্বাল বলেন, এ ব্যাপারে হাদীসে কোনো কিছু বর্ণিত হয়নি। মুহাম্মাদ ইবন হাসান ও আহমাদ ইবন হাম্বালের আরেক বর্ণনা মতে কুরআন তিলাওয়াত করা মাকরূহ নয়। কারণ, ইবন উমার ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি অসিয়াত করেন, তাকে দাফন করার সময় যেন তার কবরে সূরা বাকারাহ ও তার শেষ আয়াতগুলো পড়া হয়। আমি বলব, ইবন উমার ﷺ থেকে এই আসার সহীহ সনদে প্রমাণিত নয়। আর সহীহ মনে করা হলেও তা থেকে সর্বোচ্চ প্রমাণ হয়, শুধু দাফনের সময় তিলাওয়াত করা যাবে; সবসময় তিলাওয়াত করা যাবে প্রমাণ হয় না। অতএব, হে মুসলিম! আপনি সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরুন এবং বিদআত পরিহার করুন; যদিও বিদআতকে মানুষেরা ভালো মনে করে। কারণ, প্রতিটি বিদআত ভ্রষ্টতা, যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন।[৫৯৫]

৫৯৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৯/২৩৬
৫৯৫. সিলসিলাতুয যঈফাহ, ১/১২৮

প্রশ্ন ২৮৩: পুরাতন কবর তুলে ফেলে দিয়ে তাতে কি নতুন কবর দেওয়া যাবে? আর কতদিন পর পুরাতন কবর তুলে ফেলা যায়? প্রয়োজন ছাড়াই কি পুরাতন কবর তুলে ফেলা যায়?

জবাব: কবরস্থিত লাশ যদি ক্ষয় হয়ে যায় বা মাটি হয়ে যায় তবে তুলে ফেলা জায়েয। আর যদি ক্ষয় না হয় বা পুরোপুরিভাবে মাটি না হয়, তবে জায়েয নয়।

আর কতদিন পর তোলা যাবে তা নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো কিছুই নেই। বরং জমিনের ভিন্নতায় তার সময় ভিন্নভিন্ন হবে। কোনো জমিনে লাশ খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যায়, আবার কোনো জমিন দীর্ঘদিন লাশকে অক্ষত রাখে। অতএব, এ বিষয়টি সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে জানা যাবে। যারা যে এলাকার লোক তারা সেই এলাকা সম্পর্কে বেশি বলতে পারবে।

আর লাশ ক্ষয় হয়ে যাওয়ার পর বা মাটি হয়ে যাওয়ার পর অন্যান্য লাশ দাফন করার জন্য বিনা প্রয়োজনে পুরাতন লাশ তুলে ফেলা যাবে।[৫৯৬]

প্রশ্ন ২৮৪: অনেক জায়গায় দেখা যায়, লাশ দাফন করার পর কবরের ওপর সবুজ-কাচা ডাল পুঁতে দেওয়া হয়। তারা মনে করে, এর মাধ্যমে কবরের আযাব বন্ধ থাকে। এ কাজ কতটুকু সঠিক?

জবাব: ইবন আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একদিন দুটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সেসময় তিনি বলেন, এদের আযাব দেওয়া হচ্ছে, তবে কোনো গুরুতর অপরাধের কারণে তাদের আযাব দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না, আর অপরজন চুগলি করে বেড়াত। তারপর তিনি একখানা কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে ভেঙে দুভাগ করেন এবং উভয় কবরের ওপর একখানা করে গেড়ে দেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেন এমন করলেন? তিনি বলেন, আশা করা যায়, যতদিন পর্যন্ত এ দুটি ডাল শুকিয়ে না যায়, ততদিন পর্যন্ত তাদের আযাব কিছুটা হালকা করা হবে।[৫৯৭]

এ হাদীসের কারণে অনেকে মনে করেন, আযাব হালকা করা হয়েছিল উভয় ডালের আর্দ্রতা ও সজীবতার কারণে। তাদের এমন ধারণা সঠিক নয়। যদি এমনটাই হতো তবে তিনি ডালটাকে দুই ভাগে ভাগ করতেন না। কারণ, দুইভাগে ভাগ করার কারণে ডাল আরও তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে; যা অজানা নয়। সঠিক কথা হচ্ছে, তাদের আযাব হালকা করা হয়েছিল নবী ﷺ-এর

৫৯৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৯/৩৫৫-৩৫৬, পরিমার্জিত।
৫৯৭. সহীহুল বুখারী, ২১৮

শাফাআত ও দুআর কারণে। আল্লাহ তাআলা সেই দুআ ও শাফাআত কবুল করেছিলেন ডাল শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। আর্দ্রতা ও সজীবতা ছিল আযাব হালকা হওয়ার আলামত; কারণ নয়। এর প্রমাণ হচ্ছে সহীহ মুসলিমে ৭/২৩৫ বর্ণিত জাবির ﷺ'র বর্ণিত লম্বা হাদীস। তাতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِيْ أَن يُرَفَّهَ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ

দুটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় আমি দেখেছি তাদের কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। আমি তাদের জন্য সুপারিশ করার ইচ্ছা করছি। সম্ভবত তাদের আযাব কমিয়ে দেওয়া হবে যতক্ষণ পর্যন্ত ডাল দুটি সতেজ থাকবে।[৫৯৮]

এ কারণে সেই দিনটি ছাড়া নবী ﷺ কবর যিয়ারতের সময় আর ঐ কাজ করতেন বলে জানা যায় না। তাঁর সাহাবী এবং কোনো সালাফও এ কাজ করতেন বলে জানা যায় না। বরং এর বিপরীতে যারা বর্তমানে কবরের ওপর সজীব কিছু দেয়, ইমাম খাত্তাবী তাদের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এর কোনো ভিত্তি নেই।'

আর আমি এ বিষয়ে 'আহকামুল জানাইয ও বিদউহা' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আরও দেখুন তিরমিযী ১/১০৩ গ্রন্থে আহমাদ শাকিরের টীকা।[৫৯৯]

অন্যান্য সালাত

প্রশ্ন ২৮৫: তারাবীর সালাতে কি মহিলারা অংশগ্রহণ করতে পারবে? তাদের জন্য স্বতন্ত্র ইমাম নিয়োজিত করার বিধান কী?

জবাব: তারাবীর সালাতে মহিলাদের অংশগ্রহণ করা শরীআতসম্মত, যেমনটি আবু যার ﷺ হাদীসে বলা হয়েছে।[৬০০] পুরুষদের ইমাম ব্যতিরেকে তাদের জন্য স্বতন্ত্র ইমাম নির্ধারণ করা জায়েয। প্রমাণিত আছে, উমার ﷺ যখন তারাবীর জামাআতের ব্যবস্থা করেন তখন পুরুষদের জন্য উবাই ইবন কাবকে আর মহিলাদের জন্য সুলাইমান ইবন আবু হাসমাহকে ইমাম হিসেবে নিযুক্ত করেন।

---

৫৯৮. সহীহ মুসলিম, ৭৪০৮
৫৯৯. মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/১১০
৬০০.

আরফাজাহ আস-সাকাফী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী ﷺ মানুষদেরকে রামাদানের কিয়াম করার আদেশ দিতেন এবং পুরুষদের একজন আর মহিলাদের জন্য আরেকজনকে ইমাম নিযুক্ত করতেন। আর আমি মহিলাদের ইমাম থাকতাম।[৬০১]

তবে আমার মতে আলাদা ইমাম তখন নিয়োজিত করা যাবে যখন মসজিদ হবে প্রশস্ত; যেন একজনের কারণে অন্যজনের সালাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়।[৬০২]

প্রশ্ন ২৮৬: তারাবীতে খতমে কুরআনের দুআ করার বিধান কী? এর কি কোনো ভিত্তি আছে?

জবাব: না, এর কোনো ভিত্তি নেই।

প্রশ্নকারী: তারাবীহ ছাড়া সাধারণভাবে খতমে কুরআনের দুআ করা যাবে?

জবাব: কোনো মুসলিম কুরআন খতম করলে সুন্নাত বা মুস্তাহাব হচ্ছে, সে তার পরিবার নিয়ে দুআ করবে। আদতে এভাবে তারাবীর সালাতে লম্বা-চওড়া দুআ করার কোনো ভিত্তিই নেই।[৬০৩]

প্রশ্ন ২৮৭: রামাদান ছাড়া অন্যান্য মাসে কিয়ামুল লাইল কি জামাআতবদ্ধভাবে আদায় করা যাবে?

জবাব: পরিকল্পনা করে হলে শরীআতসম্মত নয় আর পরিকল্পনা ছাড়া হলে শরীআতসম্মত। অর্থাৎ রামাদান মাস ছাড়া অন্যান্য মাসে কিয়ামুল লাইলের জন্য মানুষকে সমবেত করা জায়েয নয়; কেউ মানুষকে ডাকবে, চলুন আমরা অমুক বাসায় জামাআতে সালাত আদায় করব- এমনটা করা যাবে না। তবে সালাতের জন্য পরিকল্পনা করা ছাড়াই যদি কিছু লোক একত্র হয়, তবে তাদের কেউ ইমাম হয়ে জামাআতে সালাত আদায় করতে পারে।

প্রশ্নকারী: রামাদান মাস ছাড়া অন্যান্য মাসে স্বামী-স্ত্রী জামাআত করতে পারে?

জবাব: না, পারবে না। তবে হঠাৎ-হঠাৎ করতে পারে।[৬০৪]

---

৬০১. উমার ও আলীর উভয় হাদীস বর্ণনা করেছেন বাইহাকী, ২/৪৯৪; মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, ৪/২৫৭/৮৭২২; ইবন নাসর কিয়ামু রামাদান, পৃ. ৯৩

৬০২. কিয়ামু রমাদান, পৃ. ২১

৬০৩. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৭/১২৭

৬০৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৭/১৩২

প্রশ্ন ২৮৮: বিতর সালাতে দুআয়ে কুনুত কখন পড়া সুন্নাত-রুকুর আগে না পরে?

জবাব: বিতর সালাতে রুকুর আগে দুআয়ে কুনুত পড়া সুন্নাত। তবে রুকুর পরে পড়া জায়েয।[৬০৫]

প্রশ্ন ২৮৯: বিতর সালাতে 'আল্লাহুম্মাহদিনী ফিমান হাদাইতা' যে দুআটি বর্ণিত হয়েছে, সেই দুআ ছাড়া আর অন্য দুআ কি বৃদ্ধি করা যাবে?

জবাব: হাসানকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দুআয়ে কুনুত শিক্ষা দেন[৬০৬] সেই দুআ ছাড়া বিতর সালাতে অন্য কোনো দুআ শরীআতসম্মত নয়। কতক সালাফের অনুসরণার্থে উক্ত দুআর শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর দরুদ পড়া শরীআতসম্মত হবে। উক্ত দুআর বাইরে অন্য দুআ বৃদ্ধি করা মানে মাসনুন দুআতে কোনো কিছু বৃদ্ধি করা। আর এ কাজ শরীআতসম্মত নয়। তবে শত্রুরা যদি কোনো মুসলিম দেশ আক্রমণ করে তখন সেই ঘটনার সাথে সঙ্গতি রেখে অন্যান্য দুআ বৃদ্ধি করা জায়েয। কিন্তু সাধারণ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক শিক্ষা দেওয়া দুআতে আমরা কোনো কিছু বৃদ্ধি করব না।

প্রশ্নকারী: বৃদ্ধি করা কি বিদআত হবে?

জবাব: অবশ্যই। বৃদ্ধি করার বৈধতা দেওয়ার মতো যদি কোনো ঘটনা না ঘটে যেমন বললাম কুনুতে নাযিলাহ-তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক শিক্ষা দেওয়া জিনিসের ওপর কোনো কিছু বাড়তি যোগ করা হলে তা বৃদ্ধি বলে গণ্য হবে। আর ইবাদতে কোনো কিছু বৃদ্ধি করাই হলো বিদআত।

প্রশ্নকারী: যেমন আপনি জানেন রামাদান মাসে প্রত্যেক মসজিদে বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে?

জবাব: কেনই বা আমি জানব না? মসজিদে হারাম এই বিদআতটা সব দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে। আমি এটা জানি। কোনো ঘটনার কারণ ছাড়া এ বৃদ্ধি জায়েয নয়।

প্রশ্নকারী: অনেক মানুষ এই দুআ এত লম্বা করে যে, আধাঘন্টার বেশি দুআ করে।

জবাব: হ্যাঁ, সন্দেহ ও সংশয় ছাড়াই তা বিদআত। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষ তা-ই অনুসরণ করে যাতে তারা অভ্যস্ত। অতএব, আমাদের সুন্নাহর দিকে ফিরে আসা ওয়াজিব।[৬০৭]

---

৬০৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৭/১৫৬

৬০৬. আল্লাহুম্মাহদিনী ফিমান হাদাইতা... দুআটি রাসূলুল্লাহ ﷺ শিক্ষা দেন।—সংকলক

৬০৭. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৭/১৯৫

প্রশ্ন ২৯০: সূর্যগ্রহণের সালাত পড়ার বিধান কী?

জবাব: 'ফিকহুস সুন্নাহ' গ্রন্থকার সাইয়্যিদ সাবিক বলেন, আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সূর্যগ্রহণের সালাত নারী-পুরুষের জন্য সুন্নাতে মুআক্কাদা।

ইমাম আলবানী সাইয়্যিদ সাবিকের খণ্ডনে বলেন, এখানে দুটি বিষয় রয়েছে:

ক. আলেমদের একমত হওয়ার দাবি বাতিল। আবু আওয়ানাহ তার 'সহীহ' ২/৩৯৮ গ্রন্থে বলেন, 'সূর্যগ্রহণের সালাত ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কিত আলোচনা।' এরপর আবু আওয়ানাহ কিছু হাদীস উল্লেখ করেন, যেসব হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণের সালাত আদায় করতে আদেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا

যখন তোমরা সূর্যগ্রহণ দেখবে তখন সালাত আদায় করো।

ইবন খুযাইমাহ তার 'সহীহ'-তে যে নীতি অবলম্বন করেছেন, তা থেকে বোঝা যায় তার মতেও সূর্যগ্রহণের সালাত ওয়াজিব। তিনি 'সহীহ ইবন খুযাইমাহ' ২/৩০৮ গ্রন্থে বলেন, 'সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময় সালাত আদায়ের আদেশ সংক্রান্ত অধ্যায়।' তিনিও এ সংক্রান্ত কিছু হাদীস উল্লেখ করেন যেসব হাদীসে এ সালাত আদায়ের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর 'সহীহ ইবন খুযাইমাহ'-তে ইমাম ইবন খুযাইমার নীতি হচ্ছে, তার কাছে যে 'আদেশ' 'ওয়াজিব' প্রমাণ করে না, তিনি সেটা অধ্যায়েই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দেন।

অতএব, প্রমাণ হয়, এটি একটি ইখতিলাফী মাসআলা। এ কারণে ইবন হাজার আসকালানী 'ফাতহুল বারী' ২/৫২৭ গ্রন্থে বলেন, অধিকাংশ আলেমের মতে তা সুন্নাতে মুআক্কাদা। তবে আবু আওয়ানাহ স্পষ্টভাবে তা ওয়াজিব বলেছেন। তিনি ছাড়া কেউ ওয়াজিব বলেছেন বলে জানি না। তবে কারো থেকে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি এ সালাতকে জুমআর সালাতের মতোই মনে করতেন। আর যাইন ইবন মুনীর আবু হানীফা থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি এ সালাতকে ওয়াজিব বলেছেন। কোনো হানাফী লেখকও একে ওয়াজিব বলে উদ্ধৃত করেছেন।

আমি বলব, নিম্নের কারণে ওয়াজিব হওয়ার মত প্রাধান্যযোগ্য:

যদি এ সালাতকে সুন্নাত বলা হয় তবে এ সালাতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যে অনেক আদেশের কথা বর্ণিত হয়েছে সেসব আদেশকে নষ্ট করা হয়। অথচ আদেশ দ্বারা মৌলিকভাবে যে ওয়াজিব বোঝায় তা পরিবর্তন করার কোনো প্রমাণ নেই। ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে মত

দিয়েছেন শাওকানী তার 'আস-সাইলুল জাররার' ১/৩২৩ গ্রন্থে। সিদ্দীক হাসান খান 'আর-রওযাদুন নাদিয়্যাহ' গ্রন্থে এ মতকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ এটাই হক।[৬০৮]

প্রশ্ন ২৯১: সূর্যগ্রহণের সালাতে রুকু সংখ্যা কত?

জবাব: সূর্যগ্রহণের সালাতের রুকুর সংখ্যা নিয়ে হাদীসে চরম মতপার্থক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে সর্বনিম্ন সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে, দুই রাকাআতেই একটি একটি করে রুকু। আর সর্বোচ্চ সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে, পাঁচ রুকু। তবে সঠিক হচ্ছে, প্রতি রাকাআতে দুই রুকু; যেমনটি আবুয যুবাইরের সূত্রে জাবির ﷺ'র হাদীসে রয়েছে। বুখারী-মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আয়েশাহসহ অন্যান্য সাহাবী থেকে এটি প্রমাণিত।[৬০৯]

প্রশ্ন ২৯২: সালাতুত তাসবীহ কি পড়া যাবে? নবী ﷺ কি সালাতুত তাসবীহ পড়েছেন?

জবাব: নবী ﷺ নিজে সালাতুত তাসবীহ পড়েছেন বলে বর্ণিত হয়নি। তবে তাঁর থেকে এমন অনেক হাদীস এসেছে সেসব হাদীসে তিনি এ সালাতের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। যেমন ইবনে আব্বাসের হাদীস, নবী ﷺ তাঁর চাচা আব্বাসকে বলেন, হে আব্বাস! হে আমার চাচা! আমি কি আপনাকে দান করব না? আমি কি আপনাকে উপহার দিব না? আমি কি আপনার দশটি মহৎ কাজ করে দেব না? আপনি যখন সেই কাজগুলো বাস্তবায়ন করবেন, তখন আল্লাহ আপনার প্রথম ও শেষ, অতীত ও বর্তমান, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত, ছোটো ও বড়ো এবং প্রকাশ্য ও গোপন সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

সেই দশটি মহৎ কাজ হচ্ছে, আপনি চার রাকাআত সালাত আদায় করবেন। প্রতি রাকাআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বেন। আপনি প্রথম রাকাআতে কিরাআত শেষ করার পর দাঁড়ানো অবস্থায় পনেরোবার বলবেন, 'সুবহানাল্লাহ ওয়াল-হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার', অতঃপর রুকু করবেন এবং রুকু অবস্থায় তা দশবার বলবেন। আবার রুকু হতে মাথা উঠিয়ে তা দশবার বলবেন। অতঃপর সাজদায় যাবেন এবং সাজদা অবস্থায় তা দশবার বলবেন। অতঃপর সাজদা হতে মাথা উঠিয়ে তা দশবার বলবেন। আবার সাজদা করবেন, সেখানে তা বলবেন দশবার। অতঃপর সাজদা হতে মাথা তুলে তা বলবেন দশবার। এ নিয়মে প্রত্যেক রাকআতে তাসবীহর সংখ্যা হবে ৭৫ বার এবং এটা অব্যাহত রাখুন পূর্ণ চার রাকআতে (এতে পুরো সালাতে তাসবীহর সংখ্যা হবে ৩শ' বার)।

৬০৮. তামামুল মিন্নাহ, পৃ. ২৬১
৬০৯. ইরওয়াউল গালীল, ২৬২ নং হাদীসের অধীনে।

আপনার পক্ষে সম্ভব হলে উক্ত সালাত দৈনিক একবার আদায় করুন। অন্যথায় সপ্তাহে একবার, তাও সম্ভব না হলে মাসে একবার। এটাও সম্ভব না হলে বছরে একবার। যদি তাও না হয় তবে সারা জীবনে অন্তত একবার আদায় করুন।[৬১০]

পূর্ব থেকেই এ হাদীস নিয়ে মুহাদ্দিসদের মাঝে লম্বা মতপার্থক্য রয়েছে। তবে আমার কাছে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে, সবগুলো সনদের ভিত্তিতে হাদীসটি প্রমাণিত।[৬১১]

প্রশ্ন ২৯৩: ইসতিসকার সালাতে আগে খুতবা না কি আগে সালাত?

জবাব: হাদীসে এসেছে, আল্লাহর নবী ﷺ একদিন ইসতিসকার সালাতের জন্য বের হন। তিনি আমাদের নিয়ে আযান ও ইকামত ছাড়াই দুই রাকাআত সালাত আদায় করেন, তারপর খুতবা দেন। অতঃপর নিজের চেহারাকে কিবলার দিকে করে হাত উত্তোলন করে আল্লাহর কাছে দুআ করেন। এরপর তিনি চাদর পরিবর্তন করে চাদরের ডানদিক বামদিকে করেন আর বামদিক ডানদিকে করেন।[৬১২]

সালাতের পর খুতবা দেওয়া সংক্রান্ত উল্লিখিত হাদীসটি মুনকার বা আপত্তিকর। উক্ত মুনকার হাদীসের ওপর আমল করে মালিকী ও শাফিয়ী মাযহাব। তাদের মতে সালাতের পর খুতবা দিতে হবে। এ ব্যাপারে ইমাম মালিক মুআত্তাতে ও ইমাম শাফিয়ী 'আল-উম্ম'-এ স্পষ্ট মত দিয়েছেন। তাদের অনুসরণ করেছেন ইমাম আবু ইউসুফ, যেমনটি আবু জাফর তাহাবী তার থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি ইসতিসকার সালাতকে ঈদের সালাতের সঙ্গে কিয়াস করেছেন। অথচ তিনি জানেন এ কিয়াস একাধিক সহীহ হাদীসবিরোধী। আর তিনি সেসব হাদীস বর্ণনাও করেছেন।

ফিকহের স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার হচ্ছে, স্পষ্ট দলিলের বিপরীতে ইজতিহাদ ও কিয়াস চলে না। এই মাসআলায় সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হলেন ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসান। তিনি এ মাসআলায় সুন্নাহর অনুকূলে রয়েছেন। তিনি তার 'আল-হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদীনা' গ্রন্থে তাদের মতামত উল্লেখ করেছেন (যেমনটা আমি মালিক থেকে উল্লেখ করলাম), এরপর তিনি বলেন, 'এখন পর্যন্ত মদীনাবাসীরা বলেন, জুমআর ন্যায় ইমাম সালাতের পূর্বে খুতবা দ্বারা ইসতিসকা সূচনা করবেন।' অতঃপর তিনি বলেন, 'আমার কাছে মদীনাবাসীদের প্রথম মতের তুলনায় শেষ মত বেশি প্রিয়।'[৬১৩]

৬১০. সুনানু আবী দাউদ, ১২৯৭
৬১১. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৭/২৯৬-২৯৭
৬১২. সুনানু ইবন মাজাহ, ১২৬৮
৬১৩. সিলসিলাতুয যঈফাহ, ১২/১/২৮৯

প্রশ্ন ২৯৪: ইসতিসকার সালাতে মুসল্লীরাও কি চাদর পরিবর্তন করবে?

জবাব: মুসল্লীদের চাদর পরিবর্তনের ব্যাপারে আমার যতটুকু স্মরণ আছে, তা প্রমাণিত নয়। তবে ইমামের চাদর পরিবর্তন করা সুন্নাত।[৬১৪]

প্রশ্ন ২৯৫: ইসতিখারার সালাতে ইসতিখারার দুআ কখন বলতে হবে; সালামের আগে, না সালামের পরে, না কি সাজদায়?

জবাব: না, আমি মনে করি সালাতের পর। কারণ, সহীহুল বুখারীতে জাবির ﷺ'র হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের যাবতীয় বিষয়ে ইসতিখারা শিখিয়ে দিতেন, যেভাবে তিনি আমাদের কুরআনের সূরা শিখিয়ে দিতেন। নবী ﷺ বলেন, যখন তোমরা কোনো বিষয়ের চিন্তা করবে তখন ফরয সালাত ছাড়াই আল্লাহর জন্য দুই রাকাআত সালাত আদায় করবে। এরপর বলবে, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসতাখীরুকা বি-ইলমিকা ওয়া আসতাকদিরুকা বিকুদরাতিকা...।[৬১৫]

খেয়াল করুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যেন দুই রাকাআত সালাত আদায় করে তারপর বলবে...।' এখান থেকে বোঝা যায়, যদিও আমরা একে স্পষ্ট প্রমাণ না বলি-দুআ করতে হবে সালাতের পর।[৬১৬]

প্রশ্ন ২৯৬: কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সাহু সাজদা না দিলে তার সালাত কি বাতিল হয়ে যাবে?

জবাব: কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সাহু সাজদা না দিলে তার সালাত বাতিল হবে না, তবে সে গুনাহগার হবে। কারণ, আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহু সাজদা প্রদানের যে আদেশ দিয়েছেন, সে তা লঙ্ঘন করেছে।[৬১৭]

প্রশ্ন ২৯৭: সালাতুল হাজাতের ব্যাপারে কি কোনো হাদীস আছে?

জবাব: এ ব্যাপারে সহীহ হাদীসে কিছুই নেই। হাদীস এসেছে তবে তা সহীহ নয়।[৬১৮]

---

৬১৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৭/৩১০
৬১৫. সহীহুল বুখারী, ১১৬২
৬১৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৭/৩১৭-৩১৮
৬১৭. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৭/৩৪৭
৬১৮. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৭/৩৩১

প্রশ্ন ২৯৮: ইমামের পেছনে মুক্তাদীরা কোনো কিছু ভুল করলে তাদের কি সাহু সাজদা দিতে হবে?

জবাব: ইবন উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ وَإِنْ سَهَا مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ وَالْإِمَامُ كَافِيهِ

ইমামের পেছনে যে থাকবে তার কোনো সাহু সাজদা নেই। ইমাম ভুল করলে ইমাম ও তার পেছনে মুক্তাদীদের সাহু সাজদা দিতে হবে। আর যে ইমামের পেছনে আছে সে ভুল করলে তাকে সাহু সাজদা দিতে হবে না; ইমামই তার জন্য যথেষ্ট।[৬১৯]

হাদীসটি দুর্বল। যাইদিয়্যাহ ফিরকার ইমাম হাদীর মত হচ্ছে, মুক্তাদী তার সালাতে ভুল করলে তাকে সাহু সাজদা দিতে হবে। তার এ মত অধিকাংশের বিপরীত। এ দিকে সানআনীর ঝোঁক রয়েছে। তিনি বলেন, এ হাদীস সহীহ হলে সাহু সাজদার অন্যান্য ব্যাপক হাদীসকে এ হাদীস খাস করে দেবে। আর সহীহ না হলে হাদীর কথা সঠিক।

আমি বলব, আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে সালাত আদায় করতেন। তারা তাঁর পেছনে এমন ভুল করতেন যে, ঐ ভুল একাকী সালাতে করলে তাদের ওপর সাহু সাজদা ওয়াজিব ছিল। এ দাবির সত্যতা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। ভুল করার পরও নবী ﷺ-এর সালাম ফেরানোর পর কোনো সাহাবী সাহু সাজদা দিয়েছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায় না। সাহু সাজদা দেওয়া শরীআতসম্মত হলে তারা সাহু সাজদা দিতেন। আর সাহু সাজদা দিলে তারা তা বর্ণনা করতেন। এ ব্যাপারে কোনো কিছু বর্ণিত না হওয়া প্রমাণ করে তা শরীআতসম্মত নয়। এ বিষয়টি স্পষ্ট ইনশাআল্লাহ। এ মতকে আরও শক্তিশালী করে মুআবিয়া ইবন হাকাম আস-সুলামী ﷺ'র হাদীস।[৬২০] তিনি সালাতে কথা বলা হারাম না জানার কারণে নবী ﷺ-এর পেছনে সালাতে কথা বলে ফেলেন। অথচ নবী ﷺ তাকে সাহু সাজদা দেওয়া আদেশ দেননি; বাইহাকী এটা উল্লেখ করেছেন। আমরা যা বললাম তা-ই অধিক শক্তিশালী মত।[৬২১]

প্রশ্ন ২৯৯: সাহু সাজদা সালাম ফেরানোর আগে দিতে হবে না পরে দিতে হবে?

৬১৯. সুনানুদ দারাকুতনী, ১
৬২০. সহীহ মুসলিম, ১০৮৬; সুনানু আবী দাউদ, ৯৩০; সুনানুন নাসায়ী, ১২২১
৬২১. ইরওয়াউল গালীল, ৪০৪ নং হাদীসের অধীনে।

জবাব: কেউ সালাতে ভুল করলে, চাইলে সে সাহু সাজদা সালামের আগে দেবে, আবার চাইলে সালামের পরে দেবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সাপেক্ষে বলা হয় যে, সালাতে কোনো কিছু বেশি হলে আগে দেবে অথবা পরে দেবে কিংবা এর বিপরীত করলে পরে দেবে অথবা আগে দেবে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার পক্ষে কিছু হাদীস থাকলেও সব হাদীস একত্র করলে প্রমাণ হয় যে, ভুলকারী এ ব্যাপারে ইচ্ছাধীন। চাইলে সালাম ফিরিয়ে দেবে। আর এটাই সার্বিকভাবে উত্তম। আবার চাইলে সাহু সাজদা দেওয়ার পর সালাম ফেরাবে।[৬২২]

প্রশ্ন ৩০০: তিলাওয়াতে সাজদার জন্য অজু থাকা, কিবলামুখী হওয়া এবং তাকবীর দেওয়া কি শর্ত?

জবাব: তিলাওয়াতের সাজদা অন্যান্য যিকিরের মতোই। যিকিরের ক্ষেত্রে সালাতের ন্যায় কোনো শর্ত নেই। সাজদা সালাতের একটি অংশ হলেও শরীআতের স্পষ্ট দলিল ছাড়া সালাতের এক অংশের জন্য পূর্ণ সালাতের শর্ত আরোপ করা যাবে না। যেমন, 'আল্লাহু আকবার' বলা সালাতের একটি রুকন। 'আল্লাহু আকবার' বলার মাধ্যমে সালাত শুরু না করলে সালাত শুদ্ধ হবে না। তথাপি কেউ বলে না যে, সালাতের বাইরে তুমি আল্লাহু আকবার বললে সালাতের সমস্ত শর্ত পূরণ করা তোমার ওপর ওয়াজিব। সালাতের শর্ত হচ্ছে, যেমন: কিবলামুখী হওয়া, স্থান ও পোশাক পবিত্র হওয়া। এসব শর্ত তো সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; সালাতের বাইরে 'আল্লাহু আকবার' বলার জন্য প্রযোজ্য নয়। 'আল্লাহু আকবার' বলা সালাতের একটি অংশ হলেও 'আল্লাহু আকবার' বলার জন্য পূর্ণ সালাতের শর্ত তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

একই কথা তিলাওয়াতের সাজদার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আবার একই কথা সাজদায়ে শোকরের জন্যও প্রযোজ্য। সালাতের জন্য প্রসিদ্ধ যেসব শর্ত রয়েছে, তার কোনো শর্ত এ ক্ষেত্রে কোনো মুসলিমের জন্য করা যাবে না। একজন মুসলিম যেভাবে আছে সেভাবেই সাজদা করবে। কিবলার দিকে থাকলে সেদিকে সাজদা করবে। পূর্ব দিকে, পশ্চিম দিকে যেদিকে থাক সেদিকে সাজদা করবে। এ জন্য কোনো কষ্ট করবে না। আল্লাহ তাঁর কিতাব এবং নবী তার হাদীসে যা আদেশ দেননি তার কোনো কিছু কবার প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে একটি হাদীস রয়েছে, যদিও তার সনদে দুর্বলতা আছে, তবে সবার ঐকমত্যে তার অর্থ সঠিক। হাদীসটি হলো, তিনি যেসব জিনিস থেকে নীরব থেকেছেন তা তোমাদের জন্য রহমত। অতএব, তোমরা সেসব বিষয়ে অনুসন্ধান করো না।[৬২৩]

---

৬২২. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৭/৩৫১

৬২৩. দারাকুতনী, ৪/১৮৪; মিশকাতুল মাসাবীহ, ১৯৭

তিলাওয়াতের সাজদা ও শোকরের সাজদার জন্য আমাদের ওপর এসব শর্ত আবশ্যক করা হয়নি। তাই আমাদের জন্য যেভাবে সহজ সেভাবে আমরা সাজদা করব। এটা আল্লাহ তাআলা পক্ষ থেকে আমাদের জন্য ও মানুষের জন্য অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না এবং শোকরও করে না।[৬২৪]

প্রশ্ন ৩০১: সহীহ হাদীসে এসেছে, নবী ﷺ প্রত্যেক ওঠা ও নামার সময় আল্লাহু আকবার বলতেন। এ হাদীস দ্বারা কি দলিল গ্রহণ করা যায় যে, তিলাওয়াতে সাজদার সময় আল্লাহু আকবার বলতে হবে?

জবাব: না, যাবে না। প্রত্যেক ওঠা ও নামা দ্বারা উদ্দেশ্য রীতিসিদ্ধ সালাত। রীতিসিদ্ধ সালাতে একেবারেই অপ্রতুল সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করা। আর অপ্রতুল জিনিসের কোনো বিধান নেই।

একাধিক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করেছেন এবং সাজদা দিয়েছেন। কিন্তু কোনো বর্ণনায় এমনকী দুর্বল সনদেও আসেনি যে, তিনি সালাতে তিলাওয়াতের সাজদা দিলে তাকবীর দিতেন এবং সাজদা দিতেন। অতএব, সালাতে তিলাওয়াতের সাজদা দিলে তাকবীর দেওয়ার হুকুম উল্লিখিত সহীহ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হবে না।[৬২৫]

প্রশ্ন ৩০২: এক ব্যক্তি তিলাওয়াতের সাজদা দিলে সাজদা শেষে ডানদিকে ও বামদিকে সালাম ফেরায়। এটি কি সুন্নাহসম্মত?

জবাব: না, সুন্নাহসম্মত নয়। সালাম ফেরাবে না। শুধু সাজদা দেবে এটাই যথেষ্ট।[৬২৬]

প্রশ্ন ৩০৩: সাজদায়ে শোকর দেওয়ার পদ্ধতি কী? তাতে কি তাকবীর দিতে হবে এবং সালাম ফেরাতে হবে? কয়টি সাজদা দিতে হবে?

জবাব: সাজদায়ে শোকরের সংখ্যা একটি। সালাতের জন্য যেসব শর্ত করা হয় তার কোনো শর্ত সাজদায়ে শোকরের জন্য প্রযোজ্য নয়। সাজদায়ে শোকর তিলাওয়াতের সাজদার মতোই। উভয়ের বিধান একই। উভয় সাজদার জন্য কোনো শর্ত নেই, যেমন-অজু করা, কিবলামুখী

৬২৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৭/৩৫৭-৩৫৮
৬২৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৭/৩৭০
৬২৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৭/৩৭৫

হওয়া, আল্লাহু আকবার বলা, সালাম ফেরানো ইত্যাদি। যখনই কোনো নেয়ামতের কথা জানতে পারবে তখনই যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় শুকরিয়াস্বরূপ সাজদা দেবে এবং যে নেয়ামতপ্রাপ্ত হয়েছে তার জন্য যথাসাধ্য আল্লাহর প্রশংসা করবে। অনুরূপভাবে যখনই সাজদাযুক্ত কোনো আয়াত তিলাওয়াত করবে তখনই সাথে সাথে সাজদা দেবে; তাতে অজু থাক আর না থাক, কিবলামুখী হোক আর না হোক। এর জন্য আলাদা করে তাকবীরে তাহরীমা দেবে না, তাশাহহুদ পড়বে না এবং সালামও ফেরাবে না।[৬২৭]

প্রশ্ন ৩০৪: কোনো মহিলা যদি পা খোলা অবস্থায় সালাত আদায় করে তবে তার সালাতের বিধান কী?

জবাব: আমি মনে করি, পা অবশ্যই ঢাকতে হবে। দুই পায়ের উপরিভাগ ঢাকার জন্য পর্যাপ্ত পোশাক পরিধান করবে। কারণ, তা কিছু উম্মুল মুমিনীন ﷺ আজমাইন থেকে প্রমাণিত। উদাহরণস্বরূপ, সাজদা অবস্থায় যদি তাদের পায়ের নিচের দিক প্রকাশ পেয়ে যায় তবে অসুবিধা নেই। তবে পায়ের উপরিভাগ অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে।

প্রশ্নকারী: যদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করে তবে কি তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে?

জবাব: যদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করে তবে তার সালাত কবুল হবে না। কারণ, ওড়না ছাড়া প্রাপ্তবয়স্ক নারীর সালাত আল্লাহ কবুল করেন না।[৬২৮]

৬২৭. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৭/৩৭৯
৬২৮. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ৭/৩৯৭

অধ্যায় এগারো

যাকাত

প্রশ্ন ৩০৫: কারো কাছে এমন পরিমাণ স্বর্ণ আছে যা যাকাতের নিসাব পরিমাণ হয় না। তার কাছে রৌপ্যও আছে, কিন্তু সেই রৌপ্যও নিসাব পরিমাণ হয় না। তবে উভয় স্বর্ণ ও রোপ্য একসঙ্গে হিসাব করলে বা মিলিয়ে দিলে নিসাব পরিমাণ হয়ে যায়। এমন অবস্থায় উভয়কে মিলিয়ে দিয়ে কি যাকাত আদায় করতে হবে?

জবাব: 'ফিকহুস সুন্নাহ' গ্রন্থকার সাইয়্যিদ সাবিক বলেন, 'যে-ব্যক্তি নিসাবের কম পরিমাণ স্বর্ণের মালিক, অনুরূপ নিসাবের কম পরিমাণ রৌপ্যের মালিক, সে নিসাব পূরণ করার জন্য উভয়কে মিলিয়ে দেবে না। কারণ, স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিন্নভিন্ন ধাতু। গরু ও ছাগলকে যেমন মিলিয়ে দেওয়া যায় না, অনুরূপ স্বর্ণ ও রৌপ্যকেও মিলিয়ে দেওয়া যায় না।'

সাইয়্যিদ সাবিকের মতকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আমি বলব, এ মতের পক্ষে (গরু ও ছাগলের সাথে) কিয়াস করার তুলনায় দলিল হিসেবে হাদীস পেশ করা আরও উত্তম। যারা উভয় ধাতুকে মিলিয়ে দেওয়ার কথা বলেন তাদের মতের খণ্ডন ও বাতুলতা প্রমাণ করার পর ইবন হাযম (২/৮৩) বলেন, 'উভয় ধাতুকে মিলিয়ে দেওয়া হালাল না হওয়ার পক্ষে আমাদের দলিল হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী। তিনি বলেন,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

পাঁচ উকিয়ার কম রৌপ্যে যাকাত নেই।[৬২৯]

যে-ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্যকে মিলিয়ে দিচ্ছে সে পাঁচ উকিয়ার কম রৌপ্যে যাকাতকে ওয়াজিব করছেন। আর এমনটা করা মানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশের বিরোধিতা এবং শরীআত রচনার নামান্তর, যার অনুমতি কি না আল্লাহ তাআলা দেননি।

যারা এমনটা বলেন তারা বিশ দীনারের কম হলে যাকাত লাগবে না বলে হাদীসকে সহীহ বলেন, আবার বিশ দীনারের কমে যাকাতকে ওয়াজিব বলেন। যেটা কি না একটা বিরাট বিস্ময়কর ব্যাপার![৬৩০]

৬২৯. সহীহুল বুখারী, ১৪৫৯
৬৩০. তামামুল মিন্নাহ, ৩৬০

প্রশ্ন ৩০৬: কোনো (অপ্রাপ্তবয়স্ক) বাচ্চার সম্পদ যদি যাকাতের নিসাব পরিমাণ হয় তবে কি তার সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হবে?

জবাব: যাকাত, সালাত, সিয়াম, অন্যান্য আরকান এবং ওয়াজিবসহ সকল বিষয় সেই ব্যক্তির ওপর প্রযোজ্য নয়, যে আদৌ প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি।[৬৩১]

প্রশ্ন ৩০৭: নারীদের অলংকারে কি যাকাত ওয়াজিব?

জবাব: ফাতিমা বিনতে কাইস ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বলেন, 'আমার স্বর্ণের হারে আল্লাহ যা ফরয করেছেন তা আপনি গ্রহণ করুন।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, 'হে ফাতিমা! এখন আল্লাহর অধিকার (যাকাত) তোমার ওপর থেকে আর কিছুই অবশিষ্ট রাখলে না!'[৬৩২]

এ হাদীস একেবারে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, মহিলাদের অলংকারে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে পরিচিত ছিল। এ ছাড়া একাধিক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ অলংকারে যাকাত প্রদানের আদেশ দিয়েছেন। আমি সেসব হাদীস 'আদাবুয যিফাফ' বইয়ে উল্লেখ করেছি। এ কারণে ফাতিমা বিনতে কাইস রাদিয়াল্লাহু তার হার নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসেন, যেন তিনি হারের যাকাত নিয়ে নেন। এবার এ হাদীস আদেশ সংক্রান্ত হাদীসের সাথে যুক্ত করুন। তাহলে যারা অলংকারে যাকাত ওয়াজিব নয় ফাতওয়া দিয়ে ধনীদের যাকাতের সম্পদে গরীবদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখেন-তারা এতে পরিতৃপ্ত হতে পারবেন![৬৩৩]

প্রশ্ন ৩০৮: অলংকার যদি প্রতি বছর নিসাব পরিমাণ হয় এবং তাতে এক বছর অতিক্রম করে, তাহলে প্রতি বছর যাকাত দিতে হবে না কি একবার যাকাত দিলেই যথেষ্ট হবে?

জবাব: যেহেতু প্রতি বছর নিসাব পরিমাণ হচ্ছে এবং বছর অতিক্রম করছে তাই প্রতি বছর যাকাত প্রদান করতে হবে।[৬৩৪]

---

৬৩১. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/৩৯৬
৬৩২. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ২৯৭৮
৬৩৩. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ৬/২/১১৮৫
৬৩৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/৪১২, পরিমার্জিত

প্রশ্ন ৩০৯: কোনো মহিলার অলংকারে যাকাত ফরয হয়েছে কিন্তু যাকাত দেওয়ার মতো তার কাছে কোনো অর্থ নেই; তাহলে সে কি কিস্তিতে যাকাত আদায় করতে পারবে?

জবাব: যে মহিলার অলংকারে যাকাত ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও সে যাকাত আদায় করার মতো কিছু পাচ্ছে না, তার ব্যাপারে আমি দুভাবে জবাব দেব।

১. কিস্তি আকারে যাকাত আদায় করা নিঃসন্দেহে জায়েয। কারণ, মুল উদ্দেশ্য হলো যাকাত প্রদানের জিম্মা থেকে নিজেকে মুক্ত করা, তাতে তা তাড়াতাড়ি আদায় করুক বা দেরিতে আদায় করুক।

২. এই জবাবের সাথে আরও দুটি বিষয় আছে। যথা:

ক. যে মহিলা কিস্তিতে যাকাত আদায় করতে চাচ্ছে সে নিশ্চিত নয় যে, তার ওপর ওয়াজিব যাকাত শেষ কিস্তি আদায় করা পর্যন্ত জীবিত থাকবে কি না। এ কারণে আমরা তার ব্যাপারে জোরালোভাবে বলব, সে যেন তাড়াতাড়ি এক ধাপেই সম্পূর্ণ যাকাত বের করে দেয়। এটাই আল্লাহর তাআলার নিম্নের বাণীটির অর্থ:

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ

> তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও জমিন বরাবর।[৬৩৫]

'তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে' অর্থ সৎ আমলের মাধ্যমে তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা অর্জনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও। অতএব, যেসব মুসলিম নর-নারী কুরআনের এ আয়াত নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে চায়, তারা যেন সকল প্রকার ভালো কাজ দ্রুত আঞ্জাম দেয়। তারা যেন তাড়াতাড়ি উমরা করে। তারা যেন তাড়াতাড়ি হজ করে। তারা যেন তাড়াতাড়ি যাকাত আদায় করে। তবে কেউ দেরিতে করলে সে জিম্মামুক্ত হয়ে যাবে।

খ. যেসব মহিলা অলংকার ব্যবহার করে তাদের আমি নসীহত করব, যাকাত আদায় করার মতো তাদের কাছে কিছু না থাকলে তারা যেন অলংকার খরচ করে দেয়। এমনটা করলে তারা অলংকারের মাধ্যমে যে পরীক্ষায় পড়েছিল তা থেকে একধাপেই নাজাত পেয়ে যাবে।

৬৩৫. সূরা আলে-ইমরান, ৩:১৩৩

বিশেষত যখন একাধিক হাদীসে এমন তৈরিকৃত স্বর্ণকে জাহান্নামের বালা, জাহান্নামের হার ও জাহান্নামের চুড়ি অবহিত করা হয়েছে।

তাই আমি মনে করি, যে মহিলা একধাপে তাড়াতাড়ি যাকাত বের করতে পারছে না সে তার অলংকার বিক্রি করে দিয়ে যাকাত বের করবে এবং তৈরিকৃত স্বর্ণের অনিষ্ট থেকে নিজেকে মুক্ত করবে।[৬৩৬]

প্রশ্ন ৩১০: স্বর্ণ ও রৌপ্য ছাড়া অন্যান্য মূল্যবান খনিজ পদার্থে কি যাকাত লাগবে?

জবাব: স্বর্ণ ও রৌপ্য ছাড়া অন্যান্য মূল্যবান খনিজ পদার্থে যাকাত লাগবে না। তবে ব্যবসায়ী পণ্যে যাকাত লাগবে কি না, তা নিয়ে আলেমদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে স্বর্ণ ও রৌপ্য ছাড়া অন্যান্য খনিজ পদার্থে যাকাত লাগবে না। কারণ, এ ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ আসেনি।[৬৩৭]

প্রশ্ন ৩১১: ব্যবসায়ী পণ্যে যাকাত লাগবে কি?

জবাব: ব্যবসায়ী পণ্য বলতে উদ্দেশ্য, যে সম্পদ বা পণ্য মানুষ ব্যবসার কাজে লাগায়, নির্দিষ্ট কোনো কিছুতে কাজে লাগায় না।

এ ধরনের ব্যবসায়ী পণ্যে যাকাত লাগবে কি না, তা নিয়ে পুরাতন যুগ থেকেই আলেমদের মাঝে মতপার্থক্য চলে আসছে। কেউ বলেছেন যাকাত ওয়াজিব আবার কেউ বলেছেন যাকাত ওয়াজিব নয়।

ব্যবসায়ী পণ্যের যাকাত বলা হলে তা দ্বারা উদ্দেশ্য, যে যাকাতের ক্ষেত্রে নিসাব পূর্ণ হওয়া এবং এক বছর অতিক্রম করা শর্ত।

যাদের মতে যাকাত ওয়াজিব তারা বলেন, প্রতি বছর সেসব পণ্যের দাম নির্ধারণ করতে হবে। সে দাম নিসাব পর্যন্ত পৌঁছালে তা থেকে ২.৫% যাকাত বের করতে হবে।

ব্যবসায়ী পণ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর কোনো প্রমাণ আসেনি। তবে এসব পণ্যে সাধারণ দান এর বিধান রয়েছে। যে-ব্যক্তি তার ব্যবসায়ী পণ্যে সামর্থ্য রাখে, তার জন্য ওয়াজিব হচ্ছে, সেখান থেকে কিছু সে বের করবে। তবে এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ

৬৩৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/৪১৯-৪২০
৬৩৭. ফাতাওয়াল ইমারাত, ৪৯

নেই। আর এক বছর পূর্ণ হওয়াও শর্ত নয়। ব্যাপক দলিলের ভিত্তিতে এমনটা করবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ

হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদের যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা খরচ করো।[৬৩৮]

ব্যবসায়ী পণ্যের ক্ষেত্রে দাম নির্ধারণ করে ২.৫% যাকাত প্রদানের পক্ষে কোনো সহীহ হাদীস নেই। আমি বলছি, সহীহ হাদীস নেই। কারণ, সুনানু আবী দাউদ ও অন্যান্য গ্রন্থে কিছু হাদীস রয়েছে। তবে সেগুলো সহীহ হলেও ব্যবসায়ী পণ্যে যাকাত ওয়াজিব প্রমাণ করে না।[৬৩৯]

প্রশ্ন ৩১২: যদি স্বর্ণের সাথে অন্য কোনো কিছু ধাতব পদার্থ মিশ্রিত থাকে তাহলে কি যাকাত আদায় করতে হবে?

জবাব: এমন অবস্থা হলে বলা হয়, দেখতে হবে কীসের পরিমাণ বেশি। যদি অলংকারে স্বর্ণের পরিমাণ বেশি হয় তবে স্বর্ণের হিসাবে যাকাত দিতে হবে। আর যদি অন্য ধাতুর পরিমাণ বেশি হয় তবে যাকাত দিতে হবে না। তবে পূর্বের প্রশ্নে যে সাধারণ দানের কথা বলা হলো সেই দান এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।[৬৪০]

প্রশ্ন ৩১৩: বছর পূর্ণ হওয়ার দুতিন মাস পূর্বে কি যাকাত আদায় করা জায়েয?

জবাব: জায়েয। তা নিষিদ্ধ হওয়ার কিছুই নেই। কারণ, প্রমাণিত আছে[৬৪১] যে, নবী ﷺ তার চাচা আব্বাস থেকে অগ্রিম দুই বছর যাকাত নেন।[৬৪২]

প্রশ্ন ৩১৪: এক ব্যক্তির কাছে মাল ছিল। সে উক্ত মাল বিক্রি করে ব্যবসার উদ্দেশ্যে জমিন ক্রয় করে। এতে যাকাতের বিধান কী?

জবাব: তাতে যাকাত নেই।

প্রশ্নকারী: তার কাছে সেই জমিন এক বছর, দুবছর, তিন বছর বা আরও বেশি বা কম সময় থাকলেও যাকাত লাগবে না?

৬৩৮. সূরা বাকারাহ, ২:২৫৪
৬৩৯. ফাতাওয়াল ইমারাত, ৪৯
৬৪০. ফাতাওয়াল ইমারাত, ৫০
৬৪১. সুনানু আবী দাউদ, ১৬২৪; সুনানুত তিরমিযী, ৬৭৮, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।
৬৪২. ফাতাওয়াল ইমারাত, ৬১

জবাব: আল্লাহ যতদিন চাইবেন সেই জমিন তার কাছে থাকলেও যাকাত লাগবে না। তবে সেই জমিন বিক্রি করে দেওয়ার পর জমিনের টাকা তার কাছে থাকলে এবং তাতে এক বছর অতিক্রম করলে, যাকাত ওয়াজিব হবে।

প্রশ্ন ৩১৫: কেউ যদি কাউকে ঋণ দেয় আর সেই ঋণদাতা তার ঋণ ফিরে পাবার ব্যাপারে সন্দিহান থাকে, তবে কি ঋণদাতা সেই ঋণের টাকার যাকাত প্রদান করবে?

জবাব: ফকীহগণ ঋণকে দুইভাগে ভাগ করেছেন এবং সেই ভাগের ভিত্তিতে ভিন্নভিন্ন বিধানের কথা বলেছেন। যথা: ক. জীবিত ঋণ, খ. মৃত ঋণ।

ক. জীবিত ঋণ দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো, যে ঋণের সম্পদ ঋণদাতা ফিরে পাবার আশা করে।

খ. আর মৃত ঋণ দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো, ঋণদাতা যে ঋণ ফিরে পাবার ব্যাপার হাত গুটিয়ে নিয়েছে এবং আশা ছেড়ে দিয়েছে। আশা ছেড়ে দেওয়ার কারণ হতে পারে, ঋণগ্রহীতা সরাসরি ঋণ নেওয়ার কথা অস্বীকার করেছে বা ঋণগ্রহীতা একেবারেই নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে কিংবা অন্য কোনো কারণে ঋণদাতা আশা ছেড়ে দিয়েছে।

যদি প্রথম প্রকার হয় অর্থাৎ জীবিত ঋণ হয় তবে তা সম্পদ হিসেবে গণ্য করতে হবে। মনে করতে হবে তা তার অধীনে থাকা মাল। তাই প্রথম প্রকার ঋণের সম্পদ হিসাব করে যাকাত বের করা ওয়াজিব।

এখানে আরেকটা প্রকার হচ্ছে, যে ঋণ জীবিতও নয় আবার মৃতও নয় বরং সন্দেহপূর্ণ। এমনটা হলে এ ক্ষেত্রে শরয়ী কায়েদা প্রয়োগ করতে হবে। আর শরয়ী কায়েদা হলো, কোন দিকে প্রবল ধারণা হয় তা লক্ষ করা; জীবিত ঋণের দিকে প্রবল ধারণা হচ্ছে, না মৃত ঋণের দিকে প্রবল ধারণা হচ্ছে। যে দিকে প্রবল ধারণা হবে সেই দিক গণ্য করে যাকাতের বিধান প্রযোজ্য হবে এবং এভাবে সন্দেহ দূর করতে হবে।[৬৪৩]

প্রশ্ন ৩১৬: আমার চাচাত ভাই ও চাচা আমার থেকে দেড় বছর পূর্বে ১৫৫ দীনার ঋণ নেয়। বর্তমানে তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। তাদের এই দুরবস্থার কারণে তাদের থেকে দীনার চাইতেও পারি না। আমি কি ঋণের দীনারগুলো তাদেরকে যাকাত হিসেবে দিয়ে দিতে পারব?

৬৪৩. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/৪৬৩

জবাব: যদি আপনি মনে করেন উক্ত দীনারগুলো মৃত ঋণ তবে তা যাকাত হিসেবে চলবে না। আর যদি মনে করেন, তা জীবিত ঋণ, অবশ্য আপনি ভালো জানবেন-তাহলে তা যাকাত হিসেবে দিতে পারবেন। তবে শর্ত হলো, আপনি ঋণগ্রহীতাকে বলে দেবেন যে, 'আমি আপনার কাছে যে ১৫৫ দীনার পেতাম তা আপনাকে যাকাত হিসেবে দিয়ে দিলাম। আপনার ওপর আর কোনো দাবি নেই। আপনি আমার জিম্মা থেকে মুক্ত।' এরপর সে যদি তা মেনে নেয় তবে ভালো, আর না মানলে যাকাত হবে না।[৬৪৪]

প্রশ্ন ৩১৭: একজনের কাছে ২০০ গ্রাম স্বর্ণ রয়েছে। রামাদান শেষ হলে সেই স্বর্ণের ওপর এক বছর অতিক্রম করবে। রামাদানের পূর্বে তার ৩০০ দীনার ঋণ ছিল। কিন্তু সে তখন লোকসনের ভয়ে তার সেই ২০০ গ্রাম স্বর্ণ বিক্রি করেনি। কারণ, তখন স্বর্ণের বাজার ছিল নিম্নমুখী। পরবর্তীকালে সে ঐ স্বর্ণ রামাদানের পর বিক্রি করে দেয়। সেই স্বর্ণ তার কাছে থাকা অবস্থায় এক বছর অতিক্রম করেছে। এ কারণে তাকে পূর্ণ স্বর্ণের যাকাত লাগবে না কি ৩০০ দীনার সমমূল্য বাদ দিয়ে যাকাত লাগবে?

জবাব: সমমূল্য বাদ যাবে না। কারণ, উক্ত স্বর্ণ তার মালিকানায় ছিল। সেই অবস্থায় ঐ লোক মারা গেলে উক্ত স্বর্ণের ওয়ারিস তার পরিবার হয়ে যেত। সম্পত্তি তার ওয়ারিসদের কাছে চলে যেত। এ কারণে কারো ওপর ঋণ থাকলে সে দুই পদ্ধতির কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করবে।

ক. যাকাত যেন না লাগে সে জন্য তাড়াতাড়ি ঋণ পরিশোধ করে দেবে। এমন করলে তার নিসাব কমে যাবে আর তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

খ. সে তাড়াতাড়ি ঋণ পরিশোধ করবে না বরং তার কাছে পূর্ণ নিসাবসহ উক্ত সম্পদ থেকে যাবে এবং তাতে এক বছর অতিক্রম করবে। এমনটা হলে তার অধীনে থাকা উক্ত মাল থেকে যাকাত বের করা ওয়াজিব।[৬৪৫]

প্রশ্ন ৩১৮: খাদ্য-শস্যতে যাকাত আদায় করতে হবে?

জবাব: জব, গম, খেজুর ও কিশমিশ এ চার প্রকার শস্যে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর মাধ্যমে যাকাত ফরয করেছেন। নবী ﷺ মুআয ইবন জাবালকে যখন দাওয়াতের উদ্দেশ্যে ইয়ামান প্রেরণ করেন তখন এ চার প্রকার থেকে যাকাত আদায় করার আদেশ দেন। এমনকী তিনি আরও বলেন,

৬৪৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/৪৬৭
৬৪৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/৪৬৮

لاَ تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلاَّ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ

এই চার প্রকার ছাড়া সাদকা গ্রহণ করবে না।[৬৪৬]

উল্লিখিত চার প্রকার শস্য ছাড়া অন্যান্য শস্য, ফল ও খাবারে সাধারণ দান-সাদকার বিধান রয়েছে। তবে উল্লিখিত চার প্রকার শস্যে যাকাত ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে নিসাব হওয়ার যে শর্ত করা হয়, সাধারণ দান-সাদকার ক্ষেত্রে সেই শর্ত করা হয় না। আর নিসাব হচ্ছে পাঁচ ওয়াসাক।

গম যখন পাঁচ ওয়াসাক হবে অর্থাৎ প্রচলিত প্রায় দশ শস্যবস্তা হবে তখন তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। এর কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। এরপর যে জমিনে শস্য উৎপাদন হয়েছে সেই জমিনের ভিন্নতার কারণে যাকাতের ওয়াজিবিয়্যাতও ভিন্ন হয়ে যাবে। যদি সেচবিহীন জমিন হয় তবে তাতে দশমাংশ যাকাত লাগবে। আর যদি চালক বা বালতি দ্বারা সেচ দেওয়া হয় তবে বিশমাংশ যাকাত লাগবে।

আর ফলফলাদিতে বিশেষ করে সবজিতে যাকাত ওয়াজিব নয়। যখন বলা হয় যাকাত ওয়াজিব নয় তখন তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরিভাষাগত যাকাত; যার রয়েছে নিসাব ও নির্দিষ্ট পরিমাণ। তবে এসব ফলফলাদিতে সাধারণ দান-সাদকা করা লাগবে। এর মাধ্যমে দান-সাদকাকারীদের মন পরিশুদ্ধ ও পবিত্র হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

সেই সফল যে নিজের (মনকে) পবিত্র করে। আর সে ব্যর্থ যে নিজের (মনকে) কলুষিত করে।[৬৪৭]

সারকথা, আমরা যে চার প্রকার শস্যের কথা বললাম, সহীহ হাদীসে সেই চার প্রকার শস্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কথা এসেছে।[৬৪৮]

প্রশ্ন ৩১৯: মধুর কি যাকাত লাগবে?

জবাব: বর্তমানে কিছু কিছু বাগানে ও ক্ষেতে যে মধু চাষ করা হয় তাতে যাকাত লাগবে না। তবে আমরা ব্যবসায়ী পণ্যের ক্ষেত্রে যেভাবে বললাম সেভাবে মধু থেকে সাধারণ দান-সাদকা করা যায়, যার মাধ্যমে নিজের মন পবিত্র ও শুদ্ধ হবে।[৬৪৯]

৬৪৬. আস-সুনানুল কুবরা, ৭৬৯৯, আলবানী হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন।
৬৪৭. সূরা আশ-শামস, ৯১:৯-১০
৬৪৮. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/৪৭৮-৪৭৯
৬৪৯. তামামুল মিন্নাহ, পৃ. ৩৭৪

প্রশ্ন ৩২০: যাকাতের হকদার হিসেবে ফকীরের কথা বলা হয়েছে। ফকীরের সঠিক সংজ্ঞা কী?

জবাব: আমার যতটুকু জ্ঞান রয়েছে, সে অনুযায়ী ফকীর হচ্ছে, যার ওপর যাকাত ফরয হয়নি অর্থাৎ যার কাছে যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই সেই ফকীর।[৬৫০]

প্রশ্ন ৩২১: কোনো এক ব্যক্তি একজনকে যাকাতের মাল দিয়ে বলেছে, অমুকদের এই যাকাত দিয়ে দেবেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি এমন কিছু লোক পায় যারা তাদের চেয়ে বেশি যাকাতের মুখাপেক্ষী। এক্ষেত্রে যাকাতপ্রদানকারীর অনুমতি ব্যতিরেকে সেই ব্যক্তি কি তাদের যাকাত দিতে পারবে যারা বেশি প্রয়োজনের শিকার? এটা কি তার জন্য জায়েয হবে?

জবাব: না, জায়েয হবে না। যাদের দিতে অসিয়ত করা হয়েছে তাদের দিতে হবে। তবে যাকাতপ্রদানকারী অনুমতি দিলে ভিন্ন কথা।[৬৫১]

প্রশ্ন ৩২২: একজন ব্যক্তির সম্পদ নিসাব পর্যন্ত পৌঁছার কারণে তার সম্পদে যাকাত ফরয হয়েছিল এবং যাকাত আদায় করার সুযোগ আসা সত্ত্বেও অবহেলাবশত যাকাত বের করেনি। অতঃপর কোনো কারণে উক্ত সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায় এবং যাকাতের নিসাব কমে যায়। এখন কি তার জিম্মায় সেই যাকাত থেকে যাবে?

জবাব: 'ফিকহুস সুন্নাহ' গ্রন্থকার সাইয়্যিদ সাবিক বলেন, শাফিয়ী বলেছেন, যাকাত আদায় করার সুযোগ আসার পূর্বেই যদি নিসাব ধ্বংস হয়ে যায় তবে যাকাত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি সুযোগ আসার পর ধ্বংস হয়ে যায় তবে যাকাত বাতিল হবে না। ইবনু কুদামাহ এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

সাইয়্যিদ সাবিকের মত আরো খানিক শক্তিশালী করার জন্য আমি বলব, এ মত আহমাদ ইবন হাম্বালের একদল অনুসারীর। তাদের অন্যতম হলেন শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ, যেমনটি 'আল-ইখতিয়ারাত' পৃ. ৫৮ গ্রন্থে রয়েছে।[৬৫২]

---

৬৫০. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/৫১৩
৬৫১. প্রাগুক্ত
৬৫২. তামামুল মিন্নাহ, পৃ.৩৭৯

প্রশ্ন ৩২৩: নিজের যাকাত কি নিজেই বিতরণ করতে পারবে?

জবাব: উসমান ﷺ বলেন, এটি তোমাদের যাকাতের মাস। অতএব, যার ঋণ আছে সে যেন ঋণ আদায় করে নেয়, তারপর অবশিষ্ট মালের যাকাত দেয়।

হাদীসটি সহীহ। 'মানারুস সাবীল' গ্রন্থকার এই আসার ও পরবর্তী আসারের মাধ্যমে দলিল গ্রহণ করেছেন যে, হকদারের কাছে যাকাত পৌঁছে যাওয়া নিশ্চিত হওয়ার জন্য যাকাতের মালিকের নিজের যাকাত নিজেই বিতরণ করা সুন্নাত। তবে এই দুই আসারে এ ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ নেই। এর থেকে উত্তম দলিল হচ্ছে যা বাইহাকী ৪/১১৪ 'ব্যক্তির নিজেই তার মালের গোপন যাকাত বিতরণ করা সংক্রান্ত অধ্যায়'-এ বর্ণনা করেছেন। আবু সাঈদ মাকবারী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার ২শ' দিরহাম নিয়ে উমার ইবন খাত্তাব ﷺ'র কাছে গিয়ে বলি, 'আমীরুল মুমিনীন! এই হচ্ছে আমার মালের যাকাত।' তিনি বলেন, 'কাইসান! তুমি ঠিক করেছ?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তখন তিনি বললেন, 'তুমি এসব দিরহাম নিয়ে গিয়ে বিতরণ করে দাও।' এমনটি আবু উবাইদ বর্ণনা করেছেন (১৮০৪)। এর সনদ হাসান।

উল্লিখিত মতের পক্ষে আরেকটি হাদীস হচ্ছে যা বুখারী-মুসলিম বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সাত শ্রেণিকে আল্লাহ তাঁর ছায়ায় ছায়া দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না: (তারা হলো) ন্যায়পরায়ণ শাসক..., যে-ব্যক্তি ডান হাতে এমনভাবে সাদকা করে যে, বাম হাত জানে না ডান হাত কী খরচ করেছে...।[৬৫৩]

প্রশ্ন ৩২৪: সচ্ছল মেয়ে কি তার পিতামাতাকে যাকাত দিতে পারবে?

জবাব: না, পারবে না। কারণ, পিতামাতার খরচ প্রদান মেয়ের দায়িত্ব। যার ওপর খরচ প্রদান দায়িত্ব সে যাকাতের অর্থ দিতে পারে না। তাই মেয়ে কোনো অবস্থাতেই পিতামাতাকে যাকাতের অর্থ দিতে পারবে না।

প্রশ্নকারী: অভাবী বিবাহিত সন্তানের খরচ দেওয়া পিতামাতার ওপর কি আবশ্যক?

জবাব: অবশ্যই আবশ্যক।[৬৫৪]

৬৫৩. ইরওয়াউল গালীল, ৮৫০ নং হাদীসের অধীনে
৬৫৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/৫৩৮-৫৩৯, পরিমার্জিত

প্রশ্ন ৩২৫: এক ব্যক্তির সম্পদ ছিল এবং তাতে এক বছর অতিক্রম করার কারণে যাকাতও ফরয হয়েছিল। কিন্তু সেই ব্যক্তি যাকাত আদায় করতে দেরি করে। হঠাৎ তার পিতা ঋণী হয়ে পড়লে ঋণ পরিশোধ করতে করতে তার সমস্ত সম্পদ শেষ হয়ে যায়। যাকাত বের করার মতো কোনো সম্পদই আর অবশিষ্ট নেই। এরপরও কি তার ওপর যাকাত বের করার জিম্মা থাকবে?

জবাব: যাকাত বের করার আবশ্যকতা তার জিম্মায় থাকবে; এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তার উচিত ছিল মানুষের অধিকারের ওপর আল্লাহর অধিকারকে প্রাধান্য দেওয়া। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে,

فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

আল্লাহর ঋণ আদায় করা সবচেয়ে বেশি অধিকারসম্পন্ন।[৬৫৫]

প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় পিতার ঋণ পরিশোধ করার কারণে তার সমস্ত সম্পদ শেষ হয়ে গেলেও তার জিম্মায় ফরয যাকাতের ঋণ থেকে যাবে। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তার সেই জিম্মা বাতিল হবে না।[৬৫৬]

প্রশ্ন ৩২৬: এক ব্যক্তি অনেক বছর যাবৎ যাকাত প্রদান করেনি। পরবর্তীকালে তাওবা করে ফিরে এসেছে। এখন সে যাকাত প্রদান করতে ইচ্ছুক। তাকে কি অতীতের সবগুলো বছরের যাকাত দিতে হবে? এটা কি তার ওপর ওয়াজিব?

জবাব: অবশ্যই দিতে হবে।

প্রশ্নকারী: তার কিছু জমিও ছিল। কিন্তু সে ভুলে গেছে কত ফসল হয়েছিল। এখন কীভাবে যাকাত নির্ধারণ করবে?

জবাব: প্রবল ধারণার ভিত্তিতে। সে ধারণা করবে কত পরিমাণ ফসল হতে পারত। প্রবল ধারণায় যা মনে হবে তার ভিত্তিতেই যাকাত আদায় করবে।[৬৫৭]

প্রশ্ন ৩২৭: আমরা জানি যাকাত ব্যয়ের খাত আটটি। সাদাকাতুল ফিতর ব্যয়ের খাতও কি সেই আটটি?

---

৬৫৫. সহীহুল বুখারী, ১৯৫৩; সহীহ মুসলিম, ১১৪৬
৬৫৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/৫৫৮
৬৫৭. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/৫৬১

জবাব: সাদাকাতুল ফিতর আট খাতে ব্যয় করার কথা নেই। বরং ইবন আব্বাস ﷺ'র হাদীসে এসেছে, সাদাকাতুল ফিতর মিসকীনদের খাবারস্বরূপ।[৬৫৮] এ হাদীসে সাদাকাতুল ফিতরকে মিসকীনদের জন্য নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। আর যে আয়াতে আট খাতের কথা বলা হয়েছে তা মূলত সম্পদের যাকাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; সাদাকাতুল ফিতরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এর প্রমাণ আয়াতের পূর্বাংশ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا

> তাদের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে যারা সাদাকা বণ্টনের ব্যাপারে আপনাকে দোষারোপ করে। (অথচ) তাথেকে দেওয়া হলে তারা খুশি হয়।[৬৫৯]

এটা শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যার মত। এ ব্যাপারে তার জ্ঞানগর্ভ ফাতাওয়া রয়েছে ২/৮১-৮৪। শাওকানী 'আস-সাইলুল জাররার' ২/৮৬-৮৭ গ্রন্থে এর পক্ষে মত দিয়েছেন। এ কারণে ইবনুল কাইয়িম 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে বলেছেন, সাদাকাতুল ফিতরকে মিসকীনদের জন্য নির্দিষ্ট করা রাসূলুল্লাহ ﷺ দিকনির্দেশনা।[৬৬০]

প্রশ্ন ৩২৮: কেউ যদি বিদেশে থাকে তবে সে বিদেশেই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করবে না কি স্বদেশে আদায় করবে?

জবাব: যদি তার কাছে কোনো ফকীর থাকে তবে বিদেশে আদায় করা জায়েয। অনুরূপভাবে স্বদেশে কাউকে দায়িত্ব দিয়েও সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে পারে।[৬৬১]

প্রশ্ন ৩২৯: রামাদানের শেষ দিকে যাকাতুল ফিতর নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। একদল টাকার বিনিময়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করে আর আরেকদল বলে, গম বা যব বা মানুষের প্রধান খাদ্য দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা আবশ্যক। আপনার মত কী?

জবাব: নিঃসন্দেহে প্রথম দল ভুলকারী। যারা নগদ অর্থ দ্বারা 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায় বৈধ বলে, তারা ভুলকারী। কারণ, তারা বুখারী-মুসলিমের স্পষ্ট হাদীস বিরোধী। আবদুল্লাহ ইবন উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

৬৫৮. সুনানু আবী দাউদ, ১৬০৯
৬৫৯. সূরা তাওবাহ, ৯:৫৮
৬৬০. তামামুল মিন্নাহ, পৃ. ৩৮৭
৬৬১. তুরাসুল আলবানী ফিকহ, ১০/৫৯১-৫৯২

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছোটো-বড়ো ও স্বাধীন-দাসের ওপর এক সা যব বা এক সা খেজুর সাদাকাতুল ফিতর হিসেবে ফরয করেছেন।[৬৬২]

আল্লাহর আদেশ অনুসরণার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব বস্তু নির্দিষ্ট করে ফরয করে দিয়েছেন; নগদ অর্থ ফরয করেননি। এসব খাদ্য তৎকালীন যুগের মানুষের দৈনন্দিন খাবার ছিল। এ হাদীসের অর্থ হলো, নতুন ও ভালো পোশাক... দিয়ে ফকীর-মিসকীনকে আনন্দিত করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো, ঈদের দিন এবং ঈদ পরবর্তী দিনসমূহে তাদেরকে খাবারপানীয় থেকে অমুখাপেক্ষী করা।

কেউ যদি এসে বলে, না, আমরা নগদ অর্থ বের করব, কারণ, তা ফকীরদের জন্য বেশি উপকারী, তাহলে সে দুটি ভুল করবে। প্রথম ভুল, সে স্পষ্ট দলিলের বিরোধিতা করবে। এটা ইবাদতের বিষয়। গেল এটা তো হালকা কথা।

দ্বিতীয় ভুল আরও ভয়ানক। মহাবিজ্ঞ শরীআত প্রণেতা রব্বুল আলামীন যখন তার নবীকে ওহী করে এক সা খাবার উম্মতের ওপর ফরয করতে বলেন তখন তিনি ফকীর-মিসকীনদের কল্যাণের কথা জানতেন না-যারা নগদ অর্থ বের করা উত্তম মনে করে, আদতে তারা এমনটাই বোঝাতে চায়।

নগদ অর্থ বের করা 'উত্তম' হলে এটাকে মূল করা হতো আর খাবার প্রদানকে তার বিকল্প করা হতো। কারণ, যে নগদ অর্থের মালিক সে জানে তার প্রয়োজন অনুযায়ী কোথায় খরচ করতে হবে। খাবার কেনা প্রয়োজন হলে খাবার কিনবে। পানীয় কেনা প্রয়োজন হলে পানীয় কিনবে। পোশাক কেনা প্রয়োজন হলে পোশাক কিনবে। এরপরও কেন শরীআত প্রণেতা মূল্য বা দিরহাম-দীনার ফরয করার পরিবর্তে খাবার ফরয করলেন?

অতএব, বোঝা যায় এর পেছনে এক মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। তিনি উপর্যুক্ত হাদীস ও অন্যান্য হাদীসে উল্লিখিত খাবারকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

এরপরও স্পষ্ট দলিল অনুযায়ী আমল না করে বিকল্প তথা নগদ অর্থের দিকে কিছু মানুষের মোড় নেওয়া মানে শরীআত প্রণেতাকে দোষী সাব্যস্ত করা যে, তিনি সুন্দর শরীআত প্রণয়ন

৬৬২. সহীহুল বুখারী, ১৫১২; সহীহ মুসলিম, ২১৬৯

করেননি; বরং আমাদের শরীআত প্রণয়নই বেশি উত্তম ও ফকীরদের জন্য বেশি কল্যাণকর। তারা যদি এমনটা উদ্দেশ্য করে, তাহলে তা কুফরী হবে। তবে সত্যি কথা হলো, তারা এমনটা উদ্দেশ্য করে না বরং তারা গাফেল। এ কারণে তারা এমন কথা বলে যা একেবারেই ভুল। অতএব, মহাবিজ্ঞ শরীআত প্রণেতা স্পষ্টভাবে যা বলেছেন তথা খাবার ছাড়া অন্য কিছু বের করা জায়েয নয়।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক যে, শরীআত প্রণেতা উল্লিখিত প্রকার খাবার ফরয করেছেন। কারণ, নবুওয়াত ও রিসালাতের যুগে সেসব খাবারের প্রচলন ছিল। তবে হালের সময়ে সেসব খাবারের বিকল্প বস্তু খাবার হিসেবে প্রচলন আছে। বর্তমানে যব খায় এমন কাউকে পাওয়া যায় না; বরং গম ও শস্যদানা খায় এমন কাউকেই বেশি পাওয়া যায়। কারণ, শস্যদানার জন্য অন্যান্য বস্তু প্রয়োজন হয়। যদিও জাঁতা পাওয়া যায়। জাঁতার সঙ্গে ছোটো বা বড়ো চুলা প্রয়োজন। যদিও বর্তমানে তা কোনো কোনো গ্রামে পাওয়া যায়। যেহেতু সেসব খাদ্য বর্তমানে পরিত্যক্ত ও অচল হয়ে গেছে তাই সেসব খাদ্যের বিকল্প হিসেবে আমরা অন্য খাদ্য বের করব; নগদ অর্থ নয়। খাদ্যের বিকল্প হিসেবে খাদ্য বের করলে আমরা শরীআতের সাথেই থাকব। কারণ, শরীআতে তৎকালীন প্রচলিত খাদ্যসমূহকে নির্ধারণ করেছে। আর যদি আমরা বিকল্প হিসেবে নগদ অর্থ বের করি তখন আমরা যেন বলি, মহাবিজ্ঞ শরীআত প্রণেতা উত্তম শরীআত প্রণয়ন করেননি! আমরা নিশ্চিতভাবে সবাই বলতে পারি যে, উভয় প্রকার খাদ্যের তুলনায় নগদ অর্থের ব্যবহার বেশি বিস্তৃত। কিন্তু আমরা যখন পাচ্ছি যে, মহাবিজ্ঞ শরীআত প্রণেতা খাদ্য ফরয করেছেন এবং আরও পাচ্ছি যে, সেসব খাদ্য বর্তমান চলে না, তখন আমাদের জন্য আবশ্যক তার বিকল্প হিসেবে অন্য খাবার প্রদান করা। যেমন, চাল; গরীব বা ধনী এমন কোন বাসা আছে যারা চাল খায় না? অতএব, আমরা গমের বদলে চাল বা চিনি কিংবা এ জাতীয় খাদ্য দেব।[৬৬৩ ৬৬৪]

প্রশ্ন ৬৩০: হাদীসে পাওয়া যায়, কোনো কোনো সাহাবী ঈদের দু'তিন পূর্বে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন। তারা সরাসরি কি ফকীর-মিসকীনকে দিতেন, না কি তারা রাজস্ব কর্মকর্তার কাছে জমা দিতেন?

জবাব: ইবন উমার ﷺ থেকে বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রত্যেক পুরুষ,

৬৬৩. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/৫৯৫-৫৯৭

৬৬৪. খাদ্যদ্রব্য দিয়ে যাকাতুল ফিতর আদায় করা নিঃসন্দেহে উত্তম। এর বিকল্প চিন্তা করা ঠিক নয়। তবে ইমাম শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ প্রমুখ বলেছেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে নগদ অর্থ দ্বারা যাকাতুল ফিতর জায়েয হতে পারে। আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে ভালো জানেন।—সম্পাদক (সালাফী)

মহিলা, স্বাধীন ও দাসের পক্ষ হতে সাদাকাতুল ফিতর অথবা (বলেছেন) সাদাকাই রামাদান হিসেবে এক সা খেজুর বা এক সা যব আদায় করা ফরয করেছেন। অতঃপর লোকেরা অর্ধ সা গমকে এক সা খেজুরের সমান মূল্য দিতে লাগল। নাফি বলেন, ইবন উমার ﷺ খেজুর দিতেন। এক সময় মদীনায় খেজুর দুর্লভ হলে যব দিয়ে তা আদায় করেন। ইবন উমার ﷺ প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সকলের পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন; এমনকী আমার সন্তানদের পক্ষ থেকেও সাদাকার দ্রব্য গ্রহীতাদেরকে দিয়ে দিতেন। তিনি এটা ঈদের এক-দুদিন পূর্বে আদায় করতেন।[৬৬৫]

হাদীসের শেষ অংশ দারাকুতনী (২২৫) ও বাইহাকী (৪/১৭৫) বর্ণনা করেছেন দাহহাক ইবন উসমানের সনদে নাফি থেকে। তার বর্ণনার শব্দ হলো,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ. وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষদের সালাতে বের হওয়ার পূর্বে যাকাতুল ফিতর আদায় করার আদেশ দিয়েছেন। আর আবদুল্লাহ তা একদিন বা দুইদিন আগে আদায় করতেন।

মালিক (১/২৮৫/৫৫) নাফি থেকে বর্ণনা করেন। নাফি বলেন, যাকাতুল ফিতর জমাকারীর কাছে আবদুল্লাহ উমার দু'দিন বা তিনদিন আগে যাকাতুল ফিতর পাঠাতেন।

আমি বলব, বুখারীর বর্ণনায় 'গ্রহীতাদেরকে দিয়ে দিতেন' দ্বারা ফকীর উদ্দেশ্য নয়; বরং সরকার প্রধান কর্তৃক সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা উদ্দেশ্য। একে আরও শক্তিশালী করে ইবন খুযাইমার[৬৬৬] বর্ণনা। তিনি আবদুল ওয়ারিস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আইউব থেকে বর্ণনা করেন। আইউব নাফিকে বলেন,

مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي الصَّاعَ؟ قَالَ إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ قُلْتُ: مَتَى كَانَ الْعَامِلُ يَقْعُدُ؟ قَالَ: قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

ইবন উমার ﷺ কখন এক সা দিতেন? তিনি বললেন, যখন আদায়কারী বসতেন। বললাম, আদায়কারী কখন বসতেন? তিনি বললেন, ঈদুল ফিতরের একদিন বা দু'দিন আগে।[৬৬৭]

৬৬৫. সহীহুল বুখারী, ১৫১১
৬৬৬. সহীহ ইবন খুযাইমাহ, ২৩৯৭
৬৬৭. ইরওয়াউল গালীল, ৮৪৬ নং হাদীসের অধীনে

প্রশ্ন ৩৩১: বাসার আসবাবপত্রে কি যাকাত দিতে হবে?

জবাব: সবার ঐকমত্যে বাসার আসবাবপত্রে কোনো যাকাত নেই।[৬৬৮]

প্রশ্ন ৩৩২: একজন ব্যবসায়ী শিষে থাকতেই গম কিনে নিয়েছে। এখন যাকাত কাকে দিতে হবে; ক্রেতাকে না কি বিক্রেতাকে?

জবাব: নিঃসন্দেহে চাষিকে, জমিওয়ালাকে দিতে হবে; ক্রেতাকে দিতে হবে না। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, শিষে থাকতে এমন বেচাকেনা জায়েয কি না? মনে হচ্ছে, তাতে ধোঁকায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।[৬৬৯]

৬৬৮. তুরাসুল আলবানী ফিকহ, ১০/৬০৫
৬৬৯. তুরাসুল আলবানী ফিকহ, ১০/৪৮৫

অধ্যায় বারো

সিয়াম

প্রশ্ন ৩৩৩: কেউ নফল সিয়াম ভেঙে ফেললে তাকে কি কাযা আদায় করতে হবে?

জবাব: আয়েশাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أُهْدِىَ لِي وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ فَاشْتَهَيْنَاهَا فَأَفْطَرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ عَلَيْكُمَا صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ ».

একবার আমাকে ও হাফসাকে খাবার উপঢৌকন দেওয়া হয়। তখন আমরা দুজন সিয়াম অবস্থায় ছিলাম। আমরা সিয়াম ভেঙে ফেললাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রবেশ করলেন। আমরা তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের উপঢৌকন দেওয়া হয়েছিল। আমাদের তা খেতে ইচ্ছা করায় আমরা সিয়াম ভেঙে ফেলি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোনো সমস্যা নেই। তবে এর পরিবর্তে একদিন রোজা রাখবে।[৬৭০]

এ হাদীস সহীহ হলেও রোজা রাখার নির্দেশ মুস্তাহাব হিসেবে প্রযোজ্য হতো। এর প্রমাণ হচ্ছে, এক রোজাদার সাহাবীকে খাবারের দাওয়াত দেওয়া হলে তিনি তাকে বলেন,

أَفْطِرْ وَصُمْ مَكَانَهُ يَوْمًا إِنْ شِئْتَ

রোজা ভেঙে ফেলো আর চাইলে এর পরিবর্তে আরেকদিন রোজা রাখো।[৬৭১] হাদীসটি সহীহ।[৬৭২]

প্রশ্ন ৩৩৪: শাওয়ালের রোজার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে ছয়টি রোজা রাখা উত্তম না কি বিচ্ছিন্নভাবে রাখা উত্তম?

জবাব: ধারাবাহিকভাবে রাখা উত্তম।[৬৭৩]

---

৬৭০. সুনানু আবী দাউদ, ২৪৫৭, হাদীসটিকে আলবানী দুর্বল বলেছেন।
৬৭১. আস-সুনানুল কুবরা, ৮৬২২
৬৭২. সিলসিলাতুয যঈফাহ, ১১/১/৩৪০
৬৭৩. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/৩৬

প্রশ্ন ৩৩৫: কেউ যদি রামাদান মাসে দিনের বেলা সহবাস করে তবে তাকে কাফফারা দিতে হয়। কিন্তু তার তখন কাফফারা দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না। পরবর্তীকালে সামর্থ্য অর্জন করলে কি তাকে কাফফারা দিতে হবে?

জবাব: যদি সে তখন কাফফারা দিতে না পারে তবে তার ঘাড়ে কাফফারা জিম্মা থেকে যাবে। তাই যখন সক্ষমতা অর্জন করবে তখন কাফফারা আদায় করবে।[৬৭৪]

প্রশ্ন ৩৩৬: রামাদান মাসে কৃত নফল আমল কি ফরয আমলের সমান? আর ১টি ফরয আমল কি ৭০টি ফরয আমলের সমান?

জবাব: এমন কোনো কিছু নেই। সারা বছরের মতোই রামাদান মাসও।

প্রশ্নকারী: রামাদান মাসে ভালো আমল বা খারাপ আমল করলে কি বৃদ্ধি করা হয়? অনুরূপভাবে মক্কায় কোনো খারাপ বা ভালো আমল করলে কি বৃদ্ধি করা হয়?

জবাব: ফযীলতপূর্ণ স্থান বা ফযীলতপূর্ণ সময়ের কারণে ভালো আমল বা খারাপ আমল বৃদ্ধি করা হয়, এমন কোনো স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। ফযীলতপূর্ণ স্থানের উদাহরণ হলো মক্কা ও মদীনা, আর ফযীলতপূর্ণ সময়ের উদাহরণ হলো, আমাদের এই রামাদান মাস। এ ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই যে, ভালো বা খারাপ আমল বৃদ্ধি করা হয়। তবে কোনো কোনো আলেম উদঘাটন করে বলেছেন যে, বৃদ্ধি করা হয়। এটা তাদের ইজতিহাদ; দলিল নয়। তাই কেউ যদি বলে, 'ভালো আমল বৃদ্ধি করা হয়', তাহলে অসুবিধা নেই। কেননা তা একদল আলেমের মত। তবে এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যাবে না।[৬৭৫]

প্রশ্ন ৩৩৭: কেউ যদি রামাদান মাসে বিনা কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা ভেঙে দেয়, তাহলে কি এমন দলিল আছে যা থেকে প্রমাণ হয়, উক্ত রোজা কাযা করা আবশ্যক?

জবাব: না, তার কাযা করার কোনো সুযোগ নেই। সে একজন পাপী। সে আল্লাহর কাছে তাওবা করবে। তার বিধান মূলত ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত পরিত্যাগকারীর মতো।[৬৭৬]

প্রশ্ন ৩৩৮: রামাদান মাসে কেউ মারা গেলে তার আযাব কি লাঘব করা হয়?

৬৭৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/৫০
৬৭৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/১০৯
৬৭৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/১০৯-১১০

জবাব: এ ব্যাপারে আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই। আল্লাহু আলাম।

প্রশ্নকারী: জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয়?

জবাব: হ্যাঁ, বন্ধ করা হয়। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, মৃতব্যক্তির আযাব লাঘব করা হয়। এমনটা বলার জন্য স্পষ্ট প্রমাণ লাগবে।[৬৭৭]

প্রশ্ন ৩৩৯: জ্যোতির্বিদদের পর্যবেক্ষণ ও হিসাব এবং আধুনিক যন্ত্রের ওপর নির্ভর করে কি রামাদান মাস শুরু করা যাবে?

জবাব: আমরা এটা জায়েয মনে করি না। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

আমরা নিরক্ষর জাতি, লিখি না এবং হিসাব করি না। আর মাস এমন এমন; অর্থাৎ কখনো ২৯ দিন আবার কখনো ৩০ দিন।[৬৭৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ হাদীসে ও অন্যান্য হাদীসে বলেছেন,

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখা শুরু করো, আর চাঁদ দেখে রোজা ভাঙো।[৬৭৯]

এখানে নিজ চোখে দেখার আদেশ দিয়েছেন; হিসাব বা যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা নয়। 'আমরা নিরক্ষর জাতি' বলার মাধ্যমে তিনি যেন বোঝাতে চেয়েছেন, এই উম্মত অনন্তর চর্মচক্ষুতেই দেখবে, তারা জ্যোতির্বিদদের হিসাবের সাহায্য নেবে না।

বলা হয়, চর্মচক্ষুতে দেখলে কখনো ভুল হয়। এ ছাড়া তারা আরও কিছু আপত্তির কথা বলে থাকে। প্রথম কথা হচ্ছে, এটাই শরীআতস্বীকৃত পদ্ধতি। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, তারা চর্মচক্ষুতে দেখার ক্ষেত্রে ভুলের যে আপত্তি তুলেছে সেই ভুল জ্যোতির্বিদ্যার দর্শনেও ঘটে থাকে। তৃতীয় ও শেষ কথা হচ্ছে, আমাদের এই শরীআত সর্বজনীন, সকল যুগ ও স্থানের জন্য উপযোগী।

---

৬৭৭. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/১১৬-১১৭
৬৭৮. সহীহুল বুখারী, ১৯১৩
৬৭৯. সহীহুল বুখারী, ১৯০৯

তিনি এমন একটি আলামত দিয়েছেন যার মাধ্যমে প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তি নতুন চাঁদের উদয় ও শেষ হওয়া জানতে পারবে। কিন্তু যদি জ্যোতির্বিদদের হিসাবের বিধান দেওয়া হতো তাহলে শরয়ী মাস নির্ধারণ নির্দিষ্ট একটি দলের সাথে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ত। অথচ শরয়ী নির্ধারণ সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এমনটা করলে যে দলিল ব্যাপকভাবে এসেছে সে দলিল পরিবর্তন হয়ে একটি নির্দিষ্ট দলের সাথে খাস হয়ে যাবে, আর সাধারণ মানুষ তা থেকে বাদ পড়ে যাবে। এটা আপনাদের রবের পক্ষ থেকে সহজীকরণ এবং রহমত। তাই এখানেই থেমে যাওয়া ওয়াজিব।[৬৮০]

প্রশ্ন ৩৪০: তাড়াতাড়ি ইফতার করা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ?

জবাব: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

كَانَ إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى نَشْزٍ فَإِذَا قَالَ : قَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ

তিনি রোজা অবস্থায় থাকলে এক ব্যক্তিকে উঁচু স্থানে দাঁড়াতে বলতেন। সেই ব্যক্তি যখন বলত, সূর্য ডুবে গেছে, তিনি তখন ইফতার করতেন।[৬৮১]

তাড়াতাড়ি ইফতার করার জন্য সূর্য ডোবা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয়, সূর্য ডুবে যাওয়া নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাড়াতাড়ি ইফতার করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করতেন। তাই তিনি একজনকে উঁচু স্থানে দাঁড়াতে বলতেন আর সে ব্যক্তি সূর্য ডুবে যাওয়ার সংবাদ দিতেন, যেন নবী ﷺ ইফতার করে নেন। তিনি এমনটা করতেন তাঁর এই কথা বাস্তবায়ন করার জন্য;

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ

মানুষ ততদিন কল্যাণে থাকবে যতদিন তারা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে।[৬৮২]

কিন্তু সত্যিকারের আফসোসের কথা হচ্ছে, বর্তমানে মানুষদের দেখি, তারা এই সুন্নাতের বিরোধিতা করছে। তাদের অনেকেই নিজ চোখে দেখে যে, সূর্য ডুবে গেছে এরপরও তারা মুআযযিনের আযান না শোনা পর্যন্ত ইফতার করে না। প্রথমত, তারা জানে না যে, মুআযযিন সূর্য ডোবা দেখে আযান দেয় না, তারা জ্যোতির্বিদ্যার সময় অনুযায়ী আযান দেয়। দ্বিতীয়ত, একই দেশে পাহাড় ও উপত্যকার কারণে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সূর্য ডুবে। আমরা

---

৬৮০. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/১৩৯-১৪০
৬৮১. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ২০৮১
৬৮২. সহীহুল বুখারী, ১৯৫৭

মানুষদের দেখি, তারা ইফতার করে না অথচ তারা দেখছে সূর্য ডুবে গেছে! আরেকদল তো সূর্য ডোবার আগেই পরিষ্কার অবস্থায় ইফতার করে বসে। কারণ, তারা আযান শুনে ফেলেছে! আল্লাহ সহায় হোন।[৬৮৩]

প্রশ্ন ৩৫১: সাহারী খাওয়া অবস্থায় যদি মুআযযিন আযান দিয়ে দেয়, তবে কি সাথে সাথে খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে?

জবাব: 'ফিকহুস সুন্নাহ' গ্রন্থকার বলেন, ফজর উদিত হলে আর মুখে খাবার থাকলে তা মুখ থেকে ফেলে দেওয়া ওয়াজিব।

ইমাম আলবানী তার পর্যালোচনায় বলেন, এমন কথা বলা মূলত কিছু ফিকহী কিতাবের তাকলীদ। এ ব্যাপারে সুন্নাতে মুহাম্মাদীতে কোনো দলিল নেই; বরং তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস পরিপন্থি। নবী ﷺ বলেন,

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

যখন তোমাদের কেউ আযান শুনবে এমতাবস্থায় তার হাতে পাত্র থাকবে, সে যেন সেখান থেকে তার প্রয়োজন পূরণ করার আগে পাত্র না রাখে।[৬৮৪]

হাদীসটি আহমাদ, আবু দাউদ ও হাকিম বর্ণনা করেছেন। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। ইবন হাযম হাদীসটি কিছু অংশ এভাবে বৃদ্ধি করে বর্ণনা করেন; আবু হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণনাকারী আম্মার বলেন,

وَكَانُوا يُؤَذِّنُوْنَ إِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ

যখন স্পষ্টভাবে ফজর উদিত হতো, তখন তারা আযান দিতেন।

হাম্মাদ ইবন সালামাহ হিশাম ইবন উরওয়া থেকে বর্ণনা করেন, হিশাম বলেন, আমার পিতাও এমন ফাতাওয়া দিতেন। এর সনদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

এর আরও শাহিদ রয়েছে। আমি সেসব শাহিদ 'আত-তালীকাতুজ জিয়াদ' ও সহীহাতে (১৩৯৪) উল্লেখ করেছি।

---

৬৮৩. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ২০৮১ নং হাদীসের অধীনে

৬৮৪. সুনানু আবী দাউদ, ২৩৫২

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, ফজর উদিত হওয়ার সময় যদি কারো হাতে খাবার বা পানীয়র পাত্র থাকে তবে প্রয়োজন পূরণ করা পর্যন্ত সেই পাত্র না রাখা বৈধ। আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

তোমরা খাও ও পান করো ফজরে কালো সুতা থেকে সাদা সুতা স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত।[৬৮৫]

থেকে এ বিধান ভিন্ন হবে। এ আয়াতের মতো যেসব হাদীসে ফজর উদিত হলে সাহারীর সময় শেষ বলা হয়েছে সেসব হাদীস ও ইজমার সঙ্গে উপর্যুক্ত হাদীসের কোনো বিরোধ নেই। এমনকী একদল সাহাবীসহ আরও অনেকে উপর্যুক্ত হাদীসে যা বলা হয়েছে তার চেয়ে আরও বেশি তাগিদ দিয়েছেন। তারা বলেছেন, ফজর স্পষ্ট হওয়া এবং রাস্তায় শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত সাহারী খাওয়া জায়েয; দেখুন 'ফাতহুল বারী', ৪/১০৯-১১০।

এ হাদীসের আরেকটি ফায়েদা হচ্ছে, ফজর উদিত হওয়ার ১৫ মিনিট পূর্বে খাওয়া বন্ধ করে দেওয়ার মতো বিদআতকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। তারা এমনটা করে এই আশঙ্কায় যে, সাহারী করা অবস্থায় ফজরের আযান হয়ে যাবে। তারা এই ছাড়ের কথা জানলে উল্লিখিত বিদআতে জড়িত হতো না। তাই চিন্তাভাবনা করে যথাযথ পদক্ষেপ নিন।[৬৮৬]

প্রশ্ন ৩৪২: সাহারী খাওয়া কি ওয়াজিব? কারণ, হাদীসে সাহারী খাওয়ার ক্ষেত্রে আদেশসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর আদেশসূচক শব্দ মূলত ওয়াজিব প্রমাণ করে।

জবাব: আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

তোমরা সাহারী খাও। কারণ, সাহারীতে বরকত রয়েছে।[৬৮৭]

আলেমদের ইজমা হচ্ছে, হাদীসে আদেশসূচক শব্দ মানদুব ও মুস্তাহাবের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। সাহারীতে যে বরকত রয়েছে তা একেবারে স্পষ্ট ও প্রমাণিত। কারণ, রোজা পালনে শক্তি জোগায়, রোজাদারকে প্রফুল্ল রাখে এবং রোজা রাখা খুব কষ্টকর মনে না হওয়ায় বেশি

৬৮৫. সূরা বাকারাহ, ২:১৮৭
৬৮৬. তামামুল মিন্নাহ, পৃ. ৪১৭
৬৮৭. সহীহুল বুখারী, ১৯২৩

বেশি রোজা রাখার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। এ ছাড়াও অনেকে এ হাদীসের অন্য ব্যাখ্যা করেছেন। অতএব, সাহারী খাওয়া ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। আল্লাহু আলাম।[৬৮৮]

প্রশ্ন ৩৪৩: দিনের বেলা হিজামা লাগালে কি রোজা ভেঙে যায়?

জবাব: হাদীসে এসেছে,

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

যে হিজামা করে এবং যার হিজামা করা হয় উভয়ই রোজা ভেঙে ফেলেছে।[৬৮৯]

নবী ﷺ থেকে হাদীসটি এগারোজন বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ।

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: « أَفْطَرَ هَذَانِ ». ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ.

প্রথমদিকে রোজাদারের জন্য হিজামা লাগানো অপছন্দ করা হতো না। একদিন জাফার ইবন আবী তালিব ﷺ হিজামা করছিলেন আর তার পাশ নবী ﷺ যাচ্ছিলেন। তিনি তা দেখে বললেন, উভয়ে রোজা ভেঙে ফেলেছে। এরপর তিনি রোজাদারের জন্য হিজামা লাগানোর ব্যাপারে ছাড় দেন। (আর আনাস ﷺ রোজা অবস্থায় হিজামা লাগাতেন)[৬৯০]

আনাস ﷺ'র হাদীস থেকে একেবারেই স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, 'যে হিজামা করে এবং যার হিজামা করা হয় উভয়ই রোজা ভেঙে ফেলেছে।'-হাদীসটি মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।

ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.

নবী ﷺ রোজা অবস্থায় হিজামা লাগান।[৬৯১] হাদীসটি সহীহ।

ইবন আব্বাসের ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি সূর্য ডোবার পূর্বে হিজামাকারী ও হিজামার জিনিসপত্র প্রস্তুত করে রাখতেন, অতঃপর সূর্য ডুবে গেলে হিজামা করতেন।

৬৮৮. আত-তালীক আলাত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৪৫৬

৬৮৯. সুনানু আবী দাউদ, ২৩৬৯

৬৯০. আস-সুনানুল কুবরা, ৮৫৬১, হাদীসটি আলবানী গ্রহণযোগ্য বলেছেন।

৬৯১. সুনানু আবী দাউদ, ২৩৭৪

আমি ইবন আব্বাসের ব্যাপারে বর্ণিত উপর্যুক্ত কথার কোনো সনদ পাইনি এবং কোনো উৎসগ্রন্থেও এ ব্যাপারে কিছুই অবহিত হতে পারিনি। আর আমি তা সহীহও মনে করি না। কারণ, ইবন আব্বাস ﷺ থেকে এর বিপরীতে মত বর্ণিত হয়েছে। তিনি রোজা অবস্থায় হিজামা করার ব্যাপারে বলেন,

.وَإِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ

রোজা ভাঙে ভেতরে প্রবেশ করলে, বের হলে ভাঙে না।[৬৯২]

এর সনদ সহীহ। সমস্ত রাবী বুখারী-মুসলিমের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। আবু যবইয়ানের নাম হুসাইন ইবন জুনদুব আল-জুনবী আল-কূফী।

এটি স্পষ্ট প্রমাণ যে, ইবন আব্বাস ﷺ মনে করতেন হিজামা লাগালে রোজা ভঙ্গ হয় না। তার মতামত খোদ তারই বর্ণিত হাদীসের অনুকূলে। একজন বর্ণনাকারী তার বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে অন্যের চেয়ে বেশি জানেন। তিনি যা বর্ণনা করেছেন তা মানসূখ বা রহিত না হলে তার কাছে গোপন থাকত না ইনশাআল্লাহ। এ মতকে আরও শক্তিশালী করে আবু সাঈদ খুদরী ও আনাস ﷺ'র হাদীস। উভয়ের হাদীস প্রমাণ করে ইবন আব্বাসের হাদীসের বিধান জারি আছে; 'যে হিজামা করে এবং যার হিজামা করা হয় উভয়ই রোজা ভেঙে ফেলেছে।'-হাদীসটি মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।[৬৯৩]

প্রশ্ন ৩৪৪: নাক থেকে কণ্ঠনালিতে কফ প্রবেশ করলে কি রোজা ভেঙে যাবে?

জবাব: সরাসরি নাক থেকে কণ্ঠনালিতে কফ প্রবেশ করলে রোজা ভাঙবে না।

প্রশ্নকারী: যদি মুখ থেকে গিলে নেয় তবে কি রোজা ভাঙবে?

জবাব: প্রিয় ভাই আমার! এটারও বিধান একই। বাইরের কোনো কিছু গ্রহণ করা জায়েয নয়। কারণ, বাইরের জিনিস খাবার ও পানীয়র মতোই। যদি তা নোংরা কোনো কিছু হয় তবে বাইরে ফেলে দেবে, কিন্তু গিলে ফেললে রোজা ভাঙবে না। তবে শর্ত হচ্ছে, মুখের বাইরে বের হয়ে যাবে না। মুখের বাইরে বের হওয়ার পর আবার গিলে ফেললে রোজা ভেঙে যাবে।[৬৯৪]

---

৬৯২. মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ, ৯৪১১

৬৯৩. ইরওয়াউল গালীল, ৯৩১ নং হাদীসের অধীনে, পরিমার্জিত।

৬৯৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/২২৩-২২৪, পরিমার্জিত

প্রশ্ন ৩৪৫: রোজা অবস্থায় ইনজেকশন ব্যবহার করলে কি রোজা ভেঙে যাবে?

জবাব: ইনজেকশন দুই প্রকার। অধিকাংশ ইনজেকশনের কারণে রোজা ভাঙে না। তবে এক প্রকার ইনজেকশন গ্রহণ করলে রোজা ভেঙে যায়। এ ধরনের ইনজেকশন আসলে খাদ্য ও পানীয় কাজ করে। অন্য প্রকার ইনজেকশন খাদ্য ও পানীয়ের কাজ করে না। যে প্রকার ইনজেকশন খাদ্য ও পানীয়ের কাজ করে তা গ্রহণ করলে রোজা ভেঙে যাবে। আর যে প্রকার ইনজেকশন খাদ্য ও পানীয়ের কাজ করে না তা ব্যবহার করলে রোজা ভাঙবে না। আর এ ধরনের ইনজেকশন মুখ ও নাকে ব্যবহার না করে শরীরের যে-কোনো অঙ্গে ব্যবহার করলে রোজা ভাঙবে না।[৬৯৫]

প্রশ্ন ৩৪৬: পেটের অসুখ অনুসন্ধান করার জন্য ডাক্তারেরা পেটে যে যন্ত্র প্রবেশ করায় তাতে কি রোজা নষ্ট হয়ে যাবে?

জবাব: এ বিষয়টিতে আসলে ডাক্তাররাই ভালো বলতে পারবেন। তবে আমি বলব, তারা যে যন্ত্র প্রবেশ করান তাতে স্প্রের মতো কোনো ওষুধ না থাকলে বরং তা স্রেফ লৌহখণ্ড হলে এবং তা গন্তব্যস্থানে প্রবেশ করানোর পর বের করে নিলে রোজা নষ্ট হবে না। কারণ, তা খাবার ও পানীয় নয়।[৬৯৬]

প্রশ্ন ৩৪৭: কেউ যদি কোনো অখাদ্য (যেমন পাতা) খায়, তবে তার রোজার বিধান কী?

জবাব: কেউ এমনটা করবে আমি তা চিন্তাও করতে পারি না। আর যদি এমনটা হয়েই থাকে, তবে যে পাতা খাবে তার তো নিশ্চয় একটা উদ্দেশ্য থাকবে। পাতা খাওয়ার সময় ছাগল যা করে সেও তা করবে। তাই অন্যান্য খাবার খেলে যে বিধান প্রযোজ্য হয়, পাতা খেলেও সে বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ রোজা নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রশ্নকারী: কেউ যদি ওষুধ খায়, যেমন মাথা ব্যথার বড়ি খায়, তবে তার বিধান কী?

জবাব: গিলে (গলাধঃকরণ করে) খায় বোঝাতে চাচ্ছেন?

প্রশ্নকারী: হ্যাঁ।

জবাব: একই বিধান। অর্থাৎ রোজা নষ্ট হয়ে যাবে।[৬৯৭]

---

৬৯৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/২২৫, পরিমার্জিত
৬৯৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/২২৬
৬৯৭. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/২২৮

প্রশ্ন ৩৪৮: কেউ রোজা রাখার নিয়তে সাহারী খেয়েছে এবং রোজার নিয়তে সকাল অতিবাহিত করেছে। কিন্তু দিনের বেলায় রোজা ছেড়ে দেবে কি না তা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দে পড়ে গিয়েছে; যদিও কোনো কিছু খায়নি। এমন দ্বিধাদ্বন্দের কারণে তার রোজা কি নষ্ট হয়ে যাবে?

জবাব: এমন দ্বিধাদ্বন্দের কারণে রোজা নষ্ট হবে না। তাই সে সেদিন রোজা রাখবে।[৬৯৮]

প্রশ্ন ৩৪৯: হাদীসে রোজা অবস্থায় জোরালোভাবে নাকে পানি প্রবেশ করাতে নিষেধ করা হয়েছে। কারো নাকের পানি যদি কণ্ঠনালিতে চলে যায় তাহলে কি তার রোজা নষ্ট হয়ে যাবে?

জবাব: ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটা করলে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে।[৬৯৯]

প্রশ্ন ৩৫০: স্ত্রী রামাদান মাসে দিনের বেলা স্বামীকে উত্তেজিত করে এবং তার ঘনিষ্ঠ হয়। ফলে স্বামী তার সাথে মিলন করে বসে। মিলনের পেছনে স্ত্রীই ছিল এর পেছনে মূল কারণ। এখন কি স্ত্রীকেও কাফফারা দিতে হবে?

জবাব: না, দিতে হবে না। কাফফারা লাগবে শুধু স্বামীর জন্য। কারণ, স্বামীই তো ঘোটক।[৭০০]

প্রশ্ন ৩৫১: কেউ যদি রামাদান মাসে দিনের বেলা স্ত্রীর সঙ্গে একাধিকবার মিলন করে তাহলে কি তাকে একাধিকবার কাফফারা দিতে হবে?

জবাব: যদি একদিনেই একাধিকবার মিলন করে তবে একবার কাফফারা দিতে হবে। আর যদি আলাদা আলাদা দিন বা একাধিক দিন মিলন করে তবে দিন হিসেবে কাফফারা লাগবে।[৭০১]

প্রশ্ন ৩৫২: রামাদান মাসে দিনের বেলা স্ত্রীর সাথে মিলন করলে কাফফারা আদায় এবং ঐ দিন রোজা কাযা করার কথা কতটুকু সঠিক? আমরা তো হাদীসে কাফফারার কথা পাই; কিন্তু ঐ দিন কাযা করার দলিল কতটুকু সহীহ?

জবাব: কাযা করার ব্যাপারে কিছু হাদীস রয়েছে। হাফিয ইবন হাজার আসকালানী বলেন,

৬৯৮. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/২৩২-২৩৩, পরিমার্জিত

৬৯৯. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/২৩৪

৭০০. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/২৩৯

৭০১. প্রাগুক্ত

নবী ﷺ দিনের বেলা মিলন করার মাধ্যমে রোজা নষ্টকারীকে কাযা করার আদেশ দেন। সেসব হাদীস এককভাবে দুর্বল, যেমনটি ইবন হাজার বলেছেন। তবে সবগুলোর সমন্বয়ে হাদীসগুলো শক্তিশালী হয়ে যায়। সেসব হাদীসের আলোকে মত দেওয়া হয়েছে যে, মিলন করার মাধ্যমে রোজা নষ্টকারীর জন্য কাফফারা দেওয়া ওয়াজিব, তেমনি ঐ দিন কাযা করাও ওয়াজিব। আর কাফফারার বিষয়টি তো পরিচিতই।[৭০২]

প্রশ্ন ৩৫৩: কেউ যদি ফরয রোজা কাযা করে তবে কি বিনা ওযরে উক্ত কাযা রোজা ভাঙতে পারবে?

জবাব: উম্মু হানী ﷺ বলেন,

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَنَاوَلَنِي فَضْلَ شَرَابِهِ فَشَرِبْتُهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ فَقَالَ : إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَلاَ تَقْضِيهِ

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে প্রবেশ করেন। তিনি তার অতিরিক্ত পানি আমাকে দিলে আমি পান করি আর বলি, আমি রোজা অবস্থায় ছিলাম কিন্তু আপনার উচ্ছিষ্ট ফেরত দিতে আমি অপছন্দ করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি এ রোজা রামাদানের কাযা হয়ে থাকে তবে এর বদলে আরেকদিন কাযা করবে, আর যদি নফল রোজা হয়ে থাকে তবে চাইলে কাযা করবে আবার চাইলে কাযা করবে না।[৭০৩]

এ হাদীস উল্লেখ করে ইমাম শাওকানী বলেন, এ হাদীস প্রমাণ করে যে, কাযাকারী রোজা ভেঙে দিতে পারে এবং তার বদলে আরেকদিন রোজা রাখবে।

ইমাম আলবানী তার খণ্ডনে বলেন,

ক. এই হাদীস থেকে প্রমাণ হয় না রোজা ভেঙে ফেলা জায়েয। কারণ, কাযা করার আদেশ দ্বারা রোজা ভেঙে ফেলা জায়েয প্রমাণ হয় না; যা কারো অজানা নয়। আপনি জানেন, সবার ঐকমত্যে রামাদান মাসে দিনের বেলা মিলনের মাধ্যমে রোজা ভেঙে ফেলা জায়েয নয় অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ মিলনের কারণে কাফফারার সাথে সাথে কাযা করতেও আদেশ

৭০২. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/২৪১
৭০৩. আস-সুনানুল কুবরা, ৮৬২১

দিয়েছেন। আর মিলনের কারণে কাযা করার বিধান একাধিক সনদে প্রমাণিত, যেমনটি আমি 'সহীহ আবু দাউদ' (২০৭৩) উল্লেখ করেছি। এ কারণে হাদীসগুলো ইবন হাজার আসকালানী শক্তিশালী বলেছেন আর শাওকানীও 'নাইলুল আওতার' (৪/১৮৪-১৮৫) ও 'আস-সাইলুল জাররার' (২/১২০-১২১) গ্রন্থে আসকালানীর অনুসরণ করেছেন। তাই উম্মু হানী ﷺ যদি ফরয কাযাও ভেঙে থাকেন তাহলে প্রমাণ হয় না যে, তিনি যা করেছেন তা জায়েয। আর যদি তিনি নফল রোজা ভেঙে থাকেন তবে তো আর প্রশ্নই আসে না।

খ. তিরমিযী ও অন্যান্য গ্রন্থে এসেছে, উম্মু হানী ﷺ বলেছিলেন, আমি পাপ করে ফেলেছি। আপনি আমার জন্য ইসতিগফার করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, কী করেছ? তিনি বললেন, আমি রোজা অবস্থায় ছিলাম কিন্তু রোজা ভেঙে ফেলেছি। নবী ﷺ বললেন, তুমি কোনো রোজার কাযা আদায় করছিলে কি? উম্মু হানী বললেন, না।[৭০৪]

উম্মু হানী যেহেতু নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছিলেন সেক্ষেত্রে তিনি কাযা রোজা ভেঙে ফেললেও তাকে তো আর দোষারোপ করার সুযোগ থাকে না। তখন শুধু তাকে আবার কাযা করা ওয়াজিব জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন ছিল। হাদীস থেকে এটাই প্রমাণ হয়। ইমাম আবু দাউদ উপর্যুক্ত হাদীসের শেষে আরও বৃদ্ধি করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, 'যদি তা নফল রোজা হয়ে থাকে তবে তোমার কোনো ক্ষতি নেই।' এখান থেকে প্রমাণ হয়, কাযা রোজা হয়ে থাকলে ক্ষতি আছে। আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে ইনশাআল্লাহ।

গ. আরেকটি দলিল হলো, মূল বিধানকে গণ্য করতে হবে। আর মূল বিধান হলো, রামাদান মাসে বিনা ওযরে রোজা ভেঙে ফেলা জায়েয নয়। অনুরূপ কাযা রোজাও ভেঙে ফেলা জায়েয নয়। যে-ব্যক্তি উভয়ের মাঝে পার্থক্য করবে তাকে দলিল দিতে হবে।[৭০৫]

প্রশ্ন ৩৫৪: আশুরা, আরাফাসহ যে-সমস্ত রোজার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে সে-সমস্ত রোজা কেউ যদি ওযরবশত করতে না পারে তবে কি পরবর্তীকালে কাযা করা যাবে?

জবাব: না, যাবে না।[৭০৬]

---

৭০৪. সুনানুত তিরমিযী, ৭৩১, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
৭০৫. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ৬/২/৭১৭-৭১৯
৭০৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/২৫৮

প্রশ্ন ৩৫৫: কারো ওপর রামাদানের রোজা কাযা আছে। কয়েক বছর বা কয়েক রামাদান অতিক্রম করা সত্ত্বেও সেসব কাযা রোজা আদায় করেনি। এখন সে সেসব রোজা কাযা করতে চায়। সে কি শুধু ঐদিনগুলো কাযা করবে না কি কাযাসহ আরও কিছু কাফফারা দিতে হবে?

জবাব: এতে কোনো ক্ষতি নেই। তার দায়িত্ব হচ্ছে, সুযোগ পাওয়া মাত্রই সেসব কাযা রোজা তিনি আদায় করবেন, যদিও অনেক রামাদান অতিক্রম করে। উত্তম হচ্ছে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই খুব তাড়াতাড়ি কাযা রোজা আদায় করে নেবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ

তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও জমিন বরাবর।[৭০৭]

এরপরও কেউ তাড়াতাড়ি কাযা আদায় না করলে তার জিম্মা থেকে সেসব রোজা বাতিল হবে না বরং তাকে অবশ্যই কাযা করতে হবে। এক রামাদান থেকে আরেক রামাদান বা কয়েক রামাদান পার হয়ে গেলেও শুধু বাদ যাওয়া রোজাগুলোর কাযা আদায় করতে হবে, অন্য কোনো কিছু তাকে করা লাগবে না।[৭০৮]

প্রশ্ন ৩৫৬: আমার কখনো কখনো রামাদানের একটি রোজা কাযা হয়ে যায়। আবার আমি শাওয়ালের ছয়টি রোজাও রাখতে চাই। আমি কি দুই নিয়তে তথা কাযা ও শাওয়ালের নিয়তে একই রোজা রাখতে পারব?

জবাব: আপনি প্রশ্ন করেছেন, দুই নিয়তে এক রোজা রাখা বৈধ কি না? এর জবাব হচ্ছে, হ্যাঁ, বৈধ। তবে এখন আপনার সামনে তিনটি স্তর উল্লেখ করব। তন্মধ্যে যেটা ভালো মনে হয়, আপনি সেটা গ্রহণ করতে পারেন।

প্রথম স্তর: এই স্তর সবচেয়ে উঁচু। তা হলো, কাযা রোজার জন্য আলাদা দিন রোজা রাখবে, আর শাওয়ালের রোজার জন্য আলাদা দিন রোজা রাখবে। অর্থাৎ আলাদা আলাদা রোজা রাখবে। কারণ, আমরা জানি, প্রতিটি ভালো কাজ দশগুণ বৃদ্ধি করা হয়। তাই যদি রামাদানের একদিন রোজা রাখে তবে কমপক্ষে দশদিন বৃদ্ধি করা হবে। আবার শাওয়ালের একদিন রোজা রাখলে তাও দশদিন বৃদ্ধি করা হবে। এভাবে বিশদিন হয়ে যাচ্ছে। আর তাই এ অবস্থাটি উত্তম।

৭০৭. সূরা আলে-ইমরান, ৩:১৩৩
৭০৮. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/২৫৭-২৫৮

দ্বিতীয় স্তর: তার প্রস্তুতি নেই। তার সময় নেই। তার শক্তি নেই। অথবা এরকম অন্যান্য কারণ আছে। আর সে রামাদানের একটি রোজা বা ছয়টি রোজা কাযা করতে চায় এবং শাওয়ালের ছয়টি রোজাও রাখতে চায়। এক্ষেত্রে সে রামাদানের কাযা রোজা আদায়ের নিয়ত করবে এবং তার সাথে শাওয়ালের রোজারও নিয়ত করে ফেলবে। এমনটা করলে সে বিশগুণ সওয়াব পাবে না, কেবল দশগুণই সওয়াব পাবে। এই অতিরিক্ত দশগুণ সওয়াব দেওয়া হবে তার উত্তম নিয়তের কারণে। কেননা হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন,

إذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ

আমার বান্দা যদি ভালো কাজের ইচ্ছা করে অথচ তা এখনো করেনি তবুও তার জন্য একটি সওয়াব লিখে দাও। আর যদি তা করে ফেলে তবে দশ থেকে ৭শ' থেকে অনেক অনেক গুণ লিখে দাও।[৭০৯]

এই হচ্ছে দ্বিতীয় স্তর। তাহলে এতে তার জন্য কমপক্ষে ১১টি সওয়াব লিখা হবে।

তৃতীয় স্তর: শুধু ফরয রোজা আদায় করবে। শাওয়ালের রোজা আদায় করবে না; বরং তার পক্ষে জানাই সম্ভব হবে না যে, এখন সে শাওয়াল মাসে অবস্থান করছে; যেমনটি অসচেতন অনেক আরব লোক এমন হয়ে থাকে।[৭১০]

প্রশ্ন ৩৫৭: এক ব্যক্তির ওপর রামাদানের রোজা কাযা আছে। সে যদি শাওয়ালের রোজা রাখতে চায় তবে প্রথমে শাওয়ালের রোজা রাখবে না কি প্রথমে কাযা রোজা রাখবে?

জবাব: যে রোজা তার ওপর কাযা আছে তা দ্বারা শুরু করবে। কারণ, শাওয়ালের ছয় রোজার তুলনায় কাযা রোজা তার ওপর অধিক ওয়াজিব। তবে যদি প্রথমে শাওয়ালের ছয় রোজা রাখে তারপর রামাদানের রোজা রাখে তাহলে অসুবিধা নেই। তবে উত্তম হচ্ছে, অধিক ওয়াজিব আগে রাখা। আর অধিক ওয়াজিব হচ্ছে কাযা রোজা।[৭১১]

---

৭০৯. সহীহুল বুখারী, ৬৪৯১
৭১০. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/২৬৫-২৬৬
৭১১. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/২৮৭

প্রশ্ন ৩৫৮: এক ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে রামাদানের রোজা ছেড়ে দেয়। গোটা বছর সে অসুস্থ ছিল, ফলে তার পক্ষে কাযা করা সম্ভব হয়নি। এমনকী পরবর্তী রামাদানও চলে এসেছে। এই রামাদানেও অসুস্থতার কারণে রোজা রাখতে পারছে না। এখন সে কি কাফফারা দিয়ে দেবে? উল্লেখ্য, সমূহ সম্ভাবনা আছে, সে আর সুস্থ হবে না।

জবাব: যদি ডাক্তারেরা বলে, প্রবল ধারণা অনুযায়ী এই অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যাবে, তাহলে তাদের কথা মেনে নিতে হবে। এমনটা হলে কাফফারা দেওয়া যাবে না। সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

আর যদি ডাক্তারেরা বলে, প্রবল ধারণা অনুযায়ী এ অসুস্থতা আর ভালো হবে না, তাহলে সে প্রতি রামাদানে রোজা ভেঙে ফেলবে এবং প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাবার দিয়ে কাফফারা প্রদান করবে।[৭১২]

প্রশ্ন ৩৫৯: গর্ভবতী কিংবা দুগ্ধদানকারিণী মহিলা যদি নিজের বা সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কায় রোজা ভেঙে ফেলে, তাহলে কি সে কাফফারা দেবে? কাফফারা দিলে খাদ্য না দিয়ে নগদ টাকা দিলে কি হবে না? আর চাল বা খাদ্য দিলে কত পরিমাণ দিতে হবে?

জবাব: গর্ভবতী কিংবা দুগ্ধদানকারিণী মহিলাকে রামাদানের রোজা কাযা করতে হবে না; বরং সে কাফফারা দিয়ে দেবে। আর কাফফারা হচ্ছে, প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো। কাফফারা দীনার বা দিরহাম দিয়ে দিলে হবে না; বরং সেই খাবার দেবে যে খাবার সে নিজে খায়। এ ক্ষেত্রে সকাল বা সন্ধ্যা যে-কোনো বেলার খাবার দিলেই হবে। আর এর পরিমাণ হচ্ছে, যে-কোনো খাবার হোক না কেন, তত পরিমাণ দিতে হবে যত পরিমাণ খেলে মিসকীনের তৃপ্তি আসবে।[৭১৩]

প্রশ্ন ৩৬০: এক মহিলা এমন বয়সে পৌঁছে গেছে যখন তার আর হায়েয আসে না। হায়েযের রক্ত কেটে যাওয়ার আট মাস পর হঠাৎ এক দিনের বেলা একেবারে স্বল্প কিছু রক্ত এসেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এ রক্তকে কি হায়েয গণ্য করে রোজা ভেঙে ফেলতে হবে না কি অন্য কোনো বিধান আছে?

৭১২. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/২৮৮
৭১৩. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/২৯৮-২৯৯, পরিমার্জিত

জবাব: যদি এই কথা সত্য হয় যে, তার হায়েয কেটে গেছে তবে এ রক্ত ইস্তিহাযার। তবে আশঙ্কা হচ্ছে, তার হায়েযের রক্ত শেষ হয়নি। কেননা নিজ ঘরের কথা সে নিজে বেশি জানে। সেই মহিলা যদি প্রায় নিশ্চিত হয় যে, তার হায়েয কেটে গেছে তবে ঐ রক্তকে ইস্তিহাযা গণ্য করে রোজা রাখবে, সালাত আদায় করবে এবং অন্যান্য যাবতীয় আমল করবে।[৭১৪]

প্রশ্ন ৩৬১: সফর অবস্থায় রোজা রাখা উত্তম না কি রোজা ছেড়ে দেওয়া উত্তম?

জবাব: সফর অবস্থায় রামাদানের রোজা রাখা না রাখা নিয়ে পরিচিত একাধিক মতে আলেমগণ ইখতিলাফ করেছেন। এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, সফর অবস্থায় রোজা ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কাযা করতে যদি অসুবিধা না হয় তবে আমার প্রিয় মত হচ্ছে, রোজা ছেড়ে দেওয়া। আর যদি কাযা করতে অসুবিধা হয় তবে রোজা রাখা আমার প্রিয় মত। আল্লাহু আলাম।[৭১৫]

প্রশ্ন ৩৬২: ইতিকাফকারী কী কী কাজ করতে পারে?

জবাব: **ক.** পেশাব-পায়খানার জন্য বের হওয়া জায়েয। গোসল করা ও মাথা আঁচড়িয়ে দেওয়ার জন্য মাথা মসজিদের বাইরে বের করা বৈধ। আয়েশাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে ইতিকাফ করা অবস্থায় তাঁর মাথা আমার কাছে হেলিয়ে দিতেন আর সেসময় আমি আমার ঘরে অবস্থান করতাম। আমি তখন তাঁর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি তার মাথা ধুয়ে দিতাম। আমার ও তাঁর মাঝে ফারাক হিসেবে দরজার চৌকাঠ থাকত। আর আমি তখন হায়েযগ্রস্ত থাকতাম। তিনি ইতিকাফ অবস্থায় প্রয়োজন ছাড়া ঘরে প্রবেশ করতেন না।[৭১৬]

খ. ইতিকাফকারী ও অন্যান্যদের জন্য মসজিদে অজু করা জায়েয। কারণ, নবী ﷺ-এর খাদিম বলেন, নবী ﷺ মসজিদে হালকা অজু করেছেন।[৭১৭]

গ. মসজিদের পেছনে ছোটো একটা চাঁদোয়া বানিয়ে নেবে, যেখানে বসে ইতিকাফ করবে। কারণ, নবী ﷺ ইতিকাফ করলে আয়েশাহ ﷺ তাঁর জন্য তাঁবু বানাতেন। তিনি তা বানাতে আদেশ দিতেন। একবার তিনি একটা ছোটো তাঁবু টানান। সেই তাঁবুর দরজায় একখানা চাটাই ছিল।[৭১৮]

---

৭১৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১০/৩০৬
৭১৫. সিলসিলাতুস যঈফাহ, ২/৩৩৬-৩৩৭
৭১৬. হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, ইবন আবী শাইবাহ, আহমাদ ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন। সহীহ আবূ দাউদ, ২১৩১, ২১৩২
৭১৭. মুসনাদ আহমাদ, ৫/৩৬৪
৭১৮. কিয়ামু রমাদান, পৃ. ৩৭

অধ্যায় তেরো

হজ

প্রশ্ন ৩৬৩: কেউ কেউ বলেন, তামাত্তু থেকে হজে ইফরাদ উত্তম। কারণ, আবু বাকর ও উমার হজে ইফরাদ করতেন। অন্যদিকে হজে তামাত্তু উত্তম হলে তারা ব্যাপারটা অবশ্যই জানতেন। এক্ষেত্রে যারা তামাত্তু থেকে হজে ইফরাদ উত্তম বলে তাদের আমরা কীভাবে জবাব দেব?

জবাব: যে হজে ইফরাদকে আমরা অনুত্তম বলছি, তা কখনো অনুত্তম হতে পারে আবার কখনো ক্ষেত্রবিশেষে উত্তমও হতে পারে। তবে হজে ইফরাদ সামগ্রিকভাবে হজে কিরান ও হজে তামাত্তু থেকে উত্তম হওয়ার ব্যাপারে কোনো দলিল নেই।

এরা মূলত নিজেদের মতকে যে-কোনো মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করতে তর্ক করতে চায়। এরা কিছুতেই সুন্নাহর সহযোগী নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ হজে কিরান করেন এবং তিনি মানুষদের দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দেন, তারা যে কিরান হজ করছে তার চেয়ে তামাত্তু উত্তম। এর প্রমাণ হচ্ছে, নবী ﷺ বলেন,

إِنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً

যদি আমি আগেই ব্যাপারটি বুঝতে পারতাম তাহলে আমি সাথে করে কুরবানীর পশু আনতাম না এবং এ ইহরামকে উমরাওয়ালা ইহরামে পরিবর্তন করে দিতাম।[৭১৯]

যদি সহীহভাবে প্রমাণিত হয় যে, আবু বাকর হজে ইফরাদ করেছেন তবে তা প্রচলিত নিয়মে করেছেন। তারা কেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হজের কথা এবং তিনি সাহাবীদের যা নির্দেশ দিয়েছেন তা ভুলে যায়? তারা তাঁর এই কথা ভুলে যায়:

دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

কেয়ামত পর্যন্ত উমরা হজে প্রবেশ করেছে। এ কথা বলার পর তিনি আঙুল পরস্পরের মাঝে প্রবেশ করান।[৭২০]

৭১৯. সহীহুল বুখারী, ১৬৫১; সহীহ মুসলিস, ২৮৪০
৭২০. মুসনাদ আহমাদ, ২২৮৭

আমরা বলি না যে, হজে ইফরাদ বাতিল। আমরা বাতিল বলাকে কিছুতেই শরীআতসম্মত মনে করি না।

এ জন্য আমি যে-কোনো হাজীকে হজে তামাত্তু করতে নসীহত করি। তামাত্তু ছাড়া অন্য হজ করতে চাইলে হজে কিরান করতে নসীহত করি। নবী ﷺ হজে কিরান করেন এবং যুলহুলাইফাহ থেকে কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে যান। কুরবানী ছাড়া হজে কিরান করতে তিনি নিষেধ করেছেন। এ ব্যাপারে সবচেয়ে স্পষ্ট দলিল হচ্ছে,

دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

কেয়ামত পর্যন্ত উমরা হজে প্রবেশ করেছে।[৭২১]

কারণ, এটি ব্যাপক বিধান। এটা এমনটা নয় যেমনটা কোনো কোনো সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, হজে তামাত্তু সাহাবীদের জন্য খাস ছিল। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া যখন মারওয়ায় থাকা অবস্থায় মানুষদের হালাল হয়ে যেতে বলেন এবং বলেন, যদি আমি কুরবানীর পশু না আনতাম তবে তোমাদের সাথে হালাল হয়ে যেতাম-তখন সুরাকা ইবন মালিক জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের হজে তামাত্তু শুধু এ বছরের জন্য প্রযোজ্য না কি স্থায়ীভাবে প্রযোজ্য? তখন তিনি বলেন, না বরং স্থায়ীভাবে প্রযোজ্য। কেয়ামত পর্যন্ত উমরা হজে প্রবেশ করেছে। এ কথা বলার পর তিনি আঙুল পরস্পরের মাঝে প্রবেশ করান।[৭২২]

প্রশ্ন ৩৬৪: শিশুদের কি কুরবানী দিতে হবে?

জবাব: যে-ব্যক্তি তার শিশুকে হজ করাতে চায়, তাহলে সে যেমন নিজে হজের সমস্ত হুকুম নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে তেমনি শিশুর ওপরও সমস্ত আহকাম প্রয়োগ করতে হবে। এটা আবশ্যক। আর হজের একটি হুকুমই হলো কুরবানী।

যদি শিশুর পক্ষ থেকে কেউ কুরবানী দিতে না পারে তাহলে কুরবানী দিতে না পারা সংশ্লিষ্ট বিধান তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। আর তা হলো, তার পক্ষ থেকে রোজা রাখবে। আমার বোধ ও ইজতিহাদের আলোকে এটাই মনে হয়েছে। আল্লাহু আলাম।[৭২৩]

---

৭২১. প্রাগুক্ত
৭২২. ফাতাওয়াল মদীনাহ, ৪
৭২৩. ফাতাওয়াল মদীনাহ, ১৮

প্রশ্ন ৩৬৫: আমরা যখন মুযদালিফা থেকে জামরা, আকাবা কুবরায় যাই তখন আমাদের সাথে কিছু দুর্বল লোক থাকে। এখন আমরা সেখানে ফজরের পূর্বেই পৌঁছে গেলে আমরা কি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারব?

জবাব: না, কঙ্কর নিক্ষেপ করা যাবে না। কারণ, ইবন আব্বাস ﷺ যে হাদীসে দুর্বল লোকদের আগে পৌঁছে যাওয়ার কথা এসেছে, সে হাদীসে স্পষ্টভাবে নবী ﷺ বলেছেন,

لَا تَرْمُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা কঙ্কর নিক্ষেপ করবে না[৭২৪]।[৭২৫]

প্রশ্ন ৩৬৬: কোনো মহিলা যদি মাহরাম ছাড়াই হজে যায় তবে তার হজ কি বাতিল হয়ে যাবে?

জবাব: তার হজ বাতিল হবে না বটে, তবে তার পাপ হবে।[৭২৬]

প্রশ্ন ৩৬৭: আমরা ইয়ামানের লোক। আমরা হজ পালন করার ইচ্ছা করি। হজের দশদিন পূর্বে আমরা তায়েফ পৌঁছে যাই। এরপর মদীনায় আসি। ইহরাম ছাড়াই আমরা মীকাত অতিক্রম করি। এখন আমাদের কি কিছু করতে হবে?

জবাব: যারা ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করেছে, হয় তারা উমরার ইচ্ছা করে ইহরাম বেঁধেছে, এরপর উমরার তালবিয়াহ পাঠ করে মীকাত অতিক্রম করেছে। আর এরা পাপী হবে।

এখন কি তাদের দম দেওয়া লাগবে? এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। অধিকাংশ আলেম বলেছেন, তার ওপর দম দেওয়া ওয়াজিব। কারণ, সে শরয়ী ওযর ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে মীকাত অতিক্রম করেছে। তবে হজ বা উমরাকারীর যে-কোনো ভুলের কারণে যারা দম ওয়াজিব করে দেয়, আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাথে একমত নই। যে ভুলের ব্যাপারে স্পষ্ট শরয়ী দলিল থাকবে সেটা ভিন্ন কথা।

মানুষেরা এর পরিধি বৃদ্ধি করে বলেন, ইচ্ছাকৃত বা ভুলে বা না জানার কারণে হজের বিধান পরিপন্থি কোনো কিছু করলে দম দেওয়া ওয়াজিব। তারা এর পক্ষে ইবন আব্বাস ﷺ থেকে

৭২৪. সুনানু আবী দাউদ, ১৯৪০; সুনানুত তিরমিযী, ৮৯৩
৭২৫. ফাতাওয়াল মদীনাহ, ৩৮
৭২৬. ফাতাওয়াল মদীনাহ, ৫০

বর্ণিত এক আসারকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। সেই আসারটি অবশ্য সহীহ। তবে আমরা সহীহ বুখারীতে এর বিপরীত বর্ণনা পাই। তাতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বেদুঈনকে উমরার তালবিয়াহ পাঠ করতে শোনেন। অথচ তার জুব্বায় আতর দেওয়া ছিল। নবীজি তাকে জুব্বা খুলে ফেলার আদেশ দেন; আর সেই আতর ধুয়ে ফেলতে বলেন এবং হজে যা করা হয় উমরাতেও তা করতে নির্দেশ দেন। আর নবীজি তাকে কোনো কাফফারা দিতে বলেননি।[৭২৭]

এজন্য আমি বললাম, উমরার নিয়তে কেউ ইহরাম ছাড়াই মীকাত অতিক্রম করলে সে নিঃসন্দেহে পাপী হবে। কতক আলেমের মতে তাকে দম দিতে হবে। তবে আমার মতে তাকে দম দেওয়া লাগবে না।[৭২৮]

প্রশ্ন ৩৬৮: এক ব্যক্তি হজে ইফরাদ করার জন্য যুল-হুলাইফাহ থেকে ইহরাম বেঁধে জেদ্দা আসে। সেখান থেকে বাইতুল্লাহয় না এসে আরাফায় ওঠে। সে তাওয়াফে কুদুম[৭২৯] করেনি। এখন তার বিধান কী?

জবাব: এই ব্যক্তি গুনাহগার হবে। কারণ, সে এমন জিনিসের পরিপন্থি কাজ করেছে যার কথা অনেক হাদীসে এসেছে। যেমন :

دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

কেয়ামত পর্যন্ত উমরা হজে প্রবেশ করেছে[৭৩০]।[৭৩১]

প্রশ্ন ৩৬৯: এক ব্যক্তি তার বৃদ্ধা মায়ের সাথে সূর্য ডোবার পূর্বে মিনা থেকে বের হয়ে যায়। ঈদের দিন তাওয়াফে ইফাযা ও হজের সায়ী করার জন্য অনেক ভিড়ের কারণে মাগরিবের সময় মক্কায় পৌঁছে যায়। তারা উভয়ে ঈশা পর্যন্ত তাওয়াফ করে এবং প্রায় রাত ১২টা পর্যন্ত সায়ী করে। এরপর মিনা ফেরার সময় ড্রাইভার রাস্তা ভুলে যায়। ফলে রাত ১টার পর সেখানে পৌঁছে। এখন কি তাদের দম দেওয়া লাগবে?

জবাব: এরূপ হলে দমের কথা আমি পাই না। মূল বিধান হচ্ছে, তখন দম লাগবে যখন দমের পক্ষে প্রমাণ থাকবে। আর এক্ষেত্রে দমের পক্ষে কোনো দলিলই নেই।[৭৩২]

---

৭২৭. সহীহুল বুখারী, ১/৫৪২

৭২৮. ফাতাওয়াল মদীনাহ, ৫১

৭২৯. তাওয়াফে কুদুম বলতে বোঝায়, আগমনী তাওয়াফকে। মক্কার বাইরের লোকদের জন্য এ তাওয়াফ প্রযোজ্য।—সংকলক

৭৩০. মুসনাদ আহমাদ, ২২৮৭

৭৩১. ফাতাওয়াল মদীনাহ, ৫২

৭৩২. ফাতাওয়াল মদীনাহ, ৬৩

প্রশ্ন ৩৭০: হজে তামাত্তু উত্তম জেনে এক ব্যক্তি কয়েকবার হজে তামাত্তু করেছে। এখন কি সে হজে ইফরাদ করতে পারবে? আর একথা কি সঠিক যে, আপনার মতে হজে ইফরাদ মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে?

জবাব: আমরা হজে ইফরাদকে মানসূখ বা রহিত বলি না। কারণ, কিছু কিছু পদ্ধতিতে হজে ইফরাদ জায়েয। এখন উল্লিখিত ব্যক্তির ব্যাপারে কথা হচ্ছে, সে যেহেতু হজে তামাত্তু পালন করতে সক্ষম, তাই তাকে হজে ইফরাদ করার নসীহত করব না।

একথা জেনে রাখা ওয়াজিব যে, যে-ব্যক্তি হজে তামাত্তু করার সক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও হজে ইফরাদ করে, সে নবী ﷺ -এর এই বাণীর বিপরীতে কাজ করে;

دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

কেয়ামত পর্যন্ত উমরা হজে প্রবেশ করেছে। এ কথা বলার পর তিনি আঙুল পরস্পরের মাঝে প্রবেশ করান[৭৩৩]।[৭৩৪]

প্রশ্ন ৩৭১: মীনায় রাত্রিযাপন করা ওয়াজিব না সুন্নাতে মুআক্কাদা?

জবাব: আমার কাছে প্রাধান্যযোগ্য মত মনে হয়, মীনায় রাত্রিযাপন করা ওয়াজিব। কারণ, আমরা পাই, মক্কায় লোকদের পানিপানকারী, ছাগলের রাখাল বা এ জাতীয় ওযরগ্রস্ত লোক ছাড়া অন্যদের নবী ﷺ মীনায় রাত্রিযাপন করার ব্যাপারে ছাড় দেননি।[৭৩৫]

প্রশ্ন ৩৭২: মীকাতের পূর্বে কি উমরার জন্য ইহরাম বাঁধা কোনো মুসলিমের জন্য জায়েয?

জবাব: জায়েয নয়। ইমাম মালিক থেকে সহীহ সূত্রে ফাতাওয়া রয়েছে যে, এটা সুন্নাতে রাসূলের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন।[৭৩৬]

প্রশ্ন ৩৭৩: রাতে কি জামরায় কঙ্কর মারা জায়েয?

জবাব: ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত কঙ্কর মারা জায়েয।[৭৩৭]

---

৭৩৩. মুসনাদ আহমাদ, ২২৮৭
৭৩৪. ফাতাওয়াল মদীনাহ, ৮৭
৭৩৫. ফাতাওয়াল মদীনাহ, ৮৯
৭৩৬. ফাতাওয়াল মদীনাহ, ১০৬
৭৩৭. ফাতাওয়াল মদীনাহ, ১০৭

প্রশ্ন ৩৭৪: যে-ব্যক্তি হজে কুরবানী করবে, তার নিজের কুরবানীর মাংস খাওয়া কি ওয়াজিব?

জবাব: নিজের কুরবানীর মাংস খাওয়া ওয়াজিব। কুরবানী করে যদি না খেয়ে সাদকা করে দেয়, তবে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ পরিপন্থি তো হবেই, এ ছাড়াও কুরআনের আদেশ পরিপন্থিও হবে বইকি।[৭৩৮]

প্রশ্ন ৩৭৫: আমি আমার পিতামাতার সঙ্গে হজ করতে চাই। তবে আমাদের কাছে সবার পক্ষ থেকে কুরবানী করার সামর্থ্য নেই। আর আমাদের জন্য হজে রোজা রাখাও কষ্টকর। তাই আমি হজে ইফরাদ করি আর আমার পিতামাতা হজে তামাত্তু করে। এখন আপনি কি এই হজে ইফরাদ জায়েয মনে করেন?

জবাব: না, জায়েয মনে করি না। কারণ, আপনি রোজা রাখতে সক্ষম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

যে উমরাকে হজের সাথে মিলিয়ে তামাত্তু করতে চাইবে সে কুরবানী দেবে। আর যার পক্ষে সম্ভব নয় সেই ব্যক্তির হজের সময় তিনদিন আর ফিরে এসে সাতদিন রোজা রাখবে[৭৩৯]।[৭৪০]

প্রশ্ন ৩৭৬: একজন লোক প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই হজ পালন করে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার পিতা তাকে তার দাদার পক্ষ থেকে হজ করতে বলে। সে হজে তামাত্তুর ইহরাম বাঁধে। অষ্টম দিন এ ব্যাপারে ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করা হলে বলা হয়, আপনার প্রথম হজ ছিল নফল। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর হজ করা আপনার ওপর ফরয। এখন যে হজ করছেন তা আপনার হজ হবে, আপনার দাদার পক্ষ থেকে হবে না। এ ফাতাওয়া কি সঠিক? এ হজ তামাত্তু হবে না কি ইফরাদ হবে? কারণ, সে তার দাদার পক্ষ থেকে উমরা করেছিল।

জবাব: তাকে যে ফাতাওয়া দেওয়া হয়েছে তা সঠিক। শুবরুমার হাদীসের উদ্দেশ্য এটাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি নিজের পক্ষ থেকে হজ করেছ? সে বলে, না। তখন

৭৩৮. ফাতাওয়াল মদীনাহ, ১১৫
৭৩৯. সূরা বাকারাহ, ২:১৯৬
৭৪০. ফাতাওয়াল মদীনাহ, ১১৭

তিনি তাকে বলেন, আগে নিজের পক্ষ থেকে হজ করো, তারপর শুবরুমার পক্ষ থেকে।[৭৪১]

অন্যদিকে উমরা পূর্ণ করা আর না করার মাঝে কোনো ফারাক নেই। কারণ, আংশিকের বিধান গোটাটার ওপরই। সেই উমরা মূলত বাচ্চার পক্ষ থেকে হয়ে যাবে।[৭৪২]

প্রশ্ন ৩৭৭: ইহরামের পর আগরবাতির মাধ্যমে সুবাসিত হওয়ার বিধান কী? এটা কি ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ সুঘ্রাণ ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হবে?

জবাব: এটা সবচেয়ে উত্তম সুঘ্রাণ। তাহলে কেন তা সুঘ্রাণ বলে গণ্য হবে না? তা ছাড়া এই [আরব] দেশে তো সেটা সুঘ্রাণই।[৭৪৩]

প্রশ্ন ৩৭৮: ইহরাম অবস্থায় মাথা ও চেহারা ঢাকা কি জায়েয?

জবাব: ইহরাম অবস্থায় মুহরিমের জন্য মাথা ও চেহারা ঢাকা জায়েয নয়। এর প্রমাণ হচ্ছে, উটনী এক ব্যক্তির ঘাড় মটকে দিলে সেই লোকটি মারা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই কাপড়ে তার কাফন দিতে বলেন এবং তার মাথা ও চেহারা ঢাকতে নিষেধ করেন[৭৪৪]।[৭৪৫]

প্রশ্ন ৩৭৯: চেহারা ও হাতের জন্য নির্দিষ্ট সুঘ্রাণযুক্ত সাবান, শ্যাম্পু, ক্রীম, সুরমা কিংবা এ জাতীয় প্রসাধনী কি ইহরাম অবস্থায় মহিলারা ব্যবহার করতে পারবে?

জবাব: এসব সাবান যদি পরিষ্কারক হিসেবে তথা ময়লা দূর করার জন্য শরীরে বা কাপড়ে ব্যবহার করা হয় তাহলে তাতে সমস্যা দেখি না। আর যদি সুঘ্রাণ ও সুবাসের জন্য ব্যবহার করে তাহলে তা জায়েয নয়।[৭৪৬]

প্রশ্ন ৩৮০: কেউ যদি তার স্বদেশের মীকাত অতিক্রম করে চলে যায় তাহলে কি সে যেখানে অবস্থান করছে সেখান থেকে নিকটবর্তী মীকাতে গিয়ে ইহরাম বাঁধবে?

জবাব: না বরং নিজের যে মীকাত সে অতিক্রম করে গিয়েছে সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধবে।[৭৪৭]

---

৭৪১. সুনানু আবী দাউদ, ১৮১১; সুনানু ইবন মাজাহ, ২৯০৩, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেন।
৭৪২. ফাতাওয়ার মদীনাহ, ১০৯
৭৪৩. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১১/১৪৩
৭৪৪. সহীহুল বুখারী, ১২৬৫; সহীহ মুসলিম, ২৭৮৪
৭৪৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১১/১৪৪
৭৪৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১১/১৫৩
৭৪৭. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১১/১৭৩

প্রশ্ন ৩৮১: উমরাতে বিদায়ী তাওয়াফ করা কি ওয়াজিব?

জবাব: উমরাতে বিদায়ী তাওয়াফ করা ওয়াজিব তো দূরের কথা এমনকী তা শরীআতসম্মত হওয়ার পক্ষেও আমি হাদীসে কোনো দলিল পাইনি। যেসব হাদীসে বিদায়ী তাওয়াফের কথা এসেছে তা দ্বারা মূলত উদ্দেশ্য ছিল হজকে বোঝানো।

দ্বিতীয়ত, সালাফদের থেকেও এমন কোনো আসার পাইনি যেখানে বলা হয়েছে, তারা উমরাতে বিদায়ী তাওয়াফ করতেন। এ কারণে উমরায় বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব তো দূরের কথা উলটো আমি তা শরীআতসম্মতই মনে করি না। কারণ, এ ব্যাপারে কোনো দলিল নেই। আর এটাই আমার মত।[৭৪৮]

প্রশ্ন ৩৮২: আপনি জানেন হাজরে আসওয়াদে অনেক কড়া সুঘ্রাণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এতে কোনো মহিলা সেখানে হাত দিলে সেই সুঘ্রাণ তার হাতে লেগে যায়। এ ক্ষেত্রে তারা কী করবে?

জবাব: মহিলারা যদি প্রবল ধারণা করে যে, তারা হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করলে সুঘ্রাণ তাদের হাতে লেগে যাবে, তাহলে তারা স্পর্শ করবে না। কারণ, কল্যাণ আনয়নের পূর্বে অকল্যাণ দূর করতে হয়। হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা সর্বোচ্চ সুন্নাতে মুআক্কাদা আর সুঘ্রাণ মহিলাদের জন্য হারাম। অতএব, কল্যাণ আনয়নের পূর্বে অকল্যাণ দূর করতে হবে।[৭৪৯]

প্রশ্ন ৩৮৩: কারো যদি তাওয়াফ শুরু করার পর অজু ভেঙে যায়, তাহলে সে কী করবে?

জবাব: তাওয়াফ করার জন্য পবিত্রতা শর্ত। তাই তাওয়াফ করা অবস্থায় অজু ভেঙে গেলে তাওয়াফ স্থগিত করে দেবে।[৭৫০]

প্রশ্ন ৩৮৪: দ্বিতীয় তলায় সায়ী করার ব্যাপারে আপনার মত কী?

জবাব: আমি মনে করি, মূল হচ্ছে নিচ তলা। কিন্তু সায়ীকারী ভিড় বা এ জাতীয় কোনো সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার কারণে যদি দ্বিতীয় তলায় উঠে যায়, তাহলে তার ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। তবে উত্তম হচ্ছে, দ্বিতীয় তলায় উঠবে না এবং প্রথম তলা ছাড়া সায়ী করবে না।[৭৫১]

---

৭৪৮. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১১/২৩২

৭৪৯. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১১/২৫২

৭৫০. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১১/২৫৫ পরিমার্জিত

৭৫১. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১১/২৭৫

প্রশ্ন ৩৮৫: আমি হজ করতে চাই তবে আমার কাছে যথেষ্ট অর্থ নেই। এখন আমি ঋণ করে হজ করব, এটা কি জায়েয?

জবাব: যদি আপনি ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হন তবে জায়েয। আর যদি পরিশোধ করতে সক্ষম না হন, তবে জায়েয নয়।[৭৫২]

প্রশ্ন ৩৮৬: আমি একজন যুবক। আমার কাছে কিছু সম্পদ আছে। কিন্তু উক্ত সম্পদ দিয়ে বিয়ে করলে হজ করতে পারব না, আবার হজ করলে বিয়ে করতে পারব না। এমতাবস্থায় আমি কী করব?

জবাব: এ ধরনের অনেক প্রশ্ন আসে। এমন প্রশ্নের জবাবে বলব, ভাই আমার, আপনি যদি বিয়ের প্রতি খুব আসক্ত থাকেন এবং বিয়ে ছাড়া নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারার ব্যাপারে শঙ্কিত হন, তাহলে বিয়েই করুন। এরপর যখন হজ করার সামর্থ্য হবে তখন হজ করবেন। আর যদি বিয়ের ব্যাপারে তেমন চিন্তাভাবনা না থাকে তাহলে এমন সুযোগকে গনীমত মনে করে হজ করে ফেলুন। কারণ, আপনি হজ করতে সক্ষম আছেন।[৭৫৩]

প্রশ্ন ৩৮৭: একজন ব্যক্তির কাছে সম্পদ আছে। সেই ব্যক্তি ঐ সম্পদ দিয়ে খুব সাধারণ একটি ঘর বানাতে চায়। এখন সেই ব্যক্তিটি ঘর বানানোকে না কি হজকে প্রাধান্য দেবে?

জবাব: প্রথমে হজে যাবে, তারপর ঘর বানাবে।[৭৫৪]

প্রশ্ন ৩৮৮: আমাদের এক ভাই কয়েক বছর আগে হজ করেছে কিন্তু মিনার সাথে মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করেনি। যেহেতু তার হজ কবুল হয়নি তাই সে কি আবার হজ করবে না কি তার পিতার পক্ষ থেকে হজ করবে?

জবাব: তার পিতার পক্ষ থেকে হজ করতে পারবে না। আগে নিজের পক্ষ থেকে হজ করবে। সে মুযদালিফায় অবস্থান করেনি মানে সেখানে ফজরের সালাত আদায় করেনি। আর যে সেখানে সালাত আদায় করেনি তার হজ পূর্ণ হয়নি। আর যার হজ পূর্ণ হয়নি তাকে আবার হজ করতে হবে।[৭৫৫]

---

৭৫২. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১১/২৯৮
৭৫৩. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১১/২৯৯, পরিমার্জিত
৭৫৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১১/২৯৯
৭৫৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১১/৩৬৭

প্রশ্ন ৩৮৯: কেউ যদি কঙ্কর নিক্ষেপের আগে তাওয়াফে ইফাযা[৭৫৬] করে তবে কি তা জায়েয হবে?

জবাব: জায়েয হবে। এ ব্যাপারে একটি হাদীস রয়েছে, সম্ভবত তা আমি 'হাজ্জাতুন নবী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। কঙ্কর নিক্ষেপের আগে তাওয়াফ করলে নবী ﷺ বলেন, এতে কোনো সমস্যা নেই।[৭৫৭]

প্রশ্ন ৩৯০: জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে খুঁটিতে কঙ্কর লাগানো কি শর্ত?

জবাব: না, শর্ত নয়। মূল উদ্দেশ্য হলো হাউজ। কঙ্কর হাউজে পড়লেই হবে। খুঁটিতে লাগানো আসল উদ্দেশ্য নয়। অনেকে মনে করে যে, সেখানে শয়তান হাজীদের কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করে। এটা একটি ভুল ধারণা, যা জনসাধারণের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। কঙ্কর নিক্ষেপ স্রেফ একটি ইবাদত ছাড়া আর কিছুই নয়। এর পেছনের দর্শন তালাশ করা জায়েয নয়। মূল ঘটনা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা ইবরাহীমকে তাঁর সন্তান ইসমাইলকে জবাই করার আদেশ করলে, ইবরাহীম সেই আদেশ পালন করতে উদ্যত হলে শয়তান সেখানে উপস্থিত হয়ে সেই আদেশ পালনে বাধাগ্রস্ত করতে চেয়েছিল। আর সেখানে শয়তান প্রকাশমান হলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রথম তাকে কঙ্কর নিক্ষেপ করেন, এরপর দ্বিতীয়বার করেন, এরপর তৃতীয়বার করেন।

তাই বলে শয়তান এখনো সেখানে হাজীদের কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য গোপনে অপেক্ষা করে না। এটা তো বর্তমানে একটি ইবাদত। এর মাধ্যমে উক্ত মহা ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, যে ঘটনায় আল্লাহ তাআলা ইসমাঈলকে এক বিরাট দুম্বা বিনিময় দিয়েছিলেন।

অতএব, মূল উদ্দেশ্য হলো, হাউজের স্থানে কঙ্কর নিক্ষেপ করা। খুঁটিতে কঙ্কর লাগানো মূল উদ্দেশ্য নয়। কারণ, আমার বিশ্বাস, সেই খুঁটি নবীযুগে ছিলই না।[৭৫৮]

প্রশ্ন ৩৯১: কেউ যদি নিজের পরিবর্তে অন্য কাউকে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে বলে, তাহলে কি এ ক্ষেত্রে কোনো শর্ত আছে?

---

৭৫৬. এ তাওয়াফ মূলত কুরবানীর দিন কঙ্কর নিক্ষেপ, কুরবানী ও মাথামুণ্ডন করার পর দিনের প্রথম বেলায় করতে হয়। - সংকলক

৭৫৭. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১১/৩৮৬

৭৫৮. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১১/৪১০

জবাব: শর্ত হলো, সেই ব্যক্তিকে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে অক্ষম হতে হবে। যদি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয় তাহলে তার পরিবর্তে কাউকে পাঠানো যাবে না।[৭৫৯]

প্রশ্ন ৩৯২: মহিলারা মাথা মুণ্ডন করবে না কি চুল ছোটো করবে?

জবাব: মাথা মুণ্ডন করবে পুরুষেরা আর মহিলারা শুধু ছোটো করবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ

নারীদের জন্য মাথা মুণ্ডন নেই। তাদের জন্য রয়েছে (চুল) ছোটো করা।[৭৬০] হাদীসটির সনদ সহীহ।[৭৬১]

৭৫৯. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১১/৪০৯
৭৬০. সুনানু আবী দাউদ, ১৯৮৫, হাদীসটিকে আলবানী সহীহ বলেছেন।
৭৬১. আত-তা'লীকাতুর রযিয়্যাহ, ২/১০৫

অধ্যায় চৌদ্দ

নারীদের মাসাইল

প্রশ্ন ৩৯৩: হায়েযা মহিলারা কি মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে?

জবাব: নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় দলিল দ্বারা প্রমাণিত, হায়েযা মহিলারা মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে।

নেতিবাচক দলিল: হায়েযা মহিলারা মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না-এ ব্যাপারে কোনো দলিল নেই। আর এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, মৌলিকভাবে সকল বস্তু হালাল। কোনো কিছুকে হারাম করতে হলে হারামের পক্ষে দলিল চাই। আর এমন কোনো সহীহ হাদীস নেই যাতে হায়েযা মহিলাদের মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

ইতিবাচক দলিল: জাবির ইবন আবদুল্লাহ আনসারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত আয়েশাহ ﷺ'র হাদীস। বিদায় হজে আয়েশাহ ﷺ'র হায়েয শুরু হয়। নবী ﷺ তখন 'সারাফ' নামক জায়গার নিকটবর্তী একস্থানে অবতরণ করছিলেন। এরপর তিনি তার কাছে গেলে দেখেন, আয়েশাহ ﷺ কাঁদছেন। তিনি তাকে বললেন, কী, তোমার হায়েয হয়েছে? নবী ﷺ আরও বললেন, এটা এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ আদমের কন্যাদের জন্য বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। তাওয়াফ ও সালাত আদায় করা ছাড়া হাজীরা যা করে, তুমিও তা করো।[৭৬২]

এটি স্পষ্ট দলিল যে, হায়েযা মহিলারা মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে, এমনকী মসজিদে হারামেও। কারণ, নবী ﷺ আয়েশাহ ﷺ'কে বলেন, হাজীরা মসজিদে প্রবেশ, তাওয়াফ, সালাত আদায়সহ যা কিছু করে সব করতে পারবে। হাজীরা যা কিছু করে তন্মধ্যে তিনি তাকে শুধু তাওয়াফ করতে ও সালাত পড়তে নিষেধ করেন।

প্রশ্ন ৩৯৪: সন্তান না নেওয়ার উদ্দেশ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি সেবন করা কি জায়েয?

জবাব: প্রথমে জানতে হবে মহিলা কেন জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি সেবন করছে। যদি মহিলা অসুস্থ হয় আর মুসলিম ডাক্তার তাকে যদি জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি সেবনের পরামর্শ দেয়, তাহলে জায়েয। আর যদি দরিদ্রতার ভয়ে হয় তাহলে জায়েয নয়।[৭৬৩]

---

৭৬২. সহীহুল বুখারী, ২৯৪; সহীহ মুসলিম, ২৮০৮

৭৬৩. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১২/২৩৮

অতএব, হায়েযারা মসজিদে প্রবেশ করবে, কুরআন পড়বে। এর বিপরীত যারা দাবি করবে, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে, দলিলের মাধ্যমে হারাম প্রমাণ করা। আমরা যে হালাল প্রমাণ করলাম, এর বিপরীতে তাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে, তা হারাম।[৭৬৪]

প্রশ্ন ৩৯৫: গর্ভবতী মহিলা যদি গর্ভপাতের আশঙ্কা করে তাহলে কি সে বসে সালাত আদায় করতে পারবে?

জবাব: হ্যাঁ, পারবে।[৭৬৫]

প্রশ্ন ৩৯৬: আমরা জানি, মহিলাদের মসজিদে সালাত আদায় করার চেয়ে ঘরে সালাত আদায় করা বেশি উত্তম। প্রশ্ন হলো, কোনো মহিলা যদি মক্কায় গিয়ে হোটেলে সালাত আদায় করে, তাহলে তা কি মসজিদে হারামে সালাত আদায় করার চেয়ে বেশি উত্তম হবে?

জবাব: মহিলাদের সালাত যে দেশেই হোক না কেন এমনকী মক্কায় হোক, মদীনায় হোক, বাইতুল মাকদিসে হোক-তাদের ঘরে সালাত আদায় করা থেকে মসজিদে সালাত আদায় করা উত্তম। পুরুষদের ক্ষেত্রে নফল সালাতের বিষয়টাও এমন। তাদের নফল সালাত বাসায় পড়া বেশি উত্তম; মসজিদে উত্তম নয়, এমনকী মসজিদে হারাম হলেও উত্তম নয়।

এর পক্ষে দুটি দলিল রয়েছে:

ক. রামাদান মাসের কিয়ামের ঘটনায় নবী ﷺ-এর ব্যাপক বাণী। তিনি এক রামাদান মাসে সাহাবীদের নিয়ে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাত কিয়াম করেন। চতুর্থ রাতে তারা আবার একত্র হলে তিনি ঘর থেকে বের হলেন না। এমনকী এতে কিছু গাফেল লোক তাঁর দরজায় কঙ্কর নিক্ষেপও করতে শুরু করে। তা দেখে তিনি রাগান্বিত অবস্থায় বের হন এবং বলেন,

قَدْ عَرَفْتُ الَّذِى رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِى بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ

তোমাদের কার্যকলাপ দেখে আমি বুঝতে পেরেছি। হে লোকেরা! তোমরা ঘরে সালাত আদায় করো। কেননা ফরয সালাত ছাড়া লোকেরা ঘরে যে সালাত আদায় করে তা-ই উত্তম।[৭৬৬]

---

৭৬৪. ফাতাওয়াল মাদীনাহ, ২৩

৭৬৫. ফাতাওয়াল ইমারাত, ৩৬

৭৬৬. সহীহুল বুখারী, ৭৩১; সহীহ মুসলিম, ৭৮১; সুনানু আবী দাউদ, ১৪৪৭

খ. দ্বিতীয় হাদীস মসজিদে নববী কেন্দ্রিক ছিল। এক সাহাবী নবী ﷺ -এর কাছে এসে প্রশ্ন করে, আমি নফল সালাত মসজিদে পড়ব না কি বাসায় পড়ব? জবাবে নবী ﷺ বলেন,

أَلاَ تَرَى إِلَى بَيْتِي؟ مَا أَقْرَبَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً.

তুমি কি আমার ঘর দেখো না মসজিদের কতটা কাছে? তা সত্ত্বেও আমার মসজিদে (মসজিদে নববীতে) সালাত পড়ার তুলনায় ঘরে সালাত পড়া আমার কাছে বেশি প্রিয়। তবে ফরয সালাতের কথা ভিন্ন।[৭৬৭]

দেখায় বিষয় হচ্ছে, যার ঘর বিশেষ ফযীলতপূর্ণ এলাকায়, যেমন মসজিদে হারামে, মসজিদে নববীতে কিংবা মসজিদে আকসায়-সেই এলাকার নারীরা যদি ঘরে ফরয সালাত আদায় করে, আর পুরুষেরা যদি বাসায় নফল সালাত আদায় করে, তবুও তা উপর্যুক্ত তিন মসজিদে সালাত আদায় করা থেকে উত্তম হবে।

কোনো পুরুষ যদি মসজিদে হারামে নফল সালাত আদায় করে তবে তার সালাত হবে এক লাখ সালাতের সমান। কোনো নারী যদি ফরয বা নফল সালাত মসজিদে হারামে আদায় করে তবে তার সালাত হবে এক লাখ সালাতের সমান। কিন্তু এরপরও সেই পুরুষ যদি ঘরে নফল সালাত আদায় করে অনুরূপ সেই নারীও ঘরে সালাত আদায় করে, তাহলে উভয়ের সালাত এক লাখ সালাতের অধিক সালাতের সমান হবে। এটাই শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ।[৭৬৮]

প্রশ্ন ৩৯৭: কোনো বোন কি তার ভাইয়ের সামনে নিজের উরু, গলা বা দুই বাহু উন্মুক্ত রাখতে পারবে?

জবাব: একজন নারী তার মাহরাম এবং মুমিন নারীর সামনে শুধু সৌন্দর্য-এর অঙ্গগুলো ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গ উন্মুক্ত রাখতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

...وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ

তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে নিজেদের স্বামী, পিতা ছাড়া।[৭৬৯]

আর সৌন্দর্য-এর অঙ্গগুলো হলো: মাথা, হার পরিধানের স্থান, চুড়ি পরার স্থান, বাজুবন্ধের

৭৬৭. সুনানু ইবন মাজাহ, ১৩৭৮, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
৭৬৮. ফাতাওয়াল ইমারাত, ৯৯
৭৬৯. সূরা নূর, ২৪:৩১

স্থান, দুই পায়ের পাতা ও নুপুর পরার স্থান। এসব অঙ্গ একজন নারী তার মাহ্‌রাম এবং যে-কোনো মুসলিম নারীর সামনে প্রকাশ করতে পারবে।[৭৭০]

প্রশ্ন ৩৯৮: নারীদের পর্দার ক্ষেত্রে শর্তগুলো কী কী?

জবাব: আমরা এ ব্যাপারে কুরআনের আয়াত, হাদীস এবং সালাফদের আসার খোঁজ করলে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয় যে, নারীরা যখন বাড়ি থেকে বের হবে তখন তার সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত করবে, চেহারা ও কবজি ছাড়া শরীরের কোনো সৌন্দর্য-এর অঙ্গ ও পোশাকের কোনো সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না। চাইলে চেহারা ও কবজি প্রকাশ করতে পারে।

পর্দার ক্ষেত্রে আমরা নিম্নের শর্তগুলো পাই:

ক. গোটা শরীর আচ্ছাদিত করতে হবে, তবে যেগুলো আচ্ছাদিত করা ওয়াজিব নয় সেগুলো বাদ থাকবে।

খ. খোদ পর্দাটাই ফ্যাশন হবে না।

গ. এমন পাতলা হবে না যে, দেহাবয়ব বোঝা যাবে।

ঘ. ঢিলেঢালা হবে; টাইট হবে না।

ঙ. আতর বা সুঘ্রাণ মিশ্রিত হবে না।

চ. পুরুষের পোশাক সদৃশ হবে না।

ছ. কাফির নারীদের পোশাক সদৃশ হবে না।

জ. প্রসিদ্ধির পোশাক হবে না।

উল্লিখিত শর্তগুলোর মাঝে কিছু শর্ত ঘরে-বাইরে সবসময়ই হারাম, যেমন-শেষের তিনটি শর্ত।[৭৭১]

---

৭৭০. ফাতাওয়াল মাদীনাহ, ৯৬
৭৭১. জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমাহ, ৩৭

প্রশ্ন ৩৯৯: কোনো এক ঘরে যদি পুরুষেরা একত্র হয় এবং তাদের সঙ্গে তাদের স্ত্রীরাও পরিপূর্ণ পর্দা সহকারে থাকে; আর সেখানে তারা বিভিন্ন অতীত ঘটনা বলে হাসাহাসি করে, সাথে স্ত্রীরাও হাসে-এটা কি জায়েয হবে?

জবাব: জায়েয হবে না। এ ধরনের মজলিস যেখানে আনন্দ-ফুর্তির আলোচনা হয়, সেখানে নারীদের একত্র হওয়া জায়েয হবে না। কারণ, কেউ কখনো এমন কথা বলবে, যে কথা শুনে সবাই জোরে জোরে হাসবে। ফলে ফিতনা সৃষ্টি হবে। তাই জায়েয নয়।[৭৭২]

প্রশ্ন ৪০০: প্রস্তাবদাতা পাত্র কি প্রস্তাবপ্রাপ্তা পাত্রীর চেহারা ও কবজি ছাড়া চুল ও গলা দেখতে পারবে?

জবাব: আমার কাছে মনে হয়, আল্লাহ ভালো জানেন, পূর্বপরিকল্পনা ছাড়া হঠাৎ চোখ পড়লে দেখা জায়েয হবে। এ অর্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

যখন তোমাদের কেউ কোনো মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দেবে, তখন সম্ভব হলে তার এমন কিছু যেন দেখে নেয় যা তাকে বিবাহে উৎসাহিত করবে।[৭৭৩]

আর যদি পূর্বপরিকল্পনা ও দেখার ব্যাপারে কথাবার্তা হয়ে থাকে তাহলে চেহারা ও কবজি ছাড়া অন্য কোনো কিছু দেখা জায়েয হবে না।[৭৭৪]

প্রশ্ন ৪০১: নারী কি তাদের মাথার চুল খাটো করতে পারবে?

জবাব: আগে দেখতে হবে সে কেন চুল খাটো করছে। সে যদি কাফির ও ফাসিক নারীদের অনুকরণার্থে খাটো করে, তবে জায়েয হবে না। আর যদি চুল হালকা করার জন্য বা স্বামীকে আকৃষ্ট করার জন্য খাটো করে তাহলে আমি এতে কোনো নিষেধাজ্ঞা দেখি না। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে,

وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُؤُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ

নবী ﷺ -এর স্ত্রীগণ মাথার চুল কাটতেন, এমনকী তা ওয়াফরার ন্যায় হয়ে যেত[৭৭৫]।[৭৭৬]

৭৭২. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৫/২২৬
৭৭৩. সুনানু আবী দাউদ, ২০৮০
৭৭৪. ফাতাওয়াল মাদীনাহ, ১১৩
৭৭৫. সহীহ মুসলিম, ৬১৫; 'ওয়াফরা' ঘাড় বরাবর লম্বা চুলকে বোঝায়।
৭৭৬. ফাতাওয়াল মাদীনাহ, ৯

প্রশ্ন ৪০২: কেউ কেউ বলেন টেলিভিশন কিংবা পত্রপত্রিকায় নারীদের দেখা জায়েয। তারা দলিল দেন যে, আয়েশাহ ﷺ হাবশী লোকদের দেখতেন, যখন তারা খেলাধুলা করত। এখন আমরা কীভাবে তাদের খণ্ডন করব?

জবাব: কেউ কেউ দাবি করে নারীদের ছবি দেখা যাবে। তারা মনে করে, 'ছবির দিকে দেখা মানে কল্পনার দিকে দেখা। সরাসরি নারীর দিকে দেখা মানে প্রকৃতার্থে দেখা।' এমনটা বলা মূলত ফিতনার দরজা বন্ধ করার ব্যাপারে প্রবল অসচেতনতা থেকে সৃষ্ট। সরাসরি নারীকে দেখা আর টেলিভিশন বা পত্রপত্রিকায় নারীদের দেখার মাঝে কী ফারাক?

ফকীহগণ কেন নারীদের ছবির দিকে তাকানো নিষেধ করেছেন? তারা মূলত ফিতনার আশঙ্কায় নিষেধ করেছেন। আর এ আশঙ্কা সরাসরি দেখা বা ছবিতে দেখা উভয়ে ক্ষেত্রেই রয়েছে।[৭৭৭]

আর হাবশীদের দিকে আয়েশাহ ﷺ'র দেখা তার জন্য এবং অন্যদের জন্য বৈধ। কারণ, নজর ছিল খেলার দিকে, ব্যক্তির দিকে নয়। এটা যেন নারীদের লড়াই দেখার মতো। সেই সময় শয়তান নারীদের হৃদয়ে ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ওয়াসওয়াসা দিতে পারে না। এ কারণে তা দেখা জায়েয। কারণ, তাতে ফিতনার আশঙ্কা থাকে না।[৭৭৮]

তাই এ হাদীস দ্বারা কুরআনের আয়াতের বিরোধিতা করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। এতে তাদের জন্য পবিত্রতা রয়েছে; তারা যা করে সেই বিষয়ে আল্লাহ অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকেও বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে[৭৭৯]।[৭৮০]

---

৭৭৭. নারীদের ছবি দেখা যাবে না তার শক্তিশালী দলিল হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোনো নারী যেন অপর নারীর দেহ স্পর্শ করে এমনভাবে নিজের স্বামীর কাছে তার বর্ণনা না দেয়, যেন তার স্বামী তাকে চাক্ষুস দেখছে! (সহীহুল বুখারী, ৫২৪১) —সংকলক।

৭৭৮. যেমন কোনো কিছু কেনার সময় পণ্যের দিকে নজর থাকে, বিক্রেতার দিকে থাকে না। তবে এ হাদীস দ্বারা নারীদের জন্য বর্তমান যুগের বিভিন্ন খেলাধুলা জায়েয প্রমাণ করা যাবে না। কারণ, বর্তমানে ক্রিকেট, রেসলিংসহ অন্যান্য খেলাধুলায় শরীর, পা ইত্যাদি অঙ্গ উন্মুক্ত থাকে। তাছাড়া তারা যেসব পোশাক পরে তাও ফিতনায় পরিপূর্ণ।—সংকলক।

৭৭৯. সূরা নূর, ২৪:৩০-৩১

৭৮০. ফাতাওয়াল ইমারাত, ১০৮

প্রশ্ন ৪০৩: বিশ্বস্ত নারী সঙ্গীর সাথে মাহরাম ছাড়া কি নারীরা সফর করতে পারবে? অনেকেই বলে না কি সফর করতে পারবে। তারা তাদের পক্ষে দলিল দেয় যে, হাদীসে এসেছে, একজন উষ্ট্রারোহী হাওদানশীল নারী ইয়ামান হতে ইরাক সফর করবে। আর সে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না। এ ব্যাপারে আপনার মত কী?

জবাব: এই হাদীস থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে, নারী একাকী সফর করতে পারবে। কারণ, এ হাদীস শরীআত হিসেবে বর্ণিত হয়নি; বরং তাতে গায়েবের খবর দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে এমনটা হবে। আর গায়েবের মাধ্যমে ভবিষ্যতে ঘটবে এমন ভালোমন্দ উভয় সংবাদই দেওয়া হয়।

যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَسَافَدَ النَّاسُ فِي الطُّرُقِ تَسَافُدَ الْحَمِيرِ.

ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত হবে না, যতক্ষণ না মানুষ গাধার যৌনাচারের মতো রাস্তাঘাটে যৌনাচার করবে।[৭৮১]

এই হাদীসে ভবিষ্যতে ঘটবে এমন এক বিষয়ের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। যে বিষয়ে সংবাদ দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়টিকে হাদীস দ্বারা শরীআতসম্মত করা হয়নি।

আর আমাদের এই হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করতে হবে যদিও হাদীসটি বিভিন্ন শব্দে এসেছে,

لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

কোনো নারীই যেন মাহরাম ছাড়া তিন দিনের সফর না করে।[৭৮২]

কোনো কোনো বর্ণনায় দু'দিনের কথা এসেছে। আবার কোনো বর্ণনায় সময় নির্ধারণ করা ছাড়াই যেকোনো ধরনের সফর মাহরাম ছাড়া করতে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসটি হলো,

وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

কোনো নারী যেন মাহরাম ছাড়া সফর না করে।[৭৮৩]

বর্তমান অবস্থায় মাহরাম ছাড়া নারীদের সাথে নিয়ে সফর করার ব্যাপারে অন্তর সায় দেয় না। ইবন হাযমের 'তওকুল হাম্মামাহ' গ্রন্থে এসেছে, পশ্চিমা কিছু নারী হজের উদ্দেশ্যে বের হয়।

---

৭৮১. সহীহ ইবন হিব্বান, ১৮৮৯, আলবানী হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন।
৭৮২. সহীহুল বুখারী, ১০৮৬
৭৮৩. সহীহুল বুখারী, ৩০০৬

হজ শেষ করে তারা নৌকায় করে স্বদেশে রওনা হয়। কিন্তু পথিমধ্যে নৌকার এক কর্মচারীর সঙ্গে তারা অশ্লীল কাজে জড়িয়ে যায়।

মাহরাম দুই প্রকার:

ক. মাহরাম বিযযাত বা মুলগত মাহরাম এবং

খ. মাহরাম লিগাইরিহ বা অন্যের মাধ্যমে মাহরাম।

উদাহরণস্বরূপ, রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের দিকে তাকাতে এবং তাদের কথা কান লাগিয়ে শুনতে নিষেধ করেছেন স্রেফ ফিতনার দরজা বন্ধ করবার জন্য।

এটা আবশ্যক নয় যে, যে কোনো নারী মাহরাম ছাড়া একাকী সফর করলে অশ্লীলতায় জড়িয়ে যাবে কিংবা একদল নারী মাহরাম ছাড়া একাকী সফর করলে অশ্লীলতায় জড়িয়ে পড়বে। তথাপি তারা যেন অশ্লীলতায় জড়াতে না পারে সেই দরজা বন্ধ করে দেওয়ার জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ মাহরামের সঙ্গে যাওয়া শর্ত করে দিয়েছেন।

তবে বর্তমানে এ কথা বলারও সুযোগ নেই যে, বিমানে দু'এক ঘণ্টার সফর একাকী করতে কোনো বাধা-নিষেধ নেই। অথচ এই দু'এক ঘণ্টার সফরেই অশ্লীলতায় জড়িয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। আর এমন অনেক বাস্তব দৃষ্টান্তও রয়েছে।[৭৮৪]

প্রশ্ন ৪০৪: মুসাফাহা করা ছাড়া নারীরা কি পুরুষদের সালাম দিতে পারবে?

জবাব: ফকীহগণ এ মাসআলা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তবে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে, আল্লাহ ভালো জানেন, যুবতি নারীদের জন্য বৈধ নয় যে তারা পুরুষদের সালাম দেবে।

আর যদি বয়স্ক নারী হয় এবং প্রবল ধারণা হয় যে, সালাম দিলে কোনো ফিতনা হবে না, তাহলে সালাম দিতে সমস্যা নেই। একইভাবে বৃদ্ধাকে যদি পুরুষেরা সালাম দেয় তাহলেও সমস্যা নেই।

সালাফদের ব্যাপারে জানা নেই যে, এভাবে পার্থক্য করা ছাড়াই তারা নারীদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে তাদেরকে সালাম দিতেন। ফিতনার দরজা বন্ধ করার জন্য যুবতি মেয়েরা পুরুষদের সালাম দেবে না।

এ মূলনীতির পক্ষে অনেক স্পষ্ট দলিল রয়েছে। তন্মধ্যে একেবারে স্পষ্ট দলিল হচ্ছে,

৭৮৪. ফাতাওয়াল ইমারাত, ৫৮

إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ، لاَ مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের জন্য যেনার একটা অংশ নির্ধারণ করে রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়িত হবেই। চোখের যেনা হলো দেখা, আর জিহ্বার যেনা হলো আলোচনা করা। কুপ্রবৃত্তি কামনা-খাহেশ সৃষ্টি করে, আর যৌনাঙ্গ তা সত্য অথবা মিথ্যা প্রমাণ করে।[৭৮৫]

সহীহ সনদে সুনানু আবী দাউদের বর্ণনায় রয়েছে, 'পা যেনা করে' বলার পর তিনি আরও বলেন, মুখও যেনা করে। মুখের যেনা হচ্ছে চুমু খাওয়া।[৭৮৬]

এ হাদীসে দুই প্রকার হারামের কথা বলা হয়েছে:

ক. আনুষঙ্গিক কারণে হারাম। আর তা হলো, ফিতনার দরজা বন্ধ করার জন্য।

খ. মূল জিনিসটাই হারাম। আর তা হলো, যেনা।[৭৮৭]

প্রশ্ন ৪০৫: যদি কোনো পুরুষ কারো সাথে কথা বলার জন্য কাউকে ফোন দেয়, কিন্তু ফোন রিসিভ করে কোনো নারী। তখন সেই ব্যক্তি রিসিভকারী নারীকে তার ভাই, স্বামী-সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। এতে কি কোনো অসুবিধা আছে?

জবাব: এ সময় কথা বলা আবশ্যক হলে তার পূর্বে যেন অবশ্যই সালাম দেয়। মূল বিধান হচ্ছে, ফিতনা রোধের জন্য কোনো পুরুষ কোনো নারীর সঙ্গে কথা বলবে না। তবে যদি ফিতনার আশঙ্কা না থাকে তাহলে সমস্যা নেই।

একইভাবে কোনো নারী যদি তার বোন বা বান্ধবীকে ফোন দিতে গিয়ে কোনো পুরুষ রিসিভ করে, তাহলে প্রয়োজনে সে তাকে তার বোন বা বান্ধবী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। আর পুরুষের সঙ্গে কথা বলা যদি একান্ত প্রয়োজন হয় তবে কোনো নারী কথা বলার শুরুতে সালাম দেবে। কারণ, কোনো কোনো সহীহ হাদীসে এসেছে,

مَنْ بَدَأَ بِالْكَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِيبُوْهُ

যে-ব্যক্তি সালামের পূর্বে কথা শুরু করবে তার জবাব দিয়ো না[৭৮৮]।[৭৮৯]

৭৮৫. সহীহুল বুখারী, ৬২৪৩; সহীহ মুসলিম, ৬৬৪৬
৭৮৬. সুনানু আবী দাউদ, ২১৫৩, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
৭৮৭. ফাতাওয়াল ইমারাত, ১০৪
৭৮৮. আল-জামিউস সগীর, ১১০৬৭, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।
৭৮৯. ফাতাওয়াল ইমারাত, ১০৫

প্রশ্ন ৪০৬: মুসলিম পরিবারে কোনো অমুসলিম নারী বা পুরুষকে কাজের লোক হিসেবে রাখা যাবে কি?

জবাব: কোনো মুসলিম পুরুষের জন্য বৈধ নয়, সে তার পরিবারে কোনো কাফির নারীকে প্রবেশ করাবে। কারণ, কাফির কাজের মেয়ে মুসলিম নারীর গোপন অঙ্গ দেখে ফেলতে পারে। একজন মুসলিম নারীর জন্য পরপুরুষ যেমন গাইর মাহরাম, তেমন কাফির নারীও তার জন্য গাইর মাহরাম। তাই কাফির নারী এমনকী কাজের মেয়ে হলেও তার সামনে কোনো মুসলিম নারী তার চেহারা ও কবজি ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ করতে পারবে না।

যদি কাফির কাজের মেয়ে ক্ষেত্রে বিধান এমন হয়, তাহলে কাফির পুরুষ কাজের লোক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া আরও নাজায়েয। একইভাবে মুসলিম পুরুষকেও কাজের লোক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। যদি স্বামী-স্ত্রীর জন্য কাজের লোক একান্তই লাগে, তাহলে কোনো নারীকে নিয়োগ দিতে পারে; তবে সেই নারীকে অবশ্যই মুসলিমা হতে হবে।[৭৯০]

প্রশ্ন ৪০৭: বাচ্চাকে কোনো মুরব্বি বা মুসলিম কাজের মেয়ের কাছে রেখে নারীরা কি বাসার বাইরে বৈধ কাজ করতে পারবে? এ ব্যাপারে শরীআতের বিধান কী?

জবাব: এ মাসআলায় মূল বিধান হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা নবী-পত্নীদের মাধ্যমে সকল নারীদের বলছেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

> তোমরা তোমাদের বাড়িতে অবস্থান করবে; প্রাচীন জাহিলী যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না।[৭৯১]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পুরুষের ক্ষেত্রে মূল হচ্ছে, তারা বাইরে থাকবে এবং বাইরে বের হবে। আর নারীদের ক্ষেত্রে মূল হচ্ছে, তারা বাড়িতে অবস্থান করবে; আর বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বের হবে না।

সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা নারীদের ওপর পর্দাকে ফরয করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ

---

৭৯০. ফাতাওয়াল ইমারাত, ১০৬

৭৯১. সূরা আহযাব, ৩৩:৩৩

প্রয়োজনে বের হতে তোমাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।[৭৯২]

তাই কোনো নারী যদি প্রয়োজনের তাগিদে সুঘ্রাণ ব্যবহার না করে পর্দা সহকারে বের হয়, তাহলে তাদের এমন বের হওয়া জায়েয। আর তাদের বের হওয়ার কারণে যদি কোনো কিছু ঘটে বা বাড়ির কোনো দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে পূর্বের আয়াত প্রযোজ্য হবে যে, তারা যেন বাড়িতে অবস্থান করে। অতএব, বাচ্চাকে কাজের মেয়ের কাছে রেখে বের হওয়া জায়েয নয়। কারণ, একজন মা তার সন্তানের প্রয়োজন এবং তাদের জন্য উপর্যুক্ত দিকনির্দেশনা ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জানে।[৭৯৩]

প্রশ্ন ৪০৮: পুরুষেরা কি গাইর মাহরার নারীর বাচ্চা প্রসব করাতে পারবে?

জবাব: মূল বিধান হচ্ছে, নারীকে শর্তহীনভাবে বাচ্চা প্রসবের জন্য হাসপাতালে যাওয়ার জন্য ছাড় দেওয়া জায়েয নয়। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরিধি অবশ্যই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করতে হবে।

মহিলা ডাক্তার যদি জানতে পারে যে, গর্ভবতী এই নারীর বাচ্চা স্বাভাবিকভাবে প্রসব হবে না বরং হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে, তখন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। আর যদি স্বাভাবিকভাবে বাচ্চা প্রসব হয়, তাহলে বাড়ি থেকে বের করে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো জায়েয হবে না।

যদি কোনো গর্ভবতীকে হাসপাতালে ভর্তি হতেই হয় তবে তার সন্তান প্রসবের দায়িত্বে কোনো পুরুষকে রাখা যাবে না। তবে যদি কোনো মহিলা ডাক্তার পাওয়া না যায় এবং গর্ভবতীর অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক হয়, তখন পুরুষ ডাক্তার দায়িত্বে রাখা বৈধ হতে পারে।

এ জবাব ফিকহের মূলনীতি শাস্ত্রের দুটি মূলনীতি থেকে গৃহীত:

ক. প্রয়োজন নিষিদ্ধ জিনিসকে বৈধ করে দেয়।

কোনো নারী যদি বাড়িতে বাচ্চা প্রসব করতে সক্ষম হয়, তাহলে তার জন্য হাসপাতালে যাওয়া জায়েয নয়। আর যদি হাসপাতালে ভর্তি হতে বাধ্য হয়, যেমন, তাকে প্রসব কাজে সাহায্য করবে এমন কেউ নেই, তাহলে বাচ্চা প্রসবের দায়িত্বে থাকবে কোনো মহিলা ডাক্তার। আর যদি মহিলা ডাক্তার পাওয়া না যায়, তাহলে কোনো পুরুষ ডাক্তারই যথারীতি দায়িত্ব পালন করবে।

---

৭৯২. সহীহুল বুখারী, ১৪৭

৭৯৩. ফাতাওয়াল ইমারাত, ১০০

মূল বিধান হচ্ছে, প্রয়োজন ছাড়া নারীদের বাড়ির বাইরে বের হওয়া জায়েয নয়। যেমনটি বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

তোমরা তোমাদের বাড়িতে অবস্থান করবে; প্রাচীন জাহিলী যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না।[৭৯৪]

এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ

প্রয়োজনে বের হতে তোমাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে[৭৯৫]।[৭৯৬]

প্রশ্ন ৪০৯: টেস্টটিউব বেবির জন্য কোনো স্বামী কি ডাক্তারকে নিজের বীর্য স্বীয় স্ত্রীর কাছে স্থানান্তর করার ছাড় দিতে পারবে?

জবাব: এটা জায়েয নয়। কারণ, বীর্য স্থানান্তর করলে ডাক্তার কমপক্ষে স্ত্রীর গোপন অঙ্গ উন্মোচন করবে। নারীদের গোপন অঙ্গ দেখা জায়েয নয়। আর শরীআতে যা জায়েয নয়, প্রয়োজন ছাড়া তাতে জড়ানোও জায়েয নয়।

আমরা এটা ভাবতেই পারি না যে, এ হারাম পদ্ধতিতে স্বামীর বীর্য স্বীয় স্ত্রীর কাছে স্থানান্তর করার প্রয়োজন আছে। এ পদ্ধতিতে ডাক্তারকে কখনো প্রয়োজনের ভিত্তিতে পুরুষের গোপন অঙ্গও দেখতে হয়। আর এটা জায়েয নয়।

এ পদ্ধতি অবলম্বন মূলত পশ্চিমাদের হুবহু অনুসরণ। যার স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সন্তান হয়নি, তার টেস্টটিউব পদ্ধতি অবলম্বন করা মানে, সে আল্লাহর ফয়সালা ও নির্ধারণে সন্তুষ্ট নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মুসলিমদেরকে আয়রোজগারের জন্য হালালপন্থা অবলম্বন করতে উৎসাহিত করেছেন, তখন সন্তান পাওয়ার জন্য হালালপন্থা অবলম্বন করার ব্যাপারে আরও বেশি উৎসাহ দেবেন-এটাই অধিক যুক্তিযুক্ত।[৭৯৭]

---

৭৯৪. সূরা আহযাব, ৩৩:৩৩

৭৯৫. সহীহুল বুখারী, ১৪৭

৭৯৬. ফাতাওয়াল ইমারাত, ১০১

৭৯৭. ফাতাওয়াল ইমারাত, ৬৯; পরবর্তীতে আলবানী রাহিমাহুল্লাহ কিছু শর্তসাপেক্ষে এর বৈধতা প্রদান করেন। দেখুন, আল-মাসাইলুল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ফাতাওয়া আশ-শারইয়্যাহ ফাতাওয়াশ শাইখ আল-আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, পৃ. ২৬৬

অধ্যায় পনেরো

ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেন

প্রশ্ন ৪১০: সরকারি কোনো সংস্থার শেয়ার কেনা যাবে কি? সেখানে কোনো সুদের কারবার নেই, তবে তারা তাদের সম্পদ সুদি ব্যাংকে জমা রেখে থাকে।

জবাব: একপর্যায়ে যেহেতু ঘুরেফিরে সুদি ব্যাংকের সাথেই লেনদেন হচ্ছে, তাই এমন শেয়ার কেনা যাবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভিন্ন প্রসঙ্গে বলেন,

وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ

কাজের (ভালোমন্দ নির্ভর করে) শেষ অবস্থার ওপর[৭৯৮]।[৭৯৯]

প্রশ্ন ৪১১: সরকারি কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য কৌশল অবলম্বন করা যাবে কি?

জবাব: ফাঁকি দেওয়া শরীআতের রাস্তা নয়। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া যদিও কর নির্ধারণ করা ইসলামে সিদ্ধ নয়, তবুও রাষ্ট্রের নিয়মের বিপরীতে চলা কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। বিশেষ করে যদি কোনো দ্বীনদার এমন পদ্ধতি অবলম্বন করে তখন সেই দোষ গিয়ে পড়ে সরাসরি দ্বীনের ওপর।[৮০০]

প্রশ্ন ৪১২: শীআ বা সূফীদের বাসা ভাড়া দেওয়া যাবে কি? যারা বিদআতীদের আশ্রয় দেয় তাদেরকে হাদীসে লানত করা হয়েছে। কেউ যদি বিদআতীদের বাসা ভাড়া দেয়, তবে কি সেই ব্যক্তি হাদীসে উল্লিখিত লানতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে?

জবাব: আমি মনে করি না যে, সেই ব্যক্তি লানতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে এখানে কিছু বিষয় আছে। তা হলো, যদি সে তার ভাড়া দেওয়া বাসায় শীআ কিংবা সূফীদের তাদের মতাদর্শ প্রচারের কাজ করে, তাহলে ভাড়া দেওয়া জায়েয হবে না। তখন ভাড়া দেওয়া মানে তাকে

---

৭৯৮. সহীহুল বুখারী, ৬৬০৭
৭৯৯. ফাতাওয়াল ইমারাত, ১৬
৮০০. ফাতাওয়াল ইমারাত, ৭১

বিদআত প্রচারে সহযোগিতা করা। আর যদি সে তার বিদআত নিয়ে আলোচনা না করে এবং তার শীআ ও সূফী মতবাদ প্রচার না করে, তাহলে তাকে ভাড়া দিতে সমস্যা মনে করি না।[৮০১]

প্রশ্ন ৪১৩: জীবনবীমা, গাড়িবীমা, স্থাবর সম্পত্তিবীমা বা এ জাতীয় বীমার বিধান কী? কোনো ইসলামী বীমা আছে কি?

জবাব: বিভিন্ন পণ্যবীমা, গাড়িবীমা, স্থাবর সম্পত্তিবীমা কিংবা জীবনবীমা নামে বর্তমানে যা কিছু পরিচিত, এসবের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে, এসব কুরআন ও হাদীসের নিষিদ্ধ জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। কোনো কোনো ইসলামী দেশে তো এসব ব্যাপকভাবে ছেয়ে গেছে। সত্যি বলতে বীমা একপ্রকার জুয়াই।

আর বর্তমানে বীমার নামে যে পদ্ধতি চালু আছে তাতে ইসলামী বা শরীআতসম্মত কোনো বীমা আজ পর্যন্ত আমি পাইনি। তবে কিছু পদ্ধতি আছে যার মাধ্যমে বীমাকারী ও বীমাকৃত ব্যক্তির মাঝে লেনদেন করলে লাভ আছে। যেমন, এক ব্যক্তি নিজের বাসা বা স্থাবরসম্পত্তি পাহারা দেওয়া ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বীমাকৃত ব্যক্তির নিকট রাখবে। বিনিময়ে উভয়ের সম্মতিতে বেতন নির্ধারণ করা হবে। এমনটা করা জায়েয। কারণ, এটা কর্মচারী রাখার অন্তর্ভুক্ত।

তবে বর্তমানে বীমার নামে যা কিছু চালু আছে সবকটাই নির্জলা জুয়া। হালের সময়ে বীমাকারী যা করে, ইসলামে তা জায়েয নয়। কারণ, তা স্পষ্ট জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।[৮০২]

প্রশ্ন ৪১৪: ঘুস ছাড়া যে কাজ করা সম্ভব নয় সেই কাজের জন্য ঘুস দেওয়া যাবে কি?

জবাব: এক অবস্থা ছাড়া সকল অবস্থায় ঘুস হারাম। সেই এক অবস্থা হলো, কেউ কোনো কিছুর অধিকার রাখে কিন্তু ঘুস ছাড়া সে তার অধিকার আদায় করতে সক্ষম নয়। যেমন, কোর্ট কোনো এক অধিকারের ব্যাপারে আমরের বিপরীতে যাইদের পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু বিচারক যাইদের সেই অধিকার দিতে টালবাহানা শুরু করে। যাইদ বুঝতে পারে বিচারককে ঘুস না দিলে সে তার অধিকার ফিরিয়ে পারে না। এমন অবস্থায় যাইদ ঘুস দিতে পারে। তবে এর মানে নয় যে, বিচারকের জন্য ঘুস নেওয়া জায়েয। কারণ, শরীআতের আলোকে ওয়াজিব হচ্ছে, বিচারক যাইদকে তার অধিকার দিয়ে দেবে।

---

৮০১. ফাতাওয়াল মাদীনাহ, ৭

৮০২. ফাতাওয়াল ইমারাত, ১১০

শরয়ী অর্থে ঘুস হলো, অধিকারকে বাতিল করতে আর বাতিলকে প্রতিষ্ঠিত করতে সম্পদ আদান-প্রদান। তাই অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে আর বাতিলকে নস্যাৎ করতে সম্পদ প্রদান করা হলে, তা ঘুস নয়। যদিও ঘুসগ্রহীতার জন্য তা গ্রহণ করা জায়েয নয়।[৮০৩]

প্রশ্ন ৪১৫: কেউ কি নিজের ব্যবসা বৃদ্ধি করার জন্য পিতার অর্থ নিতে পারবে? অথচ সে জানে তার পিতা সেসব অর্থ সুদি ব্যাংকে রাখে এবং সুদের কারবার করে।

জবাব: প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ওয়াজিব হচ্ছে, সুদের সম্পদ খাওয়া থেকে মুক্ত হতে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। যতদিন খাওয়া একান্ত প্রয়োজন হবে ততদিন উক্ত সম্পদ খাবে। আর উক্ত হারাম সম্পদ দিয়ে নিজের ব্যবসা বৃদ্ধি করা তার জন্য জায়েয নয়। আল্লাহু আলাম।[৮০৪]

প্রশ্ন ৪১৬: হারাম সম্পদের মালিক কীভাবে তাওবা করবে?

জবাব: হারাম সম্পদের মালিকের তাওবা দুই শর্তে পরিপূর্ণ হবে:

ক. সে তার যাবতীয় হারাম সম্পদ বের করে দেবে। বের করে দেওয়া মানে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া নয়; যদিও যাকে দেবে সে গরীব হয়। বরং এর অর্থ হলো, জনহিতকর কাজে দিয়ে দেওয়া।

খ. হারাম উপার্জন, যার মাধ্যমে সে আল্লাহর নাফারমানী করেছে, তা থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা করবে এবং দৃঢ় সংকল্প করবে যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা যাইহোক না কেন, সে পুনরায় আর ঐ কাজ করবে না। সে আল্লাহর এ বাণী বিশ্বাস করবে:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার উপায় নির্ধারণ করে দেবেন এবং তাকে তার অকল্পনীয় উৎস থেকে রিযিক দেবেন।[৮০৫]

এভাবে সে হারাম মাল থেকে বের হতে পারবে। তাতে সে হারাম সম্পদ সুদের হোক বা শরীআত পরিপন্থি যে কোনো হারাম উপায়ে উপার্জিত হোক, যেমন-মদ, হারাম পোশাক বা হারাম জিনিস বিক্রি করা।[৮০৬]

৮০৩. ফাতাওয়াল ইমারাত, ৭২

৮০৪. ফাতাওয়াল ইমারাত, ৯১

৮০৫. সূরা তালাক, ৬৫:২-৩

৮০৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১২/১৫

প্রশ্ন ৪১৭: পুরাতন স্বর্ণ কি নতুন স্বর্ণ দ্বারা কমবেশি করে পরিবর্তন করা যাবে?

জবাব: এর বিধান পরিচিত। কোনো আলেমের মাঝে এ ব্যাপারে মতবিরোধ নেই। কারণ, নবী ﷺ বলেন,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى

> স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণ বিক্রি করতে হবে পরিমাণে সমান সমান। যে-ব্যক্তি অতিরিক্ত দেবে বা অতিরিক্ত গ্রহণ করবে সে যেন সুদি কারবার করল।[৮০৭]

পুরাতন স্বর্ণ বা নতুন স্বর্ণ, উভয় প্রকারই স্বর্ণ। তাই সমান সমান ছাড়া কমবেশিতে বিক্রি করা বা পরিবর্তন করা জায়েয নয়। এটা একটা সমস্যাই বটে; যারা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ কমবেশি করে বিক্রি করে তারা প্রকটভাবে এ সমস্যায় জর্জরিত।[৮০৮]

প্রশ্ন ৪১৮: এক ব্যক্তি কারো থেকে ঋণ নিয়েছে। ঋণগ্রহীতা কি ঋণদাতাকে নিজের কোনো পোশাক বা খাদ্য কিংবা অন্য কোনো কিছু দিয়ে দিতে পারবে?

জবাব: ঋণদাতা কি তার থেকে সেসব জিনিস কিনে নিতে চাচ্ছে, না ঋণগ্রহীতা তাকে কিনতে বাধ্য করছে? যদি প্রথমটা হয়, তাহলে জায়েয আর যদি দ্বিতীয়টা হয়, তাহলে জায়েয নয়।

প্রশ্নকারী: যদি ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়?

জবাব: ঋণদাতা ক্রয় করে নিতে চাইলে জায়েয হবে অন্যথা জায়েয হবে না।[৮০৯]

প্রশ্ন ৪১৯: হাদীসে পানি বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে। এখন যে-কোনো পানি বিক্রি করাই কি হারাম?

জবাব: ইয়াস ইবন আবদুল্লাহ মুযানী ﷺ থেকে বর্ণিত,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

> রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।[৮১০]

---

৮০৭. সহীহ মুসলিম, ৩৯৫২

৮০৮. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১২/১৮৯

৮০৯. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১২/২১৮

৮১০. সুনানুত তিরমিযী, ১২৭১, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

যেসব পানি মালিকানা ছাড়াই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যেমন-সমুদ্র ও নদী-নালার পানি, সেসব পানি বিক্রি করা হারাম। আর যেসব পানি কেউ মেশিনের মাধ্যমে ভূগর্ভ থেকে তুলে, কিংবা কূপ খনন করে অথবা মৃত জমিনকে অনেক কষ্ট-সাধনা করে জীবিত করে, সেসব পানি বিক্রি করা হারাম নয়। আর ষাড়ের পানি বিক্রি করা হারামের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৮১১]

প্রশ্ন ৪২০: ব্যবসায়ীরা একজোট হয়ে অনেক সময় দাম বৃদ্ধি করে দেয়। যেমন, একটা পণ্যের দাম পাঁচ রিয়াল। কিন্তু তারা সবাই একজোট হয়ে সেই পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয় পঞ্চাশ রিয়ালে। এমন করার বিধান কী?

জবাব: এভাবে একজোট হয়ে দাম বৃদ্ধি করা জায়েয নয়। কারণ, নবী ﷺ বলেন,

دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

লোকদের একজনের মাধ্যমে আরেকজনের রিযকের যে ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন সে ব্যবস্থা চালু রাখতে দাও।[৮১২]

একজোট হয়ে এভাবে দাম বৃদ্ধি করা জায়েয নয়। এমনকী বিশেষ সময় ছাড়া গোটা দেশে একই মূল্য চালু করাও জায়েয নয়। কারণ, সহীহ হাদীসে এসেছে, কিছু সাহাবী বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ হচ্ছেন মূল্য নির্ধারণকারী।[৮১৩]

তাহলে ব্যবসায়ীদের একজোট হয়ে পণ্যের দাম বৃদ্ধি করা বা সুবিধা ভোগ করা কীভাবে জায়েয হতে পারে?![৮১৪]

প্রশ্ন ৪২১: কোন পণ্যে কতটুকু লাভ করা যাবে, শরীআতে কি এমন কোনো সীমা আছে?

জবাব: কোনো পণ্যে কতটুকু লাভ করতে হবে, হাদীসে এমন কোনো সীমার কথা আসেনি। এটাই হচ্ছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা। কারণ, কোনো কোনো পণ্যে সত্যিই লাভ কম হয়। কারণ কী? কারণ, সেই পণ্যের চাহিদা বাজারে খুব, যেমন-চিনি, চাল, আটা ইত্যাদি। এগুলো

৮১১. সহীহ মাওয়ারিদুয যামআন, ১/৪৫৮। অর্থাৎ ষাড়ের মাধ্যমে প্রজনন করিয়ে অর্থ নেওয়া হারাম।—সংকলক

৮১২. সহীহ মুসলিম, ৩৭১৮; সুনানুত তিরমিযী, ১২২৩

৮১৩. সুনানুত তিরমিযী, ১৩১৪, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৮১৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১২/২৪৯

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস। প্রতিদিন মানুষ এগুলো ক্রয় করে। এর বিপরীতে এমন কিছু জিনিস আছে সেগুলো গোটা মাসে কি না মাত্র একখানা বিক্রি হয়। অতএব, প্রথম পণ্য আর দ্বিতীয় শ্রেণির পণ্যের লাভের পরিমাণ এক করা বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় হতে পারে না।[৮১৫]

প্রশ্ন ৪২২: যে দোকানে হালাল-হারাম পণ্য বিক্রি করা হয়, সেই দোকানে কাজ করা যাবে কি? এতে কি ঐ ব্যক্তি পাপের অংশীদার হবে? তার উপার্জন কি হালাল হবে?

জবাব: হ্যাঁ, পাপের অংশীদার হবে। কারণ, সে পাপে একজন সহযোগিতাকারী। সে মালিকের মতোই পাপে সহযোগী। অতএব, তার উপার্জন হারাম হবে, হালাল নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

> আর তোমরা পাপ ও অবাধ্যতার কাছে সহযোগিতা করো না।[৮১৬]

আশা করি জবাব পেয়ে গেছেন।[৮১৭]

প্রশ্ন ৪২৩: সিগারেট পানকারী, বাহক, স্থানান্তরকারী, ক্রেতা, বিক্রেতা-এদের বিধান কী?

জবাব: সিগারেটের ব্যাপারে সঠিক মত এবং হারাম হওয়ার ব্যাপারে দলিল পৌঁছার পর এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা পাপী বলে গণ্য হবে। অতএব, তা বিক্রি করা, কেনা, বহন করা, স্থানান্তর করা এবং পান করা জায়েয নয়। আর যদি সিগারেটের ব্যাপারে সঠিক বিধান ও হারাম হওয়ার দলিল না পৌঁছে তাহলে তাকে পাকড়াও করা হবে না।[৮১৮]

প্রশ্ন ৪২৪: কোনো ব্যক্তি একজনের জরিমানার জিম্মাদারী নেয়। পরে একসময় জিম্মাদার ব্যক্তি মারা যায়। এখন কি সেই জিম্মা জিম্মাদারের ওয়ারিসদের কাছে চলে যাবে?

জবাব: না, যাবে না।[৮১৯]

---

৮১৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১২/২৪৭
৮১৬. সূরা মায়েদাহ, ৫:২
৮১৭. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৩/৬৬
৮১৮. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৭/৫৯০
৮১৯. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৩/১০৭

প্রশ্ন ৪২৫: পিতা কি পুত্রকে না জানিয়ে তার পুত্রের সম্পদ নিতে পারবে কিংবা পুত্র কি পিতাকে না জানিয়ে তার পিতার সম্পদ নিতে পারবে?

জবাব: পুত্র পিতাকে না জানিয়ে তার পিতার সম্পদ নিতে পারবে না। এটা জায়েয নয় বরং হারাম। তবে পিতার যদি প্রয়োজন পড়ে, তাহলে পুত্রকে না জানিয়ে তার পুত্রের সম্পদ নিতে পারবে। এটা জায়েয। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ

তুমি ও তোমার সম্পদ (সবকিছুই) তোমার পিতার।[৮২০]

তাই পিতা যদি নিজ সন্তানের সম্পদের মুখাপেক্ষী হয়, তাহলে পিতা সন্তানের সম্পদ থেকে নিতে পারে। কারণ, অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ.

তোমরা যা ভক্ষণ করো তার মধ্যে উত্তম হলো তোমাদের নিজ শ্রমের উপার্জন। আর তোমাদের সন্তানও তোমাদের উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।[৮২১]

অতএব, পিতা যদি সন্তানের অনুমতি ছাড়া তার সম্পদ নিয়ে নেয় তবে তা জায়েয; এটা খারাপ কিছু নয়।[৮২২]

৮২০. সুনানু আবী দাউদ, ৩৫৩২, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৮২১. সুনানু ইবন মাজাহ, ২২৯০, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৮২২. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৩/১০৯

অধ্যায় ষোলো

পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জা

প্রশ্ন ৪২৬: দাড়ির নিচে অর্থাৎ ঘাড়ে যে পশম বের হয়, তা মুণ্ডন করা কি হারাম?

জবাব: আমি তা মুণ্ডন করা হারাম মনে করি না। কারণ, তা দাড়ির অন্তর্ভুক্ত নয়।[৮২৩]

প্রশ্ন ৪২৭: সাদা স্বর্ণ ব্যবহার করা কি জায়েয?

জবাব: সাদা স্বর্ণ দুই প্রকার:

ক. প্লাটিনাম। এটা ব্যবহার করতে সমস্যা নেই। কারণ, স্বর্ণ ও রৌপ্য ছাড়া দামি ধাতব পদার্থ হারাম হওয়ার ব্যাপারে শরীআতে কোনো প্রমাণ নেই।

প্লাটিনামও এই মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হবে; বস্তুর ক্ষেত্রে মূল হচ্ছে, সব হালাল।

খ. লাল স্বর্ণ কিন্তু তাতে কেমিক্যাল ব্যবহার করে প্লাটিনামের রঙে পরিবর্তন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্বর্ণের বিধান প্রযোজ্য হবে।[৮২৪]

প্রশ্ন ৪২৮: স্বর্ণের প্রলেপ দেওয়া জিনিস, যেমন-কলম, ঘড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করার বিধান কী?

জবাব: এখানে দুটি বিষয় আছে। উভয়ের মাঝে পার্থক্য করা আবশ্যক।

প্রথম বিষয়, যদি প্রলেপ করা স্বর্ণের পরিমাণ একেবারেই সামান্য হয়, তাহলে মাফযোগ্য। আমরা তা হারাম বলব না।

দ্বিতীয় বিষয়, ঘড়ির কথাই ধরুন, স্বর্ণের প্রলেপ করা জিনিসটা যদি কারো হাতে দেখামাত্রই লোকেরা তা স্বর্ণের মনে করে, তাহলে মানুষেরা তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা করবে। এ ক্ষেত্রে

---

৮২৩. ফাতাওয়াল মাদীনাহ, ১২৯

৮২৪. ফাতাওয়াল ইমারাত, ১২৪

সন্দেহপূর্ণ জিনিস বাদ দিয়ে সন্দেহাতীত জিনিস ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ তা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে; যদিও তা ব্যবহার করা মূলগত হারাম নয়।[৮২৫]

প্রশ্ন ৪২৯: দামি পাথরওয়ালা ঘড়ি ব্যবহার করা কি জায়েয?

জবাব: স্বর্ণ ও রৌপ্য ছাড়া দামি ধাতব পদার্থ শরীআতে হারাম করা হয়নি। তাই দামি পাথরওয়ালা ঘড়ি ব্যবহার করাতে কোনো সমস্যা নেই।[৮২৬]

প্রশ্ন ৪৩০: আমরা কিছু মানুষকে ডানহাতে ঘড়ি পরতে দেখি। তারা বলে, ডানহাতে ঘড়ি পরা মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে কি কোনো প্রমাণ আছে?

জবাব: আমরা এই মাসআলায় একটি মূলনীতি অনুসরণ করব; যে মূলনীতি আয়েশাহ ﷺ'র হাদীসে রয়েছে। হাদীসটি হলো,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِى تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ ، وَفِى شَأْنِهِ كُلِّهِ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো এবং পবিত্রতা অর্জনসহ তাঁর সকল কাজে ডান দিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।[৮২৭]

এর সাথে আমরা আরেকটি হাদীস যুক্ত করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ

ইহুদী ও খ্রিস্টানেরা (দাড়ি-চুলে) রং লাগায় না। অতএব, তোমরা তাদের বিরোধিতা করো।[৮২৮]

মুশরিকদের বিরোধিতা করার ব্যাপারে আরও অন্যান্য হাদীস রয়েছে। এসব হাদীস থেকে একটি মূলনীতি পাওয়া যায়, কাফিরদের বিরোধিতা করার মানসিকতা রাখা একজন মুসলিমের জন্য মুস্তাহাব। অনুরূপ আমাদের মনে রাখতে হবে, কাফিরদের বিরোধিতা করা এক জিনিস আর তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা, যা কি না নিষিদ্ধ, সেটা ভিন্ন জিনিস। তাই কাফিরদের

৮২৫. ফাতাওয়াল ইমারাত, ১২৫
৮২৬. ফাতাওয়াল ইমারাত, ১২৬
৮২৭. সহীহুল বুখারী, ১৬৮; সহীহ মুসলিম, ১১৮৭
৮২৮. সহীহুল বুখারী, ৩৪৬২; সহীহ মুসরিম, ২১০৩

সাদৃশ্য অবলম্বন করা কোনো মুসলিমের জন্য জায়েয নয়। সে সর্বদা কাফিরদের বিরোধিতার মানসিকতা লালন করবে।

কাফিরদের প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে বামহাতে ঘড়ি পরা। আর আমরা এই অভ্যাসে তাদের বিরোধিতা করার জন্য শরীআতে এক বিরাট অধ্যায় পাচ্ছি। তাই ডানহাতে ঘড়ি পরলে যেমন ডানদিক থেকে কাজ শুরু করার মূলনীতি বাস্তবায়ন করা হবে, তেমনি কাফিরদের বিরোধিতা করার মূলনীতিও বাস্তবায়ন করা হবে।[৮২৯]

প্রশ্ন ৪৩১: ডানদিকে চুল বিন্যস্ত করার ব্যাপারে কি কোনো দলিল আছে?

জবাব: এ ব্যাপারে কোনো কিছু নেই। এটা একটা স্বভাবগত বিষয়। ইবাদতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আর শরীআত স্বভাবগত বিষয়ের জন্য কোনো নীতি নির্ধারণ করেনি। অন্যদিকে এর কোনো বর্ণনাও আসেনি। এ ব্যাপারে মানুষকে স্বাধীন রাখা হয়েছে।[৮৩০]

প্রশ্ন ৪৩২: প্যান্ট পরিধান করার বিধান কী?

জবাব: প্যান্ট পরিধানে দুটো আপদ রয়েছে:

প্রথম আপদ: গোপন অঙ্গসমূহের আকার বা ধরন বোঝা যায়, বিশেষ করে মুসল্লীদের। আর নারী তো দূরের কথা কোনো পুরুষের জন্য এমন পোশাক পরিধান করা জায়েয নয়, যে পোশাকে গোপন অঙ্গসমূহের আকার ও ধরন বোঝা যাবে।

দ্বিতীয় আপদ: এটা কাফিরদের পোশাক। আর হাদীসে প্রমাণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَنِي ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

আমি কিয়ামতের পূর্বে প্রেরিত হয়েছি, যাতে এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়, আর যার কোনো শরীক নেই। আমার রিযক আমার বর্শার ছায়ায় নিচে রাখা হয়েছে। অপদস্থতা ও লাঞ্ছনা তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে যে আমার বিরোধিতা করবে। যে যেই জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৮৩১]

---

৮২৯. ফাতাওয়াল ইমারাত, ৫৭

৮৩০. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৭/৭১২

৮৩১. ইরওয়াউল গালীল, ১২৬৯, আলবানী এ হাদীসের সনদকে হাসান বলেছেন।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে তাঁকে সালাম দেয়। তিনি তাকে বলেন,

إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا

এটা কাফিরদের পোশাক। তুমি তা পরিধান করো না।[৮৩২]

অতএব, কোনো কারণে যদি কোনো মুসলিমকে প্যান্ট পরিধান করতে হয়, তাহলে তার উচিত হবে, তার ওপর লম্বা জ্যাকেট পরিধান করে নেওয়া; যেমনটা আমাদের পাকিস্তানী বা হিন্দুস্তানী কিছু ভাই করে থাকে।[৮৩৩]

প্রশ্ন ৪৩৩: ইযার বা লুঙ্গি লম্বা করে পরার বিধান কী?

জবাব: একবার আবদুল্লাহ ইবন উমার ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে প্রবেশ করলে তার লুঙ্গি (মাটিতে ছুঁয়ে) আওয়াজ করছিল। তখন তিনি আবদুল্লাহ ইবন উমারকে বললেন,

إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللهِ فَارْفَعْ إِزَارَكَ فَرَفَعْتُ إِزَارِي إِلَى نِصْفِ السَّاقَيْنِ فَلَمْ تَزَلْ إِزْرَتُهُ حَتَّى مَاتَ

তুমি যদি আবদুল্লাহ হও, তবে তোমার লুঙ্গি ওঠাও। আবদুল্লাহ বললেন, ফলে আমি আমার লুঙ্গি অর্ধ-জঙ্ঘা পর্যন্ত উঠিয়ে নেই; আর মৃত্যু পর্যন্ত তার লুঙ্গির অবস্থা এমনই ছিল।[৮৩৪]

মুসলিমের জন্য ওয়াজিব হচ্ছে, সে দুই টাখনুর নিচে লম্বা করে লুঙ্গি পরবে না, বরং লুঙ্গি রাখবে টাখনুর ওপরে; যদিও তার অহংকারের অভিপ্রায় না থাকে। এ হাদীসে কিছু শাইখের খণ্ডন রয়েছে যারা তাদের জুব্বার নিম্নাংশ এমন লম্বা করে রাখেন যে, যেন মাটি স্পর্শ করছে। তারা মনে করেন, আমরা তো অহংকার করছি না। ইস! তারা যদি ইবন উমার ﷺ'কে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে আদেশ দিয়েছিলেন তার অনুসরণ বর্জন না করত। না কি তারা ইবন উমার ﷺ'র চেয়ে অধিক পরিশুদ্ধ অন্তরের মালিক?![৮৩৫]

---

৮৩২. সহীহ মুসলিম, ২০৭৭

৮৩৩. ফাতাওয়াল ইমারাহ, ৩

৮৩৪. মুসনাদ আহমাদ, ৬২৬৩

৮৩৫. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ১৫৬৮ নং হাদীসের অধীনে।

প্রশ্ন ৪৩৪: বাসার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য খাঁচায় পাখি পোষার বিধান কী?

জবাব: মূল বিধান হচ্ছে তা বৈধ। তবে শর্ত হচ্ছে, পাখি যেন তাকে পরিবারের সদস্যদের থেকে অমনোযোগী না করে ফেলে।[৮৩৬]

প্রশ্ন ৪৩৫: কুরআনের আয়াত দিয়ে ডেকোরেশন করার বিধান কী?

জবাব: ডেকোরেশন বা সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য কুরআনের আয়াত লটকানো শরীআতসিদ্ধ নয়। যারা এমন কাজ করে তারা শরীআতসম্মত কাজ করে না। কারণ, কুরআন দেওয়াল সাজানোর জন্য অবতীর্ণ হয়নি; বরং কুরআনে যে প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশ আছে তার মাধ্যমে সুসংহত অন্তর নির্মাণ করার জন্য এসেছে।[৮৩৭]

৮৩৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৭/৭১১
৮৩৭. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৭/৭১৬

অধ্যায় সতেরো

দুআ ও আযকার

প্রশ্ন ৪৩৬: কোনো মুসলিমের জন্য কি জায়েয আছে যে, সে নির্দিষ্ট দিনের জন্য কিছু যিকরকে নির্দিষ্ট করে নেবে, যেমন-প্রতি অমুক দিন অমুক দুআ পড়বে, প্রতি অমুক সময় অমুক যিকর করবে?

জবাব: এমনটা করা কোনো মুসলিমের জন্য জায়েয নয়। কারণ, এটা একধরনের শরীআত রচনা, যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য জায়েয নয়।[৮৩৮]

প্রশ্ন ৪৩৭: কোনো মায়ের জন্য কি জায়েয হবে যে, সে তার দুগ্ধপায়ী শিশুর পক্ষ থেকে শরীআতসিদ্ধ যিকর ও দুআ পড়বে? যেমন, সে তাকে কাপড় পরাচ্ছে তখন আল্লাহর নাম নেবে বা খাবার খাওয়াচ্ছে তখন বিসমিল্লাহ বলবে বা বিছানায় শোয়াচ্ছে তখন তালুতে ফুঁ দিয়ে সূরা ইখলাস, ফালাক এবং নাস পড়ে শরীর মুছবে, যেমনটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

জবাব: জায়েয নয়। এটা দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বাড়াবাড়িকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে।[৮৩৯] মুসলিমের জন্য এটা যথেষ্ট যে, সে নিজের পক্ষ থেকে শরীআতসম্মত দুআ করবে বা যেসব যিকর তার ওপর ফরয সেগুলো সে পালন করবে। আর অন্যের পক্ষ থেকে জায়েয নয়; বিশেষ করে ছোট বাচ্চা যার ওপর এখনো শরীআতের দায়দায়িত্ব অর্পণ হয়নি। তাই শরীআতের দায়দায়িত্ব অর্পণ হয়নি এমন বাচ্চার পক্ষ থেকে মায়ের যিকর ও দুআ পড়া জায়েয নয়।[৮৪০]

প্রশ্ন ৪৩৮: কেউ যদি হাঁচি দেওয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ বলে, তাহলে কি তার জবাব দেওয়া ওয়াজিব?

৮৩৮. ফাতাওয়াল মাদীনাহ, ৬০
৮৩৯. সহীহ মুসলিম, ৬৬৭৭; সুনানু আবী দাউদ, ৪৬০৮
৮৪০. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৭/১১৬-১১৭

জবাব: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلاَ تُشَمِّتُوهُ

তোমাদের কেউ যদি হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে তাহলে তোমরা তার জবাব দাও। আর যদি 'আলহামদুলিল্লাহ' না বলে তাহলে জবাব দিয়ো না।[৮৪১]

আলেমদের মাঝে প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, হাঁচির জবাব দেওয়া ফরযে কিফায়াহ। তাই কেউ জবাব দিলে বাকিদের পক্ষ থেকে ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে আবু হুরাইরাহ ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ

তোমাদের কেউ যদি হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলে তাহলে প্রত্যেক মুসলিম শ্রোতার ওপর ওয়াজিব তার জবাব দেওয়া।[৮৪২] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে।[৮৪৩]

এটা স্পষ্ট প্রমাণ যে, যারাই হাঁচিদাতাকে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতে শুনবে তাদের সবার ওপর ওয়াজিব তার জবাব দেওয়া। এটা ফরযে কিফায়াহ নয় বরং ফরযে আইন বা প্রত্যেকের ওপর ফরয।[৮৪৪]

প্রশ্ন ৪৩৯: কেউ যদি সালাতের মধ্যে হাঁচি দেয় তাহলে কি সে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে?

জবাব: সে যদি সরব কিরাআতে ইমামের পেছনে মুক্তাদী হয়, তাহলে তার পেছনে কোনো কথাই বলা যাবে না। আর যদি সে নীরব কিরাআতে ইমামের পেছনে মুক্তাদী হয় অথবা একাকী সালাত আদায় করে আর কিরাআতের মাঝে হাঁচি না হয়, তাহলে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতে পারবে। কিরাআতের মাঝে হাঁচি হলে, আল্লাহর কালামের ভেতর, বাইরের কোনো কিছু প্রবেশ করানো জায়েয নয়।[৮৪৫]

৮৪১. সহীহ মুসলিম, ৭৩৭৮
৮৪২. সহীহুল বুখারী, ৬২২৩
৮৪৩. সহীহুল বুখারী, ৬২২৬
৮৪৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৭/১৯৯-২০০
৮৪৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৭/২০২

প্রশ্ন ৪৪০: হাদীসে এসেছে, নবী ﷺ সূরা মুলক, অন্য বর্ণনায় আছে, সূরা ইসরা, সূরা যুমার ও সূরা সাজদা না পড়ে ঘুমাতেন না। এগুলো কখন পড়তে হবে; বিছানায় শুয়ে না কি শোয়ার আগে?

জবাব: মূল ব্যাপার হচ্ছে, তিনি ঘুমানোর পূর্বে এগুলো পড়তেন। এখন বসে পড়বে না কি শুয়ে পড়বে, সেটা তার নিজের ব্যাপার।[৮৪৬]

প্রশ্ন ৪৪১: হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমানোর পূর্বে সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে শরীরে হাত মুছতেন। প্রশ্ন হচ্ছে, পোশাকের ওপর দিয়ে মুছতেন না কি পোশাকের নিচ দিয়ে? আর প্রথমে সূরাগুলো পড়তে হবে, তারপর কি তালুতে হালকা থুথু মিশ্রিত ফুঁক দিতে হবে?

জবাব: শরীরে মুছতেন। এখানে এত কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। যদি শরীরের কোনো অংশ খোলা থাকত তাহলে সরাসরি শরীরে আর যদি পোশাক থাকত তাহলে পোশাকের ওপর দিয়ে। প্রথমে দুই তালুতে হালকা থুথু মিশ্রিত ফুঁক দিতে হবে, এরপর সূরা পড়তে হবে, অতঃপর শরীরে মুছতে হবে।[৮৪৭]

প্রশ্ন ৪৪২: সকাল-সন্ধ্যার যিকরগুলো কখন পড়তে হবে? দলিল কী? এক হাদীসে মাগরিবের পর পড়ার কথা এসেছে।

জবাব: সকালের যিকর করতে হবে ফজরের পর আর সন্ধ্যার যিকর করতে হবে আসরের পর। কারণ, আরবী ভাষায় 'মাসা বা সন্ধ্যা' বলা হয়, আসরের পরের সময়কে। যে হাদীসে মাগরিবের পর পড়ার কথা এসেছে, সে হাদীসটি সহীহ নয়।[৮৪৮]

প্রশ্ন ৪৪৩: দুআর পর মুখে হাত মোছার বিধান কী?

জবাব: দুআর পর মুখে হাত মোছার পক্ষে কোনো সহীহ হাদীস নেই। হাত মোছার কথা শুধু দুর্বল হাদীসে এসেছে।

প্রশ্নকারী: তাহলে কি আমরা হাত মোছাকে বিদআত গণ্য করব?

---

৮৪৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৭/২০৭

৮৪৭. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৭/২০৮-২০৯

৮৪৮. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৭/২১৫, পরিমার্জিত

জবাব: যখন জানতে পারলেন এ সংক্রান্ত হাদীস দুর্বল, তখন তা বিদআত।[৮৪৯]

প্রশ্ন ৪৪৪: ফরয সালাতের পর হাত তুলে দুআ করার বিধান কী?

জবাব: সালাতের পর হাত তোলা শরীআতসম্মত নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ অসংখ্য সালাত আদায় করেছেন অথচ একবারের জন্যও হাত তুলেছেন বলে কোনো কিছু বর্ণিত হয়নি। তিনি কিছু ছোটো দুআ শুনিয়ে পড়তেন, যেমন-আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ও হুসনি ঈবাদাতিকা। তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত হয়নি, আমি বলছি না 'প্রমাণিত নয়', বলছি, 'বর্ণিত হয়নি' যে, তিনি সালাত শেষ করে দুআয় হাত তুলেছেন। আর বর্তমানে কিছু কিছু ইমাম জামাআতবদ্ধভাবে যেভাবে দুআ করে সেভাবে তিনি জামাআতবদ্ধভাবে হাত তুলেছেন-এমনটা বর্ণিত হওয়া অনেক দূরের কথা। এভাবে জামাআতবদ্ধভাবে হাত তুলে দুআ করাতে দুটি বিদআত রয়েছে:

ক. সালাতের পর, যদিও ফরয সালাত হয়-দুআতে হাত তোলাকে আবশ্যক করে নেওয়া।
খ. জামাআতবদ্ধভাবে দুআ করা।[৮৫০]

প্রশ্ন ৪৪৫: তাসবীহদানা কিংবা অন্যান্য উপকরণ দিয়ে তাসবীহ পড়া ও তাসবীহ গোনার বিধান কী?

জবাব: একটি হাদীসে এসেছে, নবী ﷺ কঙ্কর দিয়ে তাসবীহ পাঠ করতেন। হাদীসটি বানোয়াট। তা ছাড়া আবদুল্লাহ ইবন আমর ﷺ থেকে প্রমাণিত হাদীস পরিপন্থি উল্লিখিত হাদীসটি। আবদুল্লাহ ইবন আমর ﷺ বলেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ.

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ'কে ডান হাত দ্বারা গুনে গুনে তাসবীহ পাঠ করতে দেখেছি।[৮৫১]

সুনানু আবী দাউদসহ অন্যান্য গ্রন্থে প্রমাণিত আছে, তিনি নারীদেরকে আঙুলের সাহায্যে গুনে গুনে তাসবীহ পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলতেন, আঙুলগুলোকে কথা বলার শক্তি দিয়ে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে।[৮৫২] হাদীসটি হাকিম ও যাহাবী সহীহ বলেছেন।

---

৮৪৯. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৭/২৪৮
৮৫০. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৭/২৬১
৮৫১. সুনানু আবী দাউদ, ১৫০৪; আস-সুনানুল কুবরা, ৩১৪৮
৮৫২. সুনানুত তিরমিযী, ৩৫৮৩; মিশকাতুল মাসাবীহ, ২৩১৬, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

অতএব, যেসব যিকর গুনে গুনে পড়া শরীআতসম্মত সেসব যিকর এভাবে আঙুল দিয়ে গণনা করা সুন্নাত। গণনা করতে হবে ডানহাত দিয়ে। বামহাত দিয়ে বা উভয় হাত দিয়ে কিংবা কঙ্কর দিয়ে গণনা করা সুন্নাত পরিপন্থি। তাসবীহ্‌দানা তো দূরের কথা কঙ্কর দিয়ে গণনা করার ব্যাপারেও কোনো সহীহ হাদীস নেই।[৮৫৩]

৮৫৩. সিলসিলাতুয যঈফাহ, ১০০২ হাদীসের অধীনে

অধ্যায় আঠারো

পান ও ভোজন

প্রশ্ন ৪৪৬: একসঙ্গে কিছু লোক থাকলে খাবার বা পানীয় পরিবেশনকারী কার থেকে পরিবেশন শুরু করবে?

জবাব: আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঘরে আগমন করেন এবং কিছু পান করতে চান। আমরা আমাদের একটা বকরির দুধ দোহন করে তাতে আমাদের কুয়ার পানি মিশাই। তারপর তা তাঁকে দেই। সেসময় আবু বাকর ﷺ ছিলেন তাঁর বামে, উমার ﷺ ছিলেন তাঁর সামনে আর এক বেদুঈন ﷺ ছিলেন তাঁর ডানে। তিনি পান করা শেষ করলে উমার ﷺ বললেন, ইনি আবু বাকর। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বেদুঈনকে অবশিষ্ট পানি দেন। এরপর তিনি বলেন, 'ডানদিকের ব্যক্তিদের (অগ্রাধিকার), ডানদিকের ব্যক্তিদেরকেই (অগ্রাধিকার)। শোনো, ডানদিক থেকেই শুরু করবে।' আনাস ﷺ বলেন, এটাই সুন্নাত, এটাই সুন্নাত, এটাই সুন্নাত।[৮৫৪]

এ হাদীসে বলা হয়েছে, পরিবেশনকারী নবী ﷺ দ্বারা পরিবেশন শুরু করেন। এমনটা করার কারণ হচ্ছে, তিনি পানীয় চান। তাই এ হাদীস দ্বারা দলিলগ্রহণ করা যাবে না যে, উপস্থিতদের মধ্যে বড়ো ব্যক্তিত্ব দ্বারা পরিবেশন শুরু করতে হবে, যেমনটা বর্তমানে প্রচলিত আছে। কীভাবে হতে পারে অথচ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বড়োকে দ্বারা শুরু করেননি। বরং তিনি আবু বাকর বামদিকে থাকায় আবু বাকরকে বাদ দিয়ে ডানদিকে থাকা বেদুঈনকে অবশিষ্ট পানীয় দেন। তারপর তিনি বলেন, 'ডানদিকের ব্যক্তিদের (অগ্রাধিকার), ডানদিকের ব্যক্তিদেরকেই (অগ্রাধিকার)। শোনো, ডানদিক থেকেই শুরু করবে।'[৮৫৫]

প্রশ্ন ৪৪৭: পুরো তালু দিয়ে খাওয়া কি সুন্নাত? আর চামচ দ্বারা খাওয়ার বিধান কী?

জবাব: এক হাদীসে এসেছে, নবী ﷺ পুরো তালু দ্বারা খেতেন। কিন্তু হাদীসটি বানোয়াট। কোনো কোনো আরব দেশে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে খাওয়া হয়। তারা পাত্র থেকে ভাত বা

৮৫৪. সহীহুল বুখারী, ২৫৭১
৮৫৫. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ১৭৭১ নং হাদীসের অধীনে

এ জাতীয় জিনিস তালু দ্বারা খায়। সহীহ হাদীসে তিন আঙুল দিয়ে খাওয়ার কথা এসেছে। এভাবে তারা সহীহ হাদীস পরিপন্থি কাজ করে আর সহীহ হাদীস পরিপন্থি বানোয়াট হাদীস অনুযায়ী আমল করে।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, কেউ কেউ চামচ দ্বারা খেতে ইতস্ততবোধ করে। তারা এভাবে খাওয়াকে সুন্নাহ পরিপন্থি মনে করে। অথচ তা গাড়িতে চড়া বা বিমানে আরোহণ করা ইত্যাদি আধুনিক ব্যবস্থার মতো অভ্যাসগত বিষয়; ইবাদতের বিষয় নয়। অথচ তারা তালু দিয়ে খাওয়ার সময় নবী ﷺ -এর সুন্নাতের কথা বেমালুম ভুলে যায় বা অবলীলায় ভুলে থাকে।[৮৫৬]

প্রশ্ন ৪৪৮: ঘোড়ার মাংস খাওয়ার বিধান কী?

জবাব: হাদীসে এসেছে,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ খাইবার যুদ্ধের দিন পালিত গাধার মাংস খেতে নিষেধ করেছেন, আর ঘোড়ার মাংস খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।[৮৫৭]

এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয়, ঘোড়ার মাংস খাওয়া জায়েয। এটা আবু হানীফা ছাড়া চার মাযহাবের ইমামদের মত। আবু হানীফার মতে ঘোড়ার মাংস খাওয়া হারাম। তবে তার দুই ছাত্র আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ, আবু হানীফার বিপরীতে মত দিয়েছেন এবং অধিকাংশের পক্ষে ফাতাওয়া দিয়েছেন। উপর্যুক্ত সহীহ হাদীসের কারণে এ মত সঠিক। আর এ মত গ্রহণ করেছেন আবু জাফর তাহাবী।[৮৫৮]

প্রশ্ন ৪৪৯: আমদানি করা মাংস কি খাওয়া যাবে?

জবাব: আমদানি করা মাংস কয়েকরকম হতে পারে:

১. এমন প্রাণীর মাংস, যেসব প্রাণীর মাংস খাওয়া জায়েয। এসব প্রাণীর মাংস আবার দুই প্রকার হতে পারে:

---

৮৫৬. সিলসিলাতুয যঈফাহ, ১২০২ নং হাদীসের অধীনে

৮৫৭. সহীহুল বুখারী, ৫৫২০

৮৫৮. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ৩৫৯ নং হাদীসের অধীনে

ক. আহলে কিতাবরা জবাই করেছে। এ জবাই আবার তিন প্রকার হতে পারে:

- শরয়ী পদ্ধতিতে জবাই করা হয়েছে। এমনটা হলে খাওয়া হালাল।
- হত্যা করে জবাই করা হয়েছে। এমনটা হলে খাওয়া হারাম।
- আবার জানি না কীভাবে জবাই করা হয়েছে। এমনটা হলে বলব, সন্দেহপূর্ণ জিনিস ত্যাগ করে সন্দেহমুক্ত জিনিস গ্রহণ করুন।

খ. আহলে কিতাব ছাড়া অন্যান্য কাফিরদের জবাই করা। এমনটা হলে হালাল নয়।

২. এমন প্রাণীর মাংস, যেসব প্রাণীর মাংস খাওয়া হারাম বা বৈধ নয়। এমনটা হলে আমদানি করা মাংস খাওয়া যাবে না।[৮৫৯]

প্রশ্ন ৪৫০: আমি কোনো ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে সে আমার সামনে খাবার পরিবেশন করে। আমি কি তাকে সেই খাবারের উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারব?

জবাব: সেই খাবার যদি ইসলামী দেশে হয় আর প্রবল ধারণা হয় তা ইসলামী পদ্ধতি জবাই করা হয়েছে, তাহলে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই।

আর যদি এমনটা না হয়, যেমন, কাফির দেশে মুসলিম মেজবান আপনার সামনে খাবার পরিবেশন করেছে, আর আপনি জানেন, সেই দেশে মুসলিমরা জবাই করে না বললেই চলে অথবা বাইরের দেশ থেকে আমদানি করা মাংস আপনার সামনে পেশ করেছে, আর আমদানি করা মাংসের বিধান নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায় তা জবাই করা না কি হত্যা করা-এই দুই অবস্থায় মেহমান জিজ্ঞেস করতে পারে।[৮৬০]

প্রশ্ন ৪৫১: খাওয়ার সময় কি চুপ থাকতে হয়?

জবাব: এমন কোনো কথা নেই। অন্যান্য সময় কথা বলার যেমন বিধান খাওয়ার সময়ও তেমন বিধান। আর হাদীসে কথা বলার ব্যাপারে এসেছে,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

৮৫৯. ফাতাওয়াল মাদীনাহ, ৬৩

৮৬০. ফাতাওয়াল ইমারাত, ২৫

যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে, অন্যথা চুপ থাকে।[৮৬১]

আর নবী ﷺ ছোটো বাচ্চাকে বলেন,

يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

বৎস! বিসমিল্লাহ বলো, ডানহাতে খাও এবং তোমার পার্শ্ব থেকে খাও।[৮৬২]

খাবারের ব্যাপারে এই হলো আলাপসালাপ। তবে চুপ থাকা ভালো।[৮৬৩]

প্রশ্ন ৪৫২: মুরগির বিষ্ঠাকে কি ছাগলের খাবার করা যাবে?

জবাব: শরয়ীভাবে বিষ্ঠা দুই প্রকার:

ক. পবিত্র বিষ্ঠা। যেসব প্রাণীর মাংস খাওয়া বৈধ সেসব প্রাণীর বিষ্ঠা পবিত্র। যেমন: মুরগি, ছাগল, গরু, উট ইত্যাদি। এসব প্রাণীর বিষ্ঠা নাপাক নয়।

খ. যেসব প্রাণীর মাংস খাওয়া বৈধ নয়, যেমন খচ্চর, গাধা ইত্যাদি।

অতএব, মুরগির বিষ্ঠা বা মুরগির অবশিষ্ট জিনিস ব্যবহার করা জায়েয। যেসব প্রাণীর মাংস খাওয়া বৈধ সেসব প্রাণীর বিষ্ঠা বা পেশাবের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; উভয়ের বিধান একই।[৮৬৪]

প্রশ্ন ৪৫৩: জবাই করার সময় কিবলামুখী হওয়া কি মুস্তাহাব?

জবাব: জবাই করার সময় কিবলামুখী হওয়া মুস্তাহাব বলার পক্ষে কোনো দলিল নেই। বরং মুস্তাহাব বলা মাকরূহ ও অ-শরীআতসম্পন্ন। কারণ, এমনটা বলা দ্বীনের নামে বিদআত চালু করার অন্তর্ভুক্ত। আর বিদআত চালু করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।[৮৬৫]

---

৮৬১. সহীহুল বুখারী, ৬০১৮; সহীহ মুসলিম, ৭৭
৮৬২. সহীহুল বুখারী, ৫৩৭৬; সহীহ মুসলিম, ৫১৬৪
৮৬৩. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৭/৩৮৪
৮৬৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৭/৪৮৫
৮৬৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৭/৫০১

প্রশ্ন ৪৫৪: কোনো নারী কি জবাই করতে পারবে?

জবাব: কেন পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তো বলেছেন,

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

নারীরা পুরুষের মতোই।[৮৬৬]

অতএব, তারা জবাই করতে পারবে, এমনকী হায়েয অবস্থাতেও।[৮৬৭]

প্রশ্ন ৪৫৫: কেউ পাখি শিকার করার জন্য বিসমিল্লাহ বলে একটি পাখিকে তির ছুড়ল। কিন্তু অভিষ্ট পাখিটিতে তিরখানা না লেগে অন্য আরেকটি পাখিতে লাগল। এই পাখিটি কি খাওয়া হালাল হবে?

জবাব: হ্যাঁ, হালাল হবে। বিসমিল্লাহ বলে তির ছুড়লেই হালাল হবে।[৮৬৮]

৮৬৬. সুনানু আবী দাউদ, ২৩৬, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৮৬৭. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৭/৫০২

৮৬৮. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৭/৪৭৩

অধ্যায় উনিশ

খেলাধুলা, শরীরচর্চা ও আনন্দ-ফুর্তি

প্রশ্ন ৪৫৬: যেসব গানে দফ বা একমুখো ঢোল বাজানো হয়, সেসব গান শোনার বিধান কী?

জবাব: বর্তমানে এসব গানের নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামী সংগীত' নাম রাখা হয়েছে। ইসলামে 'ইসলামী সংগীত' নামে কোনো কিছু পাওয়া যায় না। ইসলামে পাওয়া যায় কবিতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً

নিশ্চয়ই কবিতা প্রজ্ঞাপূর্ণ।[৮৬৯]

আমরা কবিতার মাধ্যমে গান গাইব আর তাকে ইসলামী সংগীত বলব, এমনটা আমাদের সালাফরা জানতেন না; বিশেষ করে যখন দফের মতো কিছু বাদ্যযন্ত্র যুক্ত করা হবে।

মোদ্দাকথা, ইসলামী সংগীত বলতে কিছুই নেই। প্রজ্ঞাপূর্ণ ও ভালো অর্থবোধক কবিতা আছে শরীআতে। সেসব কবিতা একাকী অবস্থায় বা বিবাহ অনুষ্ঠানের মতো কিছু অনুষ্ঠানে গাওয়া যায়। যেমন, আয়েশাহ ﷺ'র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আনসারদের বিবাহ অনুষ্ঠান থেকে আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা গান গেয়েছো? কেননা আনসাররা গান পছন্দ করে। আয়েশাহ ﷺ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কী বলে গান গাইব? তিনি বললেন, আমরা তোমাদের কাছে এসেছি, আমরা তোমাদের কাছে এসেছি। তোমরা আমাদের সালাম দাও, আমাদেরকে তোহফা দাও। আমরাও তোমাদের সালাম দেই, তোমাদের তোহফা দেই। যদি তামাটে রঙের গম না হতো তবে তোমাদের চিবুক মোটা হতো না।[৮৭০]

এটা কবিতা ছিল তবে ইসলামী গান নয়। এটা ছিল বৈধ কথা দ্বারা মনকে উৎফুল্ল করার কবিতা।[৮৭১]

---

৮৬৯. সহীহুল বুখারী, ৬১৪৫
৮৭০. ইরওয়াউল গালীল, ১৯৯৫, এ হাদীসের কবিতার কিছু অংশ ছাড়া বাকিসব সহীহ।-সংকলক
৮৭১. ফাতাওয়াল ইমারাত, ১৬

প্রশ্ন ৪৫৭: তাস, দাবা ও পাশা খেলার বিধান কী?

জবাব: তাস কাফিরদের খেলা। তাসের গায়ে থাকা অনেক ছবিতে কাফিরেরা নিজেদের আকীদা ও শিরক অঙ্কন করে রাখে। বাজি ছাড়াও তাস খেলা কমপক্ষে মাকরূহ। কারণ, এতে ছবি থাকে এবং এই খেলায় ধ্যান-জ্ঞান সব ঢেলে দেওয়া হয়।

আলী ﷺ থেকে বর্ণিত এক হাদীসের কথা এখন মনে পড়ছে, তিনি একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যারা দাবা খেলছিল। তিনি তাদের বলেন, এসব কেমন মূর্তি যার সামনে তোমরা ঝুঁকে আছো?

কারণ, দাবা ঘোড়ার মতো মূর্তি। তাস খেলার কয়েক প্রকার আছে। এক প্রকার তাস খেলা মনকে অমনোযোগী ও ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। আর আরেক প্রকার খেলায় বাজি থাকে। বাজি থাকলে তা পাশা খেলার সদৃশ হবে। আর পাশা খেলা হারাম হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট সহীহ হাদীস আছে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, নবী ﷺ বলেন,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ

যে-ব্যক্তি পাশা খেলে সে যেন শুকরের মাংস ও রক্তের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দেয়।[৮৭২]

আর যে তাস খেলায় মন অন্যান্য কিছু থেকে অমনোযোগী হয়ে যায় সেই তাস খেলার বিধান দাবার মতো, মাকরূহ। যারা দাবা খেলায় আক্রান্ত তাদের পরামর্শ দেব, তারা যেন ছোটো মূর্তিগুলোর মাথা কেটে ফেলে।

মূলনীতি হচ্ছে, যে-কোনো খেলা হোক, তাতে মূর্তি ও ছবি থাকলে, তা থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব। আর যেসব খেলায় মূর্তি বা ছবি থাকবে না তা মাঝেমধ্যে চিত্তবিনোদনের জন্য খেলা জায়েয। তবে তা এমন অভ্যাসে পরিণত করা যাবে না যে, তাতেই তার সময় ব্যয় হবে এবং সালাত ও পরিবার থেকে গাফেল হয়ে পড়বে। এমন অভ্যাস হয়ে গেলে তা মদের মতো হয়ে যাবে, যা মানুষকে সালাত ও যিকর থেকে দূরে রাখে।[৮৭৩]

প্রশ্ন ৪৫৮: ইসলামিক ছবি বা ফিল্ম বানানো ও দেখার বিধান কী?

জবাব: ইসলামে বেশ কিছু কারণে ছবি বানানো জায়েয নয়। যেমন:

---

৮৭২. সহীহ মুসলিম, ২২৬০; সুনানু আবী দাউদ, ৪৯৩৯; সুনানু ইবন মাজাহ, ৩৭৬৩

৮৭৩. ফাতাওয়াল ইমারাত, ৬৩

প্রথম কারণ: এটা কাফিরদের অনুকরণ। আর কাফিরদের পদ্ধতি তাদের জন্য উপযোগী, মুসলিমদের জন্য উপযোগী নয়। কারণ, কাফিরেরা উপলব্ধি করে তাদের এমন কিছু পদক্ষেপ দরকার যা তাদেরকে ভালোর দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের মতো তাদের কাছে কোনো শরীআত নেই, যে শরীআত তাদের জন্য কল্যাণকর। কুরআনের মাত্র একটি আয়াত এমন অসংখ্য ছবির কাজ করে। তারা এমন জাতি যাদের কোনো হালাল-হারাম নেই। তাহলে কীভাবে আমরা তাদের পদ্ধতি, সংস্কৃতি ও রসমরেওয়াজ গ্রহণ করতে পারি?!

সেসব উপকরণ তাদের জন্য উপযোগী হতে পারে কিন্তু আমাদের জন্য উপযোগী নয়। কারণ, আমাদের কাছে আছে তার চেয়ে উত্তম জিনিস। যেমন, জাবির ইবন আবদুল্লাহ ﵁'র হাদীসে এসেছে, একদিন নবী ﷺ উমারের হাতে একটি সহীফা দেখেন। তিনি তাকে বলেন, এটা কী? উমার ﵁ বললেন, এটা তাওরাতের সহীফা। আমার জন্য এক ইহুদী এটা লিখেছে। তখন নবী ﷺ বললেন,

أَمُتَهَوِّكُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي

তোমরাও কি নির্বিচারে সব কিছু মেনে নিতে চাও, যেমন ইহুদী ও খ্রিস্টানরা মেনে নিয়েছে? আমি কি তোমাদের কাছে শুভ্র ও নির্মল শরীআত নিয়ে আগমন করিনি? যদি মূসাও জীবিত থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর কোনো ইখতিয়ার ছিল না।[৮৭৪]

দ্বিতীয় কারণ: এসব ছবি বানাতে গেলে অবশ্যই এমন মিথ্যা অভিনয় করতে হবে, ইসলামী ইতিহাস ও সীরাতে যার কোনো ভিত্তিই নেই।

তৃতীয় কারণ: এসব ছবিতে কখনো পুরুষেরা নারীর সাদৃশ্য অবলম্বন করে, আবার কখনো নারীরা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করে। আবার কখনো নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাও হয়।

প্রমাণিত আছে, কোনো এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের সাথে যাচ্ছিলেন। তিনি এক গাছের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সেই গাছটিতে মুশরিকরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। গাছটিকে 'যাতু-আনওয়াত' বলা হতো। সাহাবীরা তা দেখে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের যেমন 'যাতু-আনওয়াত' আছে, আমাদের জন্যও যাতু আনওয়াতের ব্যবস্থা করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সুবহানাল্লাহ! এটা তো মূসার উম্মাতের কথার মতো হলো। তারা

৮৭৪. মুসনাদ আহমাদ, ১৫১৫৬; মিশকাত, ১৭৭, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

বলেছিল, কাফিরদের যেমন অনেক উপাস্য আছে, তেমন আমাদেরও উপাস্যের ব্যবস্থা করে দিন।[৮৭৫]

ইহুদীদের মূসাকে বলা 'কাফিরদের যেমন অনেক উপাস্য আছে, তেমন আমাদেরও উপাস্যের ব্যবস্থা করে দিন' আর সাহাবীদের বলা 'তাদের যেমন যাতু আনওয়াত আছে, আমাদের জন্যও যাতু আনওয়াতের ব্যবস্থা করুন'-এর মাঝে অনেক ফারাক রয়েছে। ইহুদীরা মূসা আলাইহিস সালামকে উক্ত আবেদন করেছিল মূর্তিপূজা করার জন্য, আর সাহাবীরা আবেদন করেছিল মুশরিকদের মতো অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রাখার জন্য। এরপরও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কথায় আপত্তি তুলেছিলেন শ্রেফ আবেদনের শব্দে মিল থাকার কারণে। এর মাধ্যমে তিনি কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করাকে সমূলে উৎপাটন করে দেন।

কাফিরেরা কেন এসব ছবি বানায়? কারণ, আমাদের কাছে যেমন রূহের খাবার আছে তাদের কাছে তা নেই। তাদের থেকে ছবি বানানোর নীতি গ্রহণ করা এক জিনিস আর গাড়ি, বিমান বা অন্যান্য উপকরণ গ্রহণ করা ভিন্ন জিনিস। গাড়ি বা বিমান এসব গ্রহণ করা তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করার অন্তর্ভুক্ত নয়।[৮৭৬]

প্রশ্ন ৪৫৯: গ্রহণযোগ্য পোশাক পরে শরীরচর্চার জন্য সপ্তাহে একদিন ফুটবল খেলা যাবে কি?

জবাব: গ্রহণযোগ্য পোশাকে সঠিক সময়ে সালাত আদায় করলে, এভাবে ফুটবল খেলা জায়েয।[৮৭৭]

প্রশ্ন ৪৬০: কোনো নারী কি অন্যান্য নারীদের সামনে নৃত্য করতে পারবে?

জবাব: পুরুষের সামনে পুরুষ, নারীর সামনে নারী বা নারী-পুরুষ মিলে কোনো প্রকার নৃত্য করা জায়েয নয়। কারণ, এমন নৃত্যতে অনেক ধরনের অনার্থক জিনিস রয়েছে; যা থেকে মুসলিমরা দূরে থাকবে। নৃত্যের সময় বিশেষ করে নারীরা পরস্পরের সামনে সৌন্দর্য-এর অঙ্গসমূহ প্রকাশ করে। আর এটা ইসলামে জায়েয নয়।

৮৭৫. সুনানুত তিরমিযী, ২১৮০, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
৮৭৬. ফাতাওয়াল ইমারাত, ১১৬
৮৭৭. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৭/৪২৩

তবে খাস করে বিয়ের অনুষ্ঠানে নারীরা গান গাইতে পারে; যদি গান হয় সুন্দর, রুচিসম্পন্ন আর তাতে যদি অশ্লীল কথাবার্তা না থাকে এবং তা যদি ফাসিক ও বেহায়ারা যেসব গান গায় সেসব গান না হয়। গান কখনো কখনো সুন্দর ও ভালো অর্থবোধক হতে পারে। যেমন,

আয়েশাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি আনসারদের বিবাহ অনুষ্ঠান থেকে আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা গান গেয়েছো? কেননা আনসাররা গান পছন্দ করে। আয়েশাহ ﷺ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কী বলে গান গাইব? তিনি বললেন, আমরা তোমাদের কাছে এসেছি, আমরা তোমাদের কাছে এসেছি। তোমরা আমাদের সালাম দাও, আমাদেরকে তোহফা দাও। আমরাও তোমাদের সালাম দেই, তোমাদের তোহফা দেই। যদি তামাটে রঙের গম না হতো তবে তোমাদের চিবুক মোটা হতো না।'[৮৭৮]

একথাগুলো সুন্দর ও রুচিসম্পন্ন। এমন গান হলে অসুবিধা নেই।[৮৭৯]

৮৭৮. ইরওয়াউল গালীল, ১৯৯৫, কবিতার কিছু অংশ ছাড়া হাদীসটি সহীহ।-সংকলক

৮৭৯. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৭/৩৬৯-৩৭০

অধ্যায় বিশ

চিকিৎসা

প্রশ্ন ৪৬১ : অপরাধ বা অপরাধীকে চিহ্নিত করা শেখার জন্য মানুষের লাশে এনাটমি অনুশীলন করা যাবে কি?

জবাব: যদি মুসলিম নরনারীর লাশ হয় তবে পোস্টমর্টেম করা যাবে না। কারণ, ﷺ বলেছেন,

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ.

মৃত মুমিনের হাড় ভাঙা জীবিত অবস্থায় ভাঙার ন্যায়।[৮৮০]

মৃত মুসলিমকে এমন সম্মান করা যাবে না, যে সম্মান করলে তাওহীদ ত্রুটিপূর্ণ হয়। তথাপি ইসলাম তাদের যথেষ্ট সম্মানও দিয়েছে। কিছু কিছু হাদীসে এদুটো বিষয় একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মৃতকে এত বেশি সম্মানপ্রদর্শন করতে নিষেধ করা হয়েছে যার মাধ্যমে তাওহীদ ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়, আবার তাদেরকে অসম্মান করতেও নিষেধ করা হয়েছে। যেমন সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا

তোমরা কবরের ওপর বসবে না এবং সেদিকে সালাত আদায় করবে না।[৮৮১]

‘তোমরা কবরের ওপর বসবে না’ কারণ এর মাধ্যমে মৃতব্যক্তিকে অপমান করা হয়। ‘সেদিকে সালাত আদায় করবে না’ কারণ এর মাধ্যমে তার পূতপবিত্র ঘোষণা করা হয়। সালাত কাবা ছাড়া অন্যদিকে আদায় করা জায়েয নয়। ‘কবরের ওপর বসবে না’ কথা ‘মৃত মুমিনের হাড় ভাঙা জীবিত অবস্থায় ভাঙার ন্যায়’ কথার সদৃশ।

আপনি পোস্টমর্টেমের জন্য কারণ হিসেবে উল্লেখ করলেন যে, এর মাধ্যমে মৃত্যুর কারণ চিহ্নিত করা হয়-যা কি না একটা ভিনদেশি পদ্ধতি। কাফিরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে যে

৮৮০. সুনানু আবী দাউদ, ৩২০৭; সুনানু ইবন মাজাহ, ১৬১৬, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
৮৮১. সহীহ মুসলিম, ২১৪০; সুনানু আবী দাউদ, ৩২২৯

নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এটা তার অন্তর্ভুক্ত হবে। কুরআন ও হাদীসে আমাদেরকে যে কাফিরদের বিরোধিতা করতে বলা হয়েছে সেই কাফিরদের দেশ থেকে পোস্টমর্টেম সংক্রান্ত যেসব নিয়মকানুন উৎসারিত, সেসব নিয়মকানুন গ্রহণ করা যাবে না। প্রথমত, মুসলিমদের উচিত ইসলামী পদ্ধতি এবং কাফিরদের পরস্পর বিরোধী প্রবৃত্তিপ্রসূত ও স্বরচিত পদ্ধতির মাঝে ফারাক জানা। দ্বিতীয়ত, ইসলামী পদ্ধতি নিয়ে গর্ব করা এবং তাদের পদ্ধতি থেকে নিরাপদ রাখার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা। তারা তো মৃত্যুর কারণ উন্মোচন ও হত্যার রহস্য উদ্ঘাটন, এসবের জন্য শরয়ী বিধিবিধান প্রয়োগ করে না। তাদের রয়েছে স্বরচিত বিধিবিধান। ফলে তারা এসব পদ্ধতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। এসব পদ্ধতি শরীআতসম্মত নয়, যেমন আপনি শুনলেন, মৃত মুমিনের হাড় ভাঙা জীবত অবস্থায় ভাঙার ন্যায়।

মৃত ব্যক্তি যদি কাফির হয় আর তার পরিবার যদি অনুমতি দেয়, তাহলে পোস্টমর্টেম করা যাবে। কিন্তু যদি মুসলিমদের পক্ষ থেকে কাফিরদের প্রতি বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে এ কাজ করা হয়, তাহলে তা জায়েয নয়। ইসলামী আদব হচ্ছে, মুসলিম ও কাফিরদের মাঝে যে যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধেও কাফিরদের লাশ দাফন দিতে মুসলিমদের আদেশ দেওয়া হয়েছে। কাফিরেরা আজ মুখে মানবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বুলি আওড়ালেও বাস্তবে তা সারহীন। মানবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে কেবল ইসলামই জানে। কাফিররা সত্যিকারার্থে মানবাধিকার জানলে যেমনটি তারা নিজেদের ক্ষেত্রে মনে করে-ইসলামী শরীআত অনুসরণ করত আর ইসলামী শরীআত তাদের এসব উদ্ভাবিত নিয়মকানুনের প্রয়োজন পূরণ করত। আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর ও পরকালের প্রতি প্রতি ঈমান আনে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তাকে হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দ্বীনকে নিজেদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে না-তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যে পর্যন্ত না তারা বশ্যতা সহকারে স্বেচ্ছায় জিজিয়া (কর) দেয়।[৮৮২]

আশা করি আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছেন।[৮৮৩]

৮৮২. সূরা তাওবা, ৯:২৯
৮৮৩. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৬/৪৫৫-৪৫৬

প্রশ্ন ৪৬২: ডাক্তারি শেখার জন্য প্রাণীর, যেমন-খরগোশ, ব্যাঙ-এর অঙ্গব্যবচ্ছেদ করা কি জায়েয?

জবাব: হ্যাঁ, জায়েয। কারণ, আল্লাহ বলেছেন, তিনি তোমাদের জন্য জমিনের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।[৮৮৪]

প্রশ্ন ৪৬৩: রক্তদান করা যাবে কি?

জবাব: রক্তদান করাতে আমি কোনো সমস্যা দেখি না। কারণ, প্রবাহিত রক্ত তখন নাপাক হয় যখন তা বাতাস ও বস্তুর পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে। কিন্তু সরাসরি এক শরীর থেকে আরেক শরীরে স্থানান্তরিত করলে তাতে আমি সমস্যা মনে করি না। যদিও দুই ব্যক্তি দুই ধর্মের অনুসারী হয়-একজন হয় মুসলিম, অন্যজন হয় কাফির; এতে আমি সমস্যা মনে করি না। তবে রক্ত বিক্রি করা যাবে না। এটা বিক্রি করা হারাম।[৮৮৫]

প্রশ্ন ৪৬৪: কিডনি, ফুসফুস, অন্তর, মগজ এসব অঙ্গ কি দান করা যাবে বা স্থানান্তর করা যাবে?

জবাব: প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, একজন থেকে আরেকজনের কাছে অঙ্গ স্থানান্তর করা যাবে না। কারণ, যার থেকে স্থানান্তর করা হচ্ছে সে যদিও মৃত হয়, তাহলে তার অঙ্গবিকৃতি করা হবে, আর যদি জীবত হয় তাহলে নিজেকে ক্ষতির দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। দুই পদ্ধতির যে পদ্ধতিতেই স্থানান্তর করা হোক, তা আমি জায়েয মনে করি না।[৮৮৬]

প্রশ্ন ৪৬৫: মৃত্যুর সময় দেহ বা কোনো অঙ্গ দান করার অসীয়ত করা যাবে কি?

জবাব: যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। কারণ, এটা মৃতের ওপর বাড়াবাড়ি ও জুলুম। জীবিত মুমিন যেমন সম্মানিত, মারা গেলেও তাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে। এ কারণে সহীহ মুসলিমের হাদীসে, মুসলিমের কবর মাড়াতে এবং তার ওপর বসতে নিষেধ করা হয়েছে। অন্য হাদীসে তো এনিয়ে আরও ভয়াবহ কথা এসেছে। বলা হয়েছে, মৃত মুমিনের হাড় ভাঙা জীবত অবস্থায় ভাঙার ন্যায়। অর্থাৎ শাস্তির দিক থেকে মৃত মুমিনের হাড় ভাঙা জীবত অবস্থায় ভাঙার ন্যায়। অন্যথা মারা যাওয়ার পর মৃত ব্যক্তি তো শরীরে কোনো কিছু উপলব্ধি করতে পারে না।

৮৮৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৬/৪৫৮

৮৮৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৬/৪৭২

৮৮৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৬/৪৭১

মোটকথা, এখানে শরীআতের দিক থেকে মৃত মুমিনের হাড় ভাঙা জীবিত অবস্থায় ভাঙার ন্যায়।[৮৮৭]

প্রশ্ন ৪৬৬: কোনো বিকৃত বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলে, যেমন-দুটো মাথা বা অতিরিক্ত দুই পা, এমন বাচ্চাকে হাসপাতালে মেরে ফেলা হয়। এটা কি জায়েয?

জবাব: জায়েয নয়। এটা হারাম। আল্লাহ কোনো কিছু অনর্থক সৃষ্টি করেন না। তিনি বান্দাদের দেখাতে চান, আমি যা ইচ্ছে করতে পারি এবং যা ইচ্ছে চয়ন করতে পারি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন আর যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। এতে তাদের কোনো ইখতিয়ার নেই। আল্লাহ পবিত্র ও মহান। তারা যাকে তাঁর সাথে শরীক করে তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে।[৮৮৮]

আল্লাহ যে বাচ্চাকে দেখাতে চান এবং তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তা হত্যা করা জায়েয নয়। কারণ, এই প্রকার সৃষ্টিকে কোনো কোনো সৃষ্টি পছন্দ করে না। আর এটা কাফিরদের অভ্যাস। এটা জায়েয নয়।[৮৮৯]

প্রশ্ন ৪৬৭: এক মহিলার পেটে ভ্রূণ রয়েছে। সেই মহিলার ইতোপূর্বে যে কয়টা বাচ্চা হয়েছে, সবগুলোই বিকৃত হয়েছিল। এখন এই মহিলা কি চার মাসের আগে ভ্রূণ নষ্ট করতে পারবে?

জবাব: বিকৃত বাচ্চাগুলো জন্মের পর বেঁচে থাকে না কি পেটে থাকতেই মারা যায়?

প্রশ্নকারী: কিছুদিন বেঁচে থাকে এরপর মারা যায়। কেন?

জবাব: আমি ভ্রূণ নষ্ট করা জায়েয মনে করি না। তবে চার মাসের আগে হলে ভিন্ন কথা।

প্রশ্নকারী: তাহলে চার মাসের পূর্বে ভ্রূণ নষ্ট করা যাবে?

৮৮৭. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৬/৪৭৪-৪৭৫
৮৮৮. সূরা কাসাস, ২৮:৬৮
৮৮৯. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৬/৫১৭

জবাব: যাবে, তবে তা মাকরূহ। আপনি যে কাহিনি বললেন একই কাহিনি এর আগেও আমি শুনেছি। এক মহিলাকে ডাক্তারেরা বলে, আপনার বিকৃত সন্তান জন্ম নেবে। পরে দেখা যায়, সে একটি সুন্দর ও নিখুঁত বাচ্চা প্রসব করে। তাই আমরা ডাক্তারদের দেওয়া তথ্য একেবারে নির্ভুল ও নিশ্চিত মনে করতে পারি না। কখনো তাদের অনুমান ভুল হয়। তবে অবস্থা যাইহোক, রূহ ফুঁকে দেওয়ার আগে যদি ভ্রূণ নষ্ট করে তবে তা হারামের স্তরে পৌঁছাবে না; আর তখন তা জায়েয। বিশেষ করে যখন উল্লিখিত মহিলার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে।[৮৯০]

প্রশ্ন ৪৬৮: চিকিৎসার জন্য পুরুষেরা মেহেদি দিয়ে পা রাঙাতে পারবে কি?

জবাব: কিছু হাদীসে মেহেদি দিয়ে চিকিৎসা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তাই কোনো পুরুষ যদি চিকিৎসার জন্য মেহেদি দিয়ে পা রাঙায় তাহলে তা জায়েয। অন্যথা তা নারীদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা বলে গণ্য হবে।[৮৯১]

প্রশ্ন ৪৬৯: একভাই মানবচিকিৎসা অনুষদে পড়ালেখা করছে। উক্ত অনুষদের একটি নিয়ম হচ্ছে, উলঙ্গ লাশ নিয়ে গবেষণা করতে হবে। শরীআতে এর বিধান কী?

জবাব: লাশ উলঙ্গ করা বা উলঙ্গ লাশ দেখা ছাড়া যদি উক্ত জ্ঞানার্জনের বিকল্প কোনো রাস্তা না থাকে তাহলে জায়েয; অন্যথা জায়েয নয়।[৮৯২]

প্রশ্ন ৪৭০: কোনো খ্রিস্টানকে কি রক্তদান করা যাবে?

জবাব: যদি আপনার মাঝে ও তার মাঝে ভালো সম্পর্ক থাকে এবং তাকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার নিয়তে দান করেন, তাহলে জায়েয। অন্যথা জায়েয নয়।[৮৯৩]

---

৮৯০. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৬/৫২২
৮৯১. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৬/৫৮৩
৮৯২. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৬/৫৫৭
৮৯৩. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৬/৪৭৩

অধ্যায় একুশ

বিবাহ ও দাম্পত্য

প্রশ্ন ৪৭১: ছেলেকে যদি তার বাবা কোনো ভাতিজি বা নিকটাত্মীয় কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে বলে, তাহলে কি ছেলে বাবার প্রস্তাব নাকচ করতে পারবে? এটা কি তার জন্য জায়েয হবে?

জবাব: যদি পাত্রী সতী না হয় তবে জায়েয আছে। আর যদি পাত্রী সতী ও মুমিনাহ হয়, তাহলে বাবার আনুগত্য করা ওয়াজিব।[৮৯৪]

প্রশ্ন ৪৭২ : দিনে-রাতে স্ত্রীর সাথে কতবার মিলন করা যাবে, এ ব্যাপারে শরীআতে কি কোনো সীমা আছে?

জবাব: না, সীমা নেই। এটা সম্পূর্ণ তাদের সক্ষমতা ও নিজ ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।[৮৯৫]

প্রশ্ন ৪৭৩: স্বামী কি তার স্ত্রীর লজ্জাস্থানে চুমু দিতে পারবে? অনুরূপ স্ত্রী কি তার স্বামীর লজ্জাস্থানে চুমু দিতে পারবে?

জবাব: এ প্রশ্ন আমাকে অনেক দেশে করা হয়েছে। আমি বলেছি, এটা কুকুরের কাজ। আর নবী ﷺ আমাদেরকে প্রাণীর সাদৃশ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

আমি তো আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি। তাদের জন্য জলে-স্থলে যানবাহনের ব্যবস্থা করেছি। তাদেরকে পবিত্র রিযিক দিয়েছি আর আমি তাদেরকে আমার অধিকাংশ সৃষ্টির ওপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।[৮৯৬]

---

৮৯৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১২/৪১

৮৯৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১২/২১৭

৮৯৬. সূরা ইসরা, ১৭:৭০

আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছেন এবং অনেক সৃষ্টি থেকে তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তাহলে কীভাবে মানুষ নীচ হতে পারে? একজন মুসলিম তার রবের কিতাব থেকে তার মর্যাদা জানার পরও এমন প্রাণীর কাজ কীভাবে করতে পারে যে প্রাণী কি না সবচেয়ে নিকৃষ্ট! যে প্রাণী কি না কোনো পাত্রে মুখ দিলে একবার মাটিসহ সাতবার ধৌত করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে!

এ কাজ করা হারাম হওয়া এবং হারাম বলার ব্যাপারে আমাদের কাছে স্পষ্ট কোনো দলিল নেই; তবে আমাদের কাছে স্পষ্ট দলিল আছে যে, প্রাণীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা যাবে না, বিশেষ করে কুকুরের মতো নিকৃষ্ট প্রাণীর।[৮৯৭]

প্রশ্ন ৪৭৪: স্ত্রীর মুখে মিলন করার বিধান কী?

জবাব: এটা কোনো মুসলিমের কাজ হতে পারে না।

প্রশ্নকারী: দলিল কী?

জবাব: এ ব্যাপারে কোনো দলিল নেই। তবে প্রাণীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে।[৮৯৮]

প্রশ্ন ৪৭৫: স্ত্রীর সাথে আলিঙ্গন বা আমোদ করার সময় স্বামী কি তার স্তন্যপান করতে পারবে?

জবাব: এ ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।[৮৯৯]

প্রশ্ন ৪৭৬: স্ত্রীর লজ্জাস্থান দেখা স্বামীর জন্য কি হারাম?

জবাব: মিলনের সময় লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো হারাম বলা মানে মিলনের মাধ্যমকে হারাম করে দেওয়া। যখন আল্লাহ তাআলা স্বামীর জন্য স্ত্রীর সঙ্গে মিলন করা হালাল করে দিয়েছেন, তখন এটা কি বিবেকসম্পন্ন কথা হতে পারে যে, তিনি লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো নিষেধ করে দিয়েছেন? না, হতে পারে না। লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো জায়েয হওয়াকে শক্তিশালী করে আয়েশাহ ﵂'র একটি হাদীস। তিনি বলেন,

---

৮৯৭. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১২/২১৬
৮৯৮. প্রাগুক্ত
৮৯৯. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১২/২১৭

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ - بَيْنِي وَبَيْنَهُ - وَاحِدٍ فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِي دَعْ لِي .

আমি আর রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতাম, যা আমার ও তার মাঝখানে থাকত। তিনি আমার থেকে আগে তাড়াতাড়ি (গোসল) করে ফেলতেন। তখন আমি বলতাম, আমার জন্যে একটু রেখে দিন, আমার জন্য একটু রেখে দিন![৯০০]

এ হাদীসের বাহ্যিকতা প্রমাণ করে, লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো জায়েয। সুলাইমান ইবন মূসার সূত্রে বর্ণিত ইবন হিব্বানের হাদীস একে শক্তিশালী করে। সুলাইমান ইবন মুসাকে জিজ্ঞেস করা হয়, স্বামী তার স্ত্রীর লজ্জাস্থানের দিকে তাকাতে পারবে কি? তিনি বলেন, আমি এ সম্পর্কে আতাকে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, আমি এ সম্পর্কে আয়েশাহ ﷺ'কে জিজ্ঞেস করি। তিনি জবাবে উপর্যুক্ত হাদীসের অর্থে হাদীস শোনান।

ইবন হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এই হাদীস স্পষ্ট দলিল যে, স্বামী, স্ত্রীর লজ্জাস্থানের দিকে, আর স্ত্রী, স্বামীর লজ্জাস্থানের দিকে, তাকাতে পারবে।' যখন তাকানো প্রমাণ হলো, তখন মিলন আর গোসলের সময় তাকানোর মাঝে কোনো ফারাক নেই।[৯০১]

প্রশ্ন ৪৭৭: আযল[৯০২] করার বিধান কী?

জবাব: আযলের ব্যাপারে সর্বনিম্ন বলা যায়, তা মাকরূহ। আর মাকরূহ হলে আলেমদের পরিভাষায় তা থেকে জায়েয প্রমাণ হয়। কখনো কোনো বিষয় মাকরূহ হওয়া সত্ত্বেও জায়েয হয়।

আযল জায়েয হওয়ার পক্ষে দলিল হচ্ছে জাবির ﷺ'র হাদীস। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। জাবির বলেন,

كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

যখন কুরআন নাযিল হতো তখন আমরা আযল করতাম।[৯০৩]

---

৯০০. সহীহ মুসলিম, ৬১৯
৯০১. সিলসিলাতুস যঈফাহ, ১৯৫
৯০২. মিলনের সময় বীর্য যোনিগর্ভের বাইরে ফেলা।
৯০৩. সহীহুল বুখারী, ৫২০৯; সহীহ মুসলিম, ৩৪৫১

জাবির ﷺ'র কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমরা যখন আযল করছিলাম, তখন এর বিধান নিয়ে কুরআনে কোনো কিছু নাযিল হয়নি। এর মানে তা জায়েয।

তবে আমরা জায়েযের সাথে যুক্ত করে বলব, তা মাকরূহ। কিন্তু এই মাকরূহ হওয়ার বিধান আবার কোত্থেকে আসল? রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিম্নের বাণীটি গবেষণা করার মাধ্যমে মাকরূহ হওয়ার বিধানটি আসে। তিনি বলেন,

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

তোমরা প্রেমময়ী ও অধিক সন্তান প্রসবকারী নারীকে মেয়ে বিয়ে করো। কারণ, আমি কিয়ামতের দিন নবীদের কাছে তোমাদের সংখ্যাধিক্যতা নিয়ে গর্ব করব।[১০৪]

যে-ব্যক্তি আযল করবে নিঃসন্দেহে সে নবী ﷺ-এর এ আশা পূরণ করতে পারবে না।

আযলের ওপর ভিত্তি করে দেশে দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের নামে বেশকিছু নিয়ম চালু করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা নবী ﷺ -এর আশা ও গর্ব-এর পরিপন্থি। এ ছাড়া এটি পশ্চিমাদের অনুসরণও বটে। যে পশ্চিমারা কি না সন্তান লালনপালনের সওয়াবে মোটেও বিশ্বাসী নয়। যেমন, নবী ﷺ বলেন,

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ : مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

যখন কোনো মানুষ মারা যায় তখন তার থেকে তার আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; তবে তিনটা আমল বিচ্ছিন্ন হয় না: ক। চলমান সাদকা, খ। উপকারী জ্ঞান এবং গ। তার জন্য দুআ করে এমন নেকসন্তান।[১০৫]

নবী ﷺ আরও বলেন,

لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لاَ تَمَسُّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ

কোনো দুই মুসলিমের (স্বামী-স্ত্রীর) তিনটি সন্তান মারা গেলে তাকে জাহান্নাম স্পর্শ করবে না; তবে কসম পূর্ণ করার জন্য।[১০৬]

১০৪. সুনানু আবী দাউদ, ২০৫০, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
১০৫. সুনানুত তিরমিযী, ১৩৭৬, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
১০৬. সহীহুল বুখারী, ১২৫১; মুসলিম, ২৬৩২

আমাদের কাছে যে ফযীলত আছে কাফিরদের কাছে কি তা আছে? কস্মিনকালেও নেই। মোদ্দাকথা, যদি কোনো বিজ্ঞ মুসলিম চিকিৎসক বিশেষ প্রয়োজনের কথা বলে, তখন স্ত্রীর জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ করা জায়েয।[১০৭]

প্রশ্ন ৪৭৮: জামাই কি শাশুড়ির কপালে চুমু দিতে পারবে?

জবাব: অবশ্যই পারবে। এ চুমু হবে দয়া ও সহানুভূতি প্রকাশের; বিশেষ করে যদি তার শাশুড়ি বৃদ্ধা হয়, জৈবিক চাহিদা না থাকে।[১০৮]

প্রশ্ন ৪৭৯: স্বামী-স্ত্রী যদি একসঙ্গে বিমানে সফর করে, তাহলে স্ত্রী কি বিমানে পরপুরুষদের সামনে সালাত আদায় করতে পারবে?

জবাব: স্ত্রী যদি পর্দা সহকারে থাকে, তাহলে অবশ্যই পারবে। এই সময় নারী-পুরুষের মাঝে কোনো ফারাক নেই। স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকেই সময় মতো সালাত আদায় করবে, যদিও তা বিমানে হয়।[১০৯]

প্রশ্ন ৪৮০: নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি তালাক দিলে তার তালাকের বিধান কী?

জবাব: নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি তালাক দিলে তার তালাক কার্যকর হবে। কারণ, সে নিজ থেকে নিজের ব্যাপারে অপরাধ করেছে। নেশাগ্রস্তের তালাক রসিকতার ছলে তালাকের মতো; বরং রসিকতার ছলে তালাকের তুলনায় নেশাগ্রস্তের তালাক কার্যকর হওয়া আরও বেশি যুক্তিযুক্ত। যে-ব্যক্তি রসিকতার ছলে তালাক দেবে, তার তালাক হয়ে যাবে। আর যে-ব্যক্তি নেশাদ্রব্য পান করে সে তালাকের ব্যাপারে রসিকতাকারীর চেয়ে বেশি বড়ো অপরাধী।

যদি রসিকতা করে তালাক দিলে তালাক কার্যকর হয়ে যায়, তাহলে নেশাগ্রস্তের তালাক কার্যকর হওয়া আরও বেশি যুক্তিযুক্ত। এ মত তাদের বিপরীতে যারা বলে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি নিজের ইচ্ছার মালিক নয় বা নিজের ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম। আমরা তাদের জবাবে বলব, সে মালিক ছিল কিন্তু নিজেই সে নিজের চেষ্টা ও কামাইয়ে মালিকানা হারিয়েছে।[১১০]

---

১০৭. ফাতাওয়াল ইমারাত, ৩১

১০৮. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৫/৩০৫

১০৯. প্রাগুক্ত

১১০. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১২/৪২০

প্রশ্ন ৪৮১: হস্তমৈথুন করার বিধান কী?

জবাব: এ অভ্যাস হারাম হওয়ার ব্যাপারে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। এর কারণ দুটি:

প্রথম কারণ: আল্লাহ তাআলা মুমিনদের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

> যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংরক্ষণ করে নিজেদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসী ব্যতীত। কারণ, এ ক্ষেত্রে তারা নিন্দা থেকে মুক্ত। সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী।[৯১১]

ইমাম শাফিয়ী এই আয়াতের মাধ্যমে হস্তমৈথুন হারাম হওয়ার পক্ষে দলিল গ্রহণ করেছেন।

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা জৈবিক চাহিদা পূরণ করার দুটি বৈধ রাস্তা দিয়েছেন :

ক. হয় স্বাধীন নারীদের বিয়ে করা,
খ. আর না হয় দাসীদের সাথে উপভোগ করা। এরপর আল্লাহ বলেছেন,

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

> সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী।[৯১২]

অর্থাৎ যে-ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রী বা দাসীকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো পথে নিজের জৈবিক চাহিদা পূরণ করবে সে সীমালঙ্ঘনকারী, জালিম।

দ্বিতীয় কারণ: চিকিৎসাশাস্ত্রের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, যারা এ কাজ করে তাদের শেষ পরিণতি অশুভ ও ভয়ানক। এ অভ্যাস স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ; বিশেষ করে যারা নিয়মিত সকাল সন্ধ্যা এ কাজ করে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

> নিজের ক্ষতি করা যাবে না এবং অন্যের ক্ষতি করা যাবে না।[৯১৩]

---

৯১১. সূরা মুমিনূন, ২৩:৫-৭
৯১২. সূরা মুমিনূন, ২৩:৭
৯১৩. মুসনাদ আহমাদ, ২৮৬৫, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

তাই কোনো মুসলিম এমন কাজ করতে পারে না যা নিজের ও অন্যের জন্য ক্ষতিকর। এখানে আরেকটা বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। তা হলো, যারা এ কাজে অভ্যস্ত তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর এ বাণী প্রযোজ্য :

أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ

তোমরা কি ভালো জিনিসের পরিবর্তে নিম্নমানের জিনিস পেতে চাও।[৯১৪]

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ

হে যুবসমাজ! তোমাদের বিয়ে করা উচিত। কেননা, এটা দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত রাখে। আর তোমাদের যার বিয়ের সামর্থ্য নেই সে যেন রোযা রাখে। কেননা, তা তার যৌনশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে[৯১৫]।[৯১৬]

৯১৪. সূরা বাকারাহ, ২:৬১

৯১৫. সহীহুল বুখারী, ১৯০৫; সহীহ মুসলিম, ৩২৮৯

৯১৬. ফাতাওয়াল ইমারাত, ২২

অধ্যায় বাইশ

বিবিধ বিষয়

প্রশ্ন ৪৮২: কুরআন তিলাওয়াত শেষে ‘সাদাকাল্লাহুল আযীম’ বলার বিধান কী? এ বাক্য বলার পক্ষে শরীআতে কি কোনো ভিত্তি আছে? আর যে এ বাক্য বলবে তাকে কি বিদআতী বলা যাবে?

জবাব: কুরআন তিলাওয়াত শেষে এ বাক্য বলাকে অভ্যাসে পরিণত করা নিঃসন্দেহে বিদআত। সালাফদের মাঝে এর কোনো প্রচলন ছিল না।

লক্ষ রাখতে হবে, দ্বীনে যেন কোনো বিদআত চালু না হয়। কারণ, বিদআত মানে তা ঘৃণিত জিনিস। বিদআতকে কখনো ভালো ও প্রিয় জিনিস মনে হয়। এরপরও তা বিদআত বলে গণ্য হবে। এ দিকে ইশারা করে আবদুল্লাহ ইবন উমার ﵄ বলেছেন, প্রত্যেক বিদআত ভ্রষ্টতা, যদিও মানুষ তা ভালো মনে করে।

‘সাদাকাল্লাহুল আযীম বা মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন’ বাক্যটা নিঃসন্দেহে খুবই চমৎকার। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا

> বলার দিক থেকে আল্লাহ থেকে অধিক সত্যবাদী আর কে আছে?[৯১৭]

কিন্তু যখনই আমরা দশ আয়াত পড়ে ‘সাদাকাল্লাহুল আযীম’ বলা শুরু করব, তখন যেন আশঙ্কা থাকে যে, এমন একদিন আসবে যেদিন এ বাক্যকে আয়াতের একটা অংশ মনে করা হবে, যেমনটা আযান শেষে দরুদ পাঠ করার ক্ষেত্রে মনে করা হয়।

উল্লিখিত বাক্য বলার জায়েযের পক্ষে কেউ কেউ এই আয়াত পেশ করে:

قُلْ صَدَقَ اللهُ

> বলুন, আল্লাহ সত্য বলেছেন।[৯১৮]

---

৯১৭. সূরা নিসা, ৪:১২২

৯১৮. সূরা আলে-ইমরান, ৩:৯৫

এমন দলিল গ্রহণ তাদের মতো হয়েছে যারা 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকরের পক্ষে এ আয়াত দলিল হিসেবে পেশ করে,

قُلِ اللّٰهُ

বলুন, আল্লাহ[১১৯]।

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ

বলুন, আল্লাহ সত্য বলেছেন।[১২০]

আয়াতটির ক্ষেত্র এবং প্রেক্ষাপট ভিন্ন।[১২১]

প্রশ্ন ৪৮৩: কোনো কোনো আলেম পশ্চিমাদের চাঁদে যাওয়া অস্বীকার করে। আবার কিছু আলেম পৃথিবী গোল হওয়া এবং ঘূর্ণনকে অস্বীকার করে। এ ব্যাপারে আপনার মত কী?

জবাব: চাঁদে যাওয়া এখন একদম বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এ নিয়ে তর্ক করার কিছুই নেই। আর পৃথিবী গোল হওয়া এবং ঘূর্ণন প্রক্রিয়া এই আয়াতের পরিপন্থি নয় :

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করছে।[১২২]

পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য সবকিছু নিজস্ব কক্ষপথে চলছে।

এই মাসআলা নিয়ে পূর্বের আলেমগণ কোনো আলোচনা করেননি। কারণ, এটা জাগতিক বিষয়, শরয়ী বিষয়ের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। প্রত্যেকে তাই বিশ্বাস করবে যা তার কাছে প্রাধান্যযোগ্য মনে হবে। আমরা সন্দেহ করি না, যেমনটা ইবনুল কাইয়্যিমের মতো কিছু পূর্ববর্তী আলেম থেকে প্রমাণিত আছে যে, পৃথিবী গোল।[১২৩]

---

১১৯. সূরা নিসা, ৪:১৭৬
১২০. সূরা আলে-ইমরান, ৩:৯৫
১২১. ফাতাওয়াল মাদীনাহ, ৭০
১২২. সূরা আম্বিয়া, ২১:৩৩
১২৩. ফাতাওয়াল ইমারাত, ৯৯

প্রশ্ন ৪৮৪: এক লোক তার বৃদ্ধ পিতামাতাকে নিয়ে বেশ কঠিন পরীক্ষায় পড়েছে। তার পিতামাতা গান শোনা, নারীদের নৃত্য দেখা, সাহাবীদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করাসহ অন্যান্য পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে না। তাদেরকে নসীহত করলেও শোনে না। এখন তার পিতামাতা শরীআত পরিপন্থি কোনো কাজ করার সময় তাদের ওপর রাগলে কি গুনাহ হবে?

জবাব: সন্তানের জন্য বৈধ নয় সে তার পিতামাতার ওপর রাগবে। তার দায়িত্ব হচ্ছে, উভয়কে বোঝানো। বোঝানো তার ওপর ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

তোমাদের প্রতিপালক ফয়সালা করেছেন যে, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সদাচরণ করবে।[৯২৪]

প্রশ্ন ৪৮৫: আলেমদের হাতে চুমু দেওয়া যাবে কি?

জবাব: নিম্নের শর্তসাপেক্ষে আমি আলেমদের হাতে চুমু দেওয়ার বৈধতার পক্ষে:

ক. এটাকে এমন অভ্যাসে পরিণত করবে না যে, আলেম তার ছাত্রদের জন্য হাত বাড়িয়ে রাখবে, আর ছাত্ররাও তার থেকে বরকত লাভের আশায় চুমু দেওয়ার জন্য লোভাতুর হয়ে থাকবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে চুমু দেওয়া হলেও তার পরিমাণ একেবারেই স্বল্প। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে চুমু দেওয়ার ঘটনা একেবারেই স্বল্প হলে তা স্থায়ী আমলে পরিণত করা যাবে না; যেমনটা ফিকহী মূলনীতির জ্ঞাত বিষয়।

খ. এ কারণে সেই আলেম যেন নিজের ব্যাপারে অহংকার না করে, নিজেকে অন্যের তুলনায় বড়ো মনে না করে এবং অন্যের তুলনায় নিজেকে শ্রেষ্ঠ না ভাবে, যেমনটা বর্তমানে কিছু কিছু শাইখের ক্ষেত্রে ঘটছে।

গ. এ কারণে যেন পরিচিত সুন্নাত বিলুপ্ত না হয়, যেমন-মুসাফাহা করা। মুসাফাহা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্ম ও বাণী দ্বারা শরীআতসিদ্ধ প্রমাণিত। এর মাধ্যমে উভয়ের গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয়, যেমনটি একাধিক হাদীসে এসেছে।[৯২৫] অতএব, মুসাফাহা এমন আমলের কারণে নষ্ট করা যাবে না যে আমলকে সর্বোচ্চ আমরা জায়েয বলতে পারি।[৯২৬]

---

৯২৪. ফাতাওয়াল মাদীনাহ, ১২৫

৯২৫. সুনানুত তিরমিযী, ২৭২৭; সুনানু ইবন মাজাহ, ৩৭০৩

৯২৬. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ১৬০ নং হাদীসের অধীনে

প্রশ্ন ৪৮৬: কাফির দেশে বসবাস করার বিধান কী?

জবাব: আমাদের এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, বর্তমানে কোনো কাফির দেশে মুসলিমের বসবাস করা জায়েয নয়। কাউকে যদি কোনো মুসলিম দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়, তাহলে সে অন্য কোনো মুসলিম দেশে চলে যাবে।[১২৭]

প্রশ্ন ৪৮৭: কতদুর পর্যন্ত প্রতিবেশী? প্রতিবেশিত্বের সীমা কতটুকু?

জবাব: প্রতিবেশিত্বের সীমা নিয়ে আলেমদের মাঝে একাধিক মত রয়েছে; ইবন হাজার আসকালানী সেসব মত 'ফাতহুল বারী'-তে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত সীমা সংক্রান্ত যতগুলো হাদীস এসেছে, সবগুলোই দুর্বল, সহীহ নয়। তাই সমাজে প্রতিবেশী বলতে যতদুর বোঝানো হয়, ততদূর পর্যন্তই প্রতিবেশী বলে গণ্য হবে। আল্লাহু আলাম।[১২৮]

প্রশ্ন ৪৮৮: হিজরতের ঘটনায় বলা হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বাকর رضي الله عنه যে গুহায় আত্মগোপন করেন সেই গুহার মুখে কবুতর বাসা করে ডিম পাড়ে এবং মাকড়সা জাল বুনে। এ ঘটনা কি সত্য?

জবাব: মাকড়সা ও কবুতরের ঘটনার ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি; যদিও বিভিন্ন কিতাবে এবং মদীনায় হিজরত উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে এই ঘটনা প্রচুর পরিমাণ উল্লেখ করা হয়। অতএব, বিষয়টির সত্যতা জেনে রাখুন।[১২৯]

প্রশ্ন ৪৮৯: শয়তান কি সদলবলে জীবনসন্ধিক্ষণে উপস্থিত ব্যক্তির কাছে আসে?

জবাব: গাযালী তার 'আদ-দুররাতুল ফাখিরাহ ফী কাশফি উলূমিল আখিরাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মৃত্যু-সময়ের ফিতনা হচ্ছে, শয়তান সদলবলে জীবনসন্ধিক্ষণে উপস্থিত ব্যক্তির পিতামাতার আকৃতিতে ইহুদীর বেশ ধরে তার সামনে উপস্থিত হয়। উভয়ে এসে তাকে বলে, তুমি ইহুদী হয়ে মারা যাও। এরপর সে চলে যায়। অতঃপর আরেকদল আসে খ্রিস্টানের বেশ ধরে। এভাবে তার সামনে প্রতিটি ধর্মের বিশ্বাস তুলে ধরা হয়। আল্লাহ যার হিদায়াত চান, তার জন্য জিবরীলকে পাঠান। জিবরীল এসে শয়তান ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের তাড়িয়ে দেন। আর এটা দেখে ওই ব্যক্তি মুচকি হাসে। তবে আমি এ ব্যাপারে কোনো হাদীস পাইনি।[১৩০]

---

১২৭. সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, ক্যাসেট নং, ৬১৭

১২৮. সিলসিলাতুয যঈফাহ, ২১৯ নং হাদীসের অধীনে

১২৯. সিলসিলাতুয যঈফাহ, ১১৮৯ নং হাদীসের অধীনে

১৩০. সিলসিলাতুয যঈফাহ, ১৪৪৮ নং হাদীসের অধীনে।

প্রশ্ন ৪৯০ : কায়া বা আকৃতিবিহীন ও ছায়াবিহীন ছবিও কি হারাম?

জবাব: হাদীসে ছবির প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, কায়া বা আকৃতিবিহীন ও ছায়াবিহীন ছবিও তার অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, হাদীসে ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে,

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ

ফেরেশতা সেই ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে প্রতিকৃতি থাকে।[৯৩১]

প্রতিকৃতি অর্থ ছবি। এ মত এভাবে আরও শক্তিশালী হয় যে, আয়েশাহ ﵂'র চাদরে যে ছবি ছিল, তার কোনো ছায়া ছিল না। অতএব, কাপড়ে সেলাইকৃত ছবি, কাগজে অঙ্কিত ছবি এবং ফটোগ্রাফি যন্ত্রের মাধ্যমে ওঠানো ছবি-এসব ছবির মাঝে কোনো ফারাক নেই। সবগুলোই ছবি ও ছবিনির্মাণ। হাতের মাধ্যমে ছবি অঙ্কন আর ফটোগ্রাফি যন্ত্রের মাধ্যমে ছবি ওঠানো-এই দুয়ের মাঝে পার্থক্য তৈরি করে প্রথমটাকে হারাম বলা আর দ্বিতীয়টাকে জায়েয বলা আধুনিক যুগের বাহ্য ব্যাপার ও গোঁড়ামি; যা প্রশংসনীয় নয়, যেমনটি আমি 'আদাবুয যিফাফ' বইয়ে বিশ্লেষণ করেছি।

যে ছবিকে পায়ে মাড়ানো হয় সেই ছবিও হারামের অন্তর্ভুক্ত হবে, যদি সেই ছবি কেটে দিয়ে পরিবর্তন না করে স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়। এ মতের পক্ষে হাফিয ইবন হাজার আসকালানী 'ফাতহুল বারী'-তে মত দিয়েছেন।[৯৩২]

প্রশ্ন ৪৯১: অন্ধ ব্যক্তি কি মাদরাসায় মেয়েদের পাঠদান করতে পারবে?

জবাব: সে যদি মাসুম বা নিষ্পাপ হয় তাহলে পারবে। সে কি নিষ্পাপ?

প্রশ্নকারী: না, নিষ্পাপ নয়।

জবাব: তাহলে জায়েয হবে না। সে যদি নিষ্কলুষ, বিবাহিত, বয়োবৃদ্ধ, অতিশয় বৃদ্ধ হয়, তারপরও মেয়েদের ফিতনা থেকে আশঙ্কামুক্ত নয়। সে এমনটা হলে কিছুটা নম্রতা প্রদর্শন করা যায়। তথাপি আমরা বলব, তার ক্ষেত্রেও ভয়াবহ ঝুঁকি রয়েছে। কেননা যে-ব্যক্তি প্রতিরক্ষা সীমানার আশেপাশে ঘুরে, সম্ভাবনা আছে সে উক্ত সীমানার ভেতরে ঢুকে পড়বে।[৯৩৩]

---

৯৩১. সহীহুল বুখারী, ৩২২৪; সুনানুত তিরমিযী, ২৮০৫

৯৩২. সিলসিলাতুস সহীহাহ, ৩৫৬ নং হাদীসের অধীনে

৯৩৩. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৫/২৬৩

প্রশ্ন ৪৯২: গালে যে লোম হয়, সেগুলো কি দাড়ি বলে গণ্য হবে?

জবাব: হ্যাঁ। গালে যে লোম বের হয় আভিধানিক অর্থে তাকে দাড়ি বলা হয়। গালে যে লোম বের হয় সেগুলোকে খারাপ উদ্দেশ্যে স্পর্শ করা যাবে না। সেগুলোকে মুণ্ডন বা শেইভ করা যাবে না এবং সরলরেখার মতোও করা যাবে না। এটা অনর্থক ও খেলতামাশার অন্তর্ভুক্ত। ফাইরোযাবাদীর 'আল-কামূসুল মুহীত' অভিধানে রয়েছে, দুই গালে যে লোম বের হয় তা দাড়ির অন্তর্ভুক্ত। অতএব, গালের দাড়ি কাটা যাবে না।[১৩৪]

প্রশ্ন ৪৯৩: কেউ কি নিজের পক্ষ থেকে আকীকা দিতে পারবে? আর আকীকার প্রাণীর জন্য কি সেসব শর্ত প্রযোজ্য, যেসব শর্ত কুরবানীর প্রাণীর জন্য করা হয়?

জবাব: যদি তার পিতা আকীকা না দেয়, তবে সে নিজের মাল থেকে আকীকা দিতে পারে। আর আকীকার প্রাণীর জন্য সেসব শর্ত প্রযোজ্য নয়, যেসব শর্ত কুরবানীর প্রাণীর জন্য করা হয়।[১৩৫]

প্রশ্ন ৪৯৪: যে হাদীসে বলা হয়েছে, নবী ﷺ নিজের পক্ষ থেকে আকীকা করেছিলেন, সেই হাদীস কি সহীহ? আর আকীকার মাংস কীভাবে বণ্টন করতে হবে?

জবাব: আমার কাছে ঐ হাদীসটি প্রমাণিত। কারণ, তার দুটি সনদ রয়েছে। তন্মধ্যে এক সনদ বুখারীর শর্তে; যদিও তার সনদে একজন সমালোচিত বর্ণনাকারী রয়েছে। তবে প্রথমত মূলনীতি হচ্ছে, যার হাদীস বুখারী বর্ণনা করেছেন, সে সাঁকো পার হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, তার ব্যাপারে যে জারহ বা সমালোচনা রয়েছে, সেই জারহ মুফাসসার বা সমালোচনার কারণ-উল্লিখিত নয়। আর আকীকার মাংস বণ্টনকারীর জন্য তিনটি পদ্ধতির ইখতিয়ার আছে:

ক. পূর্বনির্ধারিত কোনো কিছু ছাড়াই সে ও তার পরিবার মিলে সব মাংস খেয়ে নিতে পারে।
খ. ইচ্ছে করলে সব মাংস ফকীর-মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করে দিতে পারে।
গ. আবার চাইলে অর্ধেক বিতরণ করবে আর অর্ধেক খাবে।[১৩৬]

প্রশ্ন ৪৯৫: ইসলামে দত্তক নেওয়ার বিধান কী? কোনো শিশুকে কি দত্তক হিসেবে নেওয়া যাবে?

---

১৩৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৭/৭
১৩৫. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৭/৫৪১-৫৪২, পরিমার্জিত।
১৩৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৭/৫৪৩, পরিমার্জিত

জবাব: ইসলামে দত্তক নেওয়া হারাম। তবে অনেক হাদীসে এতিমদের দায়িত্ব নেওয়ার কথা এসেছে। তাই একজন মুসলিম ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ করা থেকে বের হয়ে এসে এতিমদের লালনপালনের দায়দায়িত্ব নেবে। একাধিক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ، فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا . وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.

আমি আর এতিমের দায়িত্বপালনকারী জান্নাতে এভাবে (একত্রে) থাকব। এ কথা বলার সময় তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলদ্বয় মিলিয়ে ইঙ্গিত করে দেখান।[৯৩৭] তাই এতিমদের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করার বিষয়টি সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে।[৯৩৮]

প্রশ্ন ৪৯৬: ধরুন, যাইদের এক ছেলে এবং কয়েকটি মেয়ে আছে। যাইদ তার পিতা আমরের পূর্বেই মারা যায়। এরপর আমর মারা যায়। এখন যাইদের ছেলেরা কি তাদের দাদা আমরের সম্পদের ওয়ারিস হবে?

জবাব: এ মাসআলা নিয়ে আধুনিক যুগের আলেমগণ গবেষণা করেছেন। আমি ফারাইয বা উত্তরাধিকার বণ্টন আইন যতটুকু জানি তাতে আমি যাইদের সন্তানদের কোনো উত্তরাধিকার পাই না।[৯৩৯]

প্রশ্ন ৪৯৭: মারা যাওয়ার আগে পিতা যদি কিছু সন্তানকে বাদ দিয়ে কিছু সন্তানকে সম্পদ লিখে দিয়ে যায় বা বেশি দিয়ে যায়, তাহলে এক্ষেত্রে করণীয় কী?

জবাব: এক জায়গায় সবাই বসে যে যতটুকু হক পাবে, সেভাবে বণ্টন করে নেবে। এক্ষেত্রে পিতা কমবেশি করে ভাগ করে দিয়ে গেলেও সেই ভাগাভাগি কার্যকর হবে না।[৯৪০]

প্রশ্ন ৪৯৮: একব্যক্তি মারা যাওয়ার সময় নিজের বাসা অন্যান্য সন্তানদের বাদ দিয়ে শুধু এক সন্তানের জন্য বরাদ্দ করে যায়। এমনটা করার পেছনে পিতার যুক্তি হচ্ছে, উক্ত বাসা তৈরি করা হয় সেই ছেলের খরচে। তাই তার নামে বরাদ্দ করে যাচ্ছি। এ ব্যাপারে আপনার মত কী?

---

৯৩৭. সহীহুল বুখারী, ৬০০৫

৯৩৮. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৬/৫৯৯

৯৩৯. ফাতাওয়াল ইমারাত, ১১৫ ইসলামী উত্তরাধিকার আইন হচ্ছে, যদি পিতা মারা যাবার পূর্বে সন্তান মারা যায় এবং মৃত-সন্তানের কোনো সন্তান থাকে, তাহলে মৃত-সন্তানের সন্তান তথা নাতি দাদার উত্তরাধিকার হয় না। তবে দাদার উচিত নাতির জন্য অসিয়াত করে যাওয়া।—সংকলক

৯৪০. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৬/৯৫, পরিমার্জিত

জবাব: পিতার এমন যুক্তি বাতিল, গ্রহণযোগ্য নয়। এক ছেলে খরচ করেছে আরেক ছেলে খরচ করেনি-এমন অজুহাতে এক ছেলের নামে লিখে দিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। উভয় সন্তানের মাঝে এক সন্তান খরচ করলে আর অন্য সন্তান খরচ না করলেও বাসা উভয়ের। কারণ নবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ

তোমাদের নিজেদের উপার্জনই সর্বোত্তম জীবিকা। তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের নিজস্ব উপার্জন।[৯৪১]

অন্য এক প্রসিদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ

তুমি ও তোমার সম্পদ উভয়ই তোমার পিতার।[৯৪২]

তাই সন্তান পিতার সহযোগিতার জন্য যা কিছু খরচ করেছে, তা পিতারই সম্পদ ছিল। অতএব, পিতা যেসব সম্পদ রেখে মারা যাবে, সকল ওয়ারিস সেই সম্পদের অধিকারী হবে।[৯৪৩]

প্রশ্ন ৪৯৯: পুরুষেরা কি নারীদের কণ্ঠে বৈধ গান শুনতে পারবে?

জবাব: নারীরা কবিতা আবৃত্তি করলেও বিশেষ করে তাদের কবিতা আবৃত্তিতে এক বিশেষ সুরেলা আওয়াজ থাকে। পুরুষেরা সেই সুরেলা আওয়াজ শুনলে ফিতনায় পড়বে। তাই নারীদের কণ্ঠে তা শোনা যাবে না।[৯৪৪]

প্রশ্ন ৫০০: ফাঁসি দিয়ে হত্যা করার বিধান কী?

জবাব: ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা কখনো ইসলামসম্মত নয়। এই পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিম্নের বাণী পরিপন্থি:

لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ

---

৯৪১. সুনানুত তিরমিযী, ১৩৫৮, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
৯৪২. সুনানু আবী দাউদ, ৩৫৩০, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
৯৪৩. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৬/১১০
৯৪৪. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৫/২২৮

তরবারির আঘাতেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে।[৯৪৫]

অর্থাৎ তরবারির মাধ্যমেই বদলা নিতে হবে। তবে হ্যাঁ, কোনো খারাপ হন্তক যদি নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতিতে কাউকে হত্যা করে, তাহলে তার মতো করে তাকে হত্যা করে বদলা নেওয়া যাবে। কেউ কাউকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করলে তাকেও শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হবে। কেউ কাউকে পাথরের আঘাতে মাথা ফাটিয়ে হত্যা করলে তাকেও সেভাবে হত্যা করা হবে; যেমনটা ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামানায়। একবার এক ইহুদী এক দাসীকে পাথর দিয়ে মাথা ফাটিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। সেসময় দাসীকে কিছু লোক সামান্য নিঃশ্বাস বাকি থাকতে দেখতে পায়। তারা তাকে জিজ্ঞেস করে, কে এমন কাজ করেছে? তখন দাসী বলে, অমুক ইহুদী।[৯৪৬]

ফাতাওয়া সমগ্র এখানেই সমাপ্ত

৯৪৫. সুনানু ইবন মাজাহ, ২৬৬৮, আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

৯৪৬. তুরাসুল আলবানী ফিল ফিকহ, ১৬/২৪-২৫

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ'র

সংক্ষিপ্ত জীবনী

❑ পরিচয় :

তার নাম: মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন। পিতার নাম: আলহাজ্ব নুহ। দাদার নাম: নাজাতী। ডাক নাম: আবু আবদুর রহমান। ইউরোপের মুসলিম অধ্যুষিত দেশ আলবেনিয়ায় জন্মগ্রহণ করায় তাকে 'আলবানী' বলা হয়।

❑ জন্ম ও পরিবার :

তিনি ১৩৩৩ হিজরী মোতাবেক ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে আলবেনিয়ার রাজধানী স্কোডার (Shkodar-বর্তমান নাম তিরানা)-এ জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন আলবেনিয়ার একজন বিজ্ঞ আলেম। ইসলামী জ্ঞানার্জনের জন্য মানুষেরা তার কাছে ছুটে যেত।

আলবেনিয়ায় প্রেসিডেন্ট আহমাদ জাগু পাশ্চাত্য সেক্যুলার ব্যবস্থা গ্রহণ করে নারীদের পর্দা নিষিদ্ধ করলে তিনি সপরিবারে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে হিজরত করেন।

❑ শিক্ষাজীবন :

দামেস্ক আসার পর আলবানীর বয়স নয় বছরের কাছাকাছি হলে তার পিতা তাকে সেখানকার 'স্কুল অব এইড চ্যারিটি' নামক একটি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। সেখানেই তিনি কৃতিত্বের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

প্রচলিত অ্যাকাডেমিক শিক্ষাব্যবস্থায় দ্বীন সম্পর্কে ভালো জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা ছিল না। বিধায় তার পিতা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজ ছেলের পড়াশোনার ক্ষেত্রে ভিন্ন দৃষ্টিপোষণ করতেন। ফলে তিনি নিজে সন্তানের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা সিলেবাস তৈরি করে তার মাধ্যমে তাকে আল-কুরআনুল কারীম, তাজবীদ, নাহু, সরফ, হানাফী ফিকহ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দিতে শুরু করেন। ফিকহের মধ্যে হানাফী ফিকহের অন্যতম কিতাব মুখতাসরুল কুদুরী পড়ান। তিনি তার পিতার কাছেই হাফস ইবন আসিম-এর বর্ণনা অনুযায়ী কুরআনুল কারীম হিফয করেন।

এরপর তার পিতার বন্ধু বিশিষ্ট আলেম শাইখ সাঈদ আল-বুরহানীর নিকট হানাফী ফিকহের কিতাব মারাকিল ফালাহ, নাহুর কিতাব শুযুরুয যাহাব এবং আধুনিক যুগের লিখা আরবী

সাহিত্য ও ইলমুল বালাগাহর কিছু কিতাব পড়েন। এর পাশাপাশি তিনি তখনকার দামেস্কের প্রসিদ্ধ আলেম আল্লামা মুহাম্মাদ বাহজাহ আল-বাইতারের বিভিন্ন দারসে অংশগ্রহণ করতেন।

❑ কর্মজীবন:

তিনি তার পিতার কাছেই ঘড়ি মেরামতের কাজ শিখেন এবং এ ক্ষেত্রে সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ঘড়ি মেরামতকেই জীবিকার পেশা হিসেবে বেছে নেন। এই পেশায় তিনি ব্যক্তিগত পড়ালেখা ও বিভিন্ন কিতাবাদি অধ্যয়নের পর্যাপ্ত সময় পেতেন। এভাবে সিরিয়ায় হিজরতের মাধ্যমে তার জন্য আরবী ভাষা ও মূল উৎস থেকে শরীআতের জ্ঞানার্জনের পথ সুগম হয়।

❑ হাদীস অধ্যয়নের প্রতি মনোনিবেশ:

তার পিতার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, তার ছেলে তার মতো হানাফী মাযহাবের একজন একনিষ্ঠ মুকাল্লিদ হোক। এ কারণে তিনি তাকে হাদীস চর্চায় মনোনিবেশ করা থেকে সতর্ক করতেন। তথাপি ইমাম আলবানী হাদীসশাস্ত্র ও হাদীস চর্চার দিকে ঝুঁকে পড়েন। এদিকে ঝুঁকে পড়ার পেছনে প্রেরণা যোগায় শাইখ মুহাম্মাদ রশীদ রেজা কর্তৃক প্রকাশিত 'আল-মানার' নামক একটি মাসিক ম্যাগাজিন। সেখানে হাদীস বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সন্দর্ভ প্রকাশিত হতো। তিনি সন্দর্ভগুলো নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করতে থাকেন। এভাবে ধীরে-ধীরে হাদীস চর্চার প্রতি তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠে এবং ব্যাপক আগ্রহসহকারে হাদীস চর্চা শুরু করেন। ফলে মাত্র বিশ বছর বয়সে তিনি হাদীসশাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

একপর্যায়ে তিনি হাদীসের সেবায় কলম ধরেন। এর ধারাবাহিকতায় সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন তা হলো, তিনি হাফিয ইরাকী رحمه الله-এর লিখা 'আল-মুগনী আন হামলিল আসফার ফী তাখরীজি মা ফিল ইয়াহইয়া মিনাল আখবার' নামক গ্রন্থ কপি করে তাতে টীকা সংযোজন করেন।

শাইখের এই কাজটি তার সামনে হাদীস নিয়ে গবেষণার বিশাল দরজা খুলে দেয়। এরপর থেকে হাদীসশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা তার প্রধান পেশা ও নেশায় পরিণত নয়। ক্রমেই তিনি দামেস্কে জ্ঞানের জগতে এ শাস্ত্রে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। তার এমন পরিচিতির কথা শুনে দামেস্কের যাহিরিয়া লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ তার জন্য বিশেষ একটি কক্ষ নির্ধারণ করে দেয়; যেন তিনি সেখানে অবস্থান করে গবেষণাকর্ম চালাতে পারেন। সেই সঙ্গে লাইব্রেরির একটি চাবিও তাকে দেওয়া হয়; যেন তিনি যখন খুশি তাতে প্রবেশ করতে পারেন।

তবে বই-পুস্তক লেখা শুরু করেন তার জীবনের দ্বিতীয় স্তরে। এই পর্যায়ে এসে তিনি সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন 'তাহযীরুস সাজিদ মিন ইত্তিখাযিল কুবুরি মাসাজিদ'। এটি একটি দলীলনির্ভর তুলনামূলক আলোচনাভিত্তিক ফিকহের কিতাব। গ্রন্থটি একাধিক বার মুদ্রিত হয়েছে।

হাদীসশাস্ত্রের রীতি অনুসারে হাদীসের তাখরীজ সংক্রান্ত তার প্রথম পর্যায়ের অন্যতম একটি গ্রন্থ হলো 'আর-রওযুল নাযীর ফী তারতীবি ওয়া তাখরীজি মুজামিত তাবারানী আস-সাগীর।' গ্রন্থটি এখনও পাণ্ডুলিপি আকারেই রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস গবেষণা এবং তাতে অহর্নিশ ডুবে থাকার কারণে আল্লামা আলবানীর মধ্যে সালাফী চিন্তাচেতনার বিকাশ ঘটে। সেই সাথে সালাফী ধারার বিশ্ববরেণ্য আলেম শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং তার ছাত্র ইমাম ইবনুল কাইয়িম رحمهما الله রচিত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করার ফলে এই নীতির ওপর তার দৃঢ়তা আরও মজবুত হয়।

আল্লামা আলবানী সিরিয়ায় তাওহীদ ও সুন্নাহর দাওয়াতের পতাকা তুলে ধরেন। ফলে সিরিয়ার অনেক আলেম তার সাক্ষাতে আসেন। শাইখের সাথে সেসব আলেমের তাওহীদের বিভিন্ন মাসআলা-মাসাইল, কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ, মাযহাবী গোঁড়ামি, বিদআত-সহ অনেক বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হয়।

মাযহাবের অন্ধভক্ত গোঁড়া আলেম-ওলামা, সূফী, বিদআতী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন একশ্রেণির নামধারী আলেমদের পক্ষ থেকে তিনি প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এ সকল ব্যক্তি সাধারণ অজ্ঞ-মূর্খ লোকদেরকে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। তাকে 'পথভ্রষ্ট ওহাবী' বলে অপপ্রচার চালাতে থাকে এবং জনসাধারণকে তার থেকে সতর্ক করতে থাকে।

অপরপক্ষে তার দাওয়াতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন দামেস্কের ইলম ও পরহেযগারিতায় প্রসিদ্ধ স্বনামধন্য আলেম-ওলামা। তারা ইমামকে তার দাওয়াতের পথে দৃঢ়কদমে এগিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেন। তাদের অন্যতম হলেন, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন আল্লামা বাহজাহ আল-বাইতার, সিরিয়া মুসলিম যুবসংঘের প্রধান শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আল-ইমাম, শাইখ তাওফীক আল-বাযারাহ প্রমুখ।

❑ ইমাম আলবানীর দাওয়াতী কার্যক্রম:

ইমাম আলবানী প্রতি সপ্তাহে দুদিন আকীদা, ফিকহ, উসুল ও ইলমুল হাদীস-সহ বিভিন্ন বিষয়ে দারস প্রদান করতেন। তার দারসে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও

উপস্থিত হতেন। তিনি যে-সকল বইয়ের ওপর দারস প্রদান করতেন, তা হলো:

১. ফাতহুল মাজীদ। লেখক: আবদুর রহমান ইবন হাসান ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহাব।

২. আর-রওযাতুন নাদিয়াহ শারহুদ দুরারুল বাহিয়্যাহ। লেখক: ইমাম শাওকানী। এ ছাড়া তিনি ইমাম সিদ্দীক হাসান খান رحمه الله রচিত এ বইয়ের ব্যাখ্যারও দারস দিতেন।

৩. উসূলুল ফিকহ। লেখক: শাইখ আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ।

৪. আল-বায়িসুল হাসীস শারহু ইখতিসারি উলূমিল হাদীস লিল-ইমাম ইবন কাসীর। লেখক: আল্লামা আহমাদ শাকির।

৫. মিনহাজুল ইসলাম ফিল হুকম। লেখক: মুহাম্মাদ আসাদ।

৬. ফিকহুস সুন্নাহ। লেখক: শাইখ সাইয়েদ সাবিক।

এ ছাড়া তিনি প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে দাওয়াতী সফরে বের হতেন। প্রথমপর্যায়ে তিনি মাসে এক সপ্তাহ দাওয়াতী কাজ করতেন। পরবর্তীতে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি সিরিয়ার বিভিন্ন জেলায় দাওয়াত নিয়ে যেতেন। পাশাপাশি জর্ডানের বিভিন্ন এলাকায়ও সফর করতেন। পরবর্তীতে তিনি জর্ডানের রাজধানী আম্মানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এ কারণে তার কিছু দুশমন সিরীয় সরকারের কাছে তার ব্যাপারে চোগলখোরি করলে সরকার তাকে কারাগারে প্রেরণ করে।

❑ কষ্টে ধৈর্যধারণ ও হিজরত:

১৯৬০ সালের প্রথম দিকে ইমাম আলবানী সিরীয়-ক্ষমতাসীনদের নজরদারীতে পড়েন, যদিও তিনি রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন। তিনি দুইবার গ্রেফতার হন। প্রথমবার ১৯৬৮ সালের আগে একমাস দামেস্কের কেল্লা কারাগারে বন্দি ছিলেন। এটা সেই কারাগার যেখানে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া رحمه الله-কে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। ১৯৬৮ সালের যুদ্ধের সময় সিরীয়সরকার সকল রাজবন্দিকে মুক্ত করে দিলে তিনিও মুক্ত হন।

যুদ্ধ আরও কঠিন রূপ ধারণ করলে ইমামকে পুনরায় কারাবরণ করতে হয়। কিন্তু এবার কেল্লা কারাগারে নয় বরং দামেস্কের পূর্ব-উত্তরাঞ্চলের আল-হাসাকা কারাগারে। ইমাম এখানে আট মাস অতিবাহিত করেন। কারাগারে অবস্থানের এই আট মাস সময়ে তিনি হাফিয মুনযিরীর লেখা 'মুখতাসার সহীহ মুসলিম' তাহকীক করেন এবং সেখানে অন্যান্য বড় বড় রাজবন্দিদের সঙ্গে মিলিত হন।

পরবর্তীতে তিনি সিরিয়া ছেড়ে জর্ডানে পাড়ি জমান এবং রাজধানী আম্মানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন।

❑ **কার্যক্রম ও অবদান:**

ইমামের অনেক জ্ঞানমূলক অবদান ও খেদমত রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. ইমাম দামেস্ক অ্যাকাডেমির কিছু শিক্ষকের সঙ্গে আল্লামা বাহজাহ আল-বাইতারের বিভিন্ন দারসে অংশগ্রহণ করতেন। সেসকল শিক্ষকদের একজন হলেন ইযযুদ্দীন আত-তানূখী رحمه الله।

২. দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীআহ ফ্যাকাল্টির পক্ষ থেকে তাকে ইসলামী ফিকহকোর্স-এর বুয়ূ বা ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত হাদীসগুলোর তাখরীজ করার জন্য মনোনীত করা হয়; যা ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

৩. মিসর ও সিরিয়া একীভূত হওয়ার যুগে হাদীসের কিতাবসমূহ তাহকীক ও প্রচার-প্রসারের নিমিত্তে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। ইমামকে এই প্রকল্প তত্ত্বাবধান কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

৪. ভারতের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামিয়া সালাফিয়া বেনারসে হাদীসের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার জন্য তার নিকট প্রস্তাব পাঠানো হয়। কিন্তু তৎকালে ভারত-পাকিস্তানের মাঝে যুদ্ধ চলার কারণে স্ত্রী-পরিবার নিয়ে যাওয়া কঠিন হওয়ায় তিনি সেখানে যেতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

৫. সৌদি আরবের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শাইখ হাসান আলুশ শাইখ আবদুল্লাহ ১৩৮৮ হিজরীতে মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের হায়ার ডিপ্লোমা ইন ইসলামী স্টাডিজ বিভাগের ডিন হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তার নিকট আবেদন করেন। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে তা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

৬. ১৩৯৫ হিজরী থেকে ১৩৯৮ হিজরী পর্যন্ত মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট সদস্য হিসেবে তাকে মনোনীত করা হয়।

৭. স্পেনের মুসলিম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন-এর আহবানে তিনি সেখানে গিয়ে অত্যন্ত সারগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন; যা পরবর্তীতে 'আকীদা ও আহকাম উভয় ক্ষেত্রেই হাদীস স্বয়ংসম্পন্ন প্রমাণ' এই শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

৮. কাতার সফরে গিয়ে সেখানে বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যের বিষয় ছিল, 'ইসলামে সুন্নাহর মর্যাদা'।

৯. সৌদি আরবের মহামান্য গ্র্যান্ড মুফতী ইমাম বিন বায রحمه الله-এর পক্ষ থেকে তিনি মিসর ও মরক্কোর ফাতাওয়া ও গবেষণা বোর্ডের প্রধান হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। অনুরূপভাবে ব্রিটেনের তাওহীদ ও কুরআন-সন্নাহর দিকে আহবানের জন্য গঠিত একটি ইসলামী সংগঠনের প্রধান হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

১০. তাকে দেশে-বিদেশে অনেক সম্মেলনে অতিথি হিসেবে আহ্বান করা হয়। কিন্তু তিনি তার জ্ঞান-গবেষণার কাজে ব্যস্ততার দরুন অনেক দাওয়াতে সাড়া দিতে পারেননি।

১১. তিনি কুয়েত ও আরব আমিরাতে সভা-সেমিনারে অনেক বক্তব্য প্রদান করেন। অনুরূপভাবে ইউরোপের কয়েকটি দেশে গমন করে সেখানকার মুসলিম অভিবাসী ও শিক্ষার্থীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং অনেক মূল্যবান দারস পেশ করেন। এছাড়াও তিনি ব্রিটেন ও জার্মানিতে দাওয়াতী উদ্দেশ্যে সফর করেন।

১২. ইমাম থেকে জ্ঞানার্জন করে অগণিত ছাত্র বের হয়েছে; যারা পরবর্তীতে বড় বড় গবেষক হিসেবে ইসলামে সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

❑ তার লিখিত কিতাবাদি ও গবেষণা:

ইমামের অনেক মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বই-পুস্তক ও গবেষণাকর্ম রয়েছে। সেগুলোর সংখ্যা শতাধিক। তন্মধ্যে অনেকগুলোই বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কোনোটি একাধিকবার মুদ্রিত হয়েছে। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বইয়ের তালিকা প্রদান করা হলো

১. ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীসি মানারিস সাবীল। নয় খণ্ডে সমাপ্ত।

২. সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ। সাত খণ্ডে সমাপ্ত।

৩. সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফাহ ওয়া মাওযূআহ। চৌদ্দ খণ্ডে সমাপ্ত।

৪. সহীহ ওয়া যঈফ সুনানু আবী দাউদ। দশ খণ্ডে সমাপ্ত

৫. সহীহ ও যঈফ সুনানুন নাসাঈ। সাত খণ্ডে সমাপ্ত।

৬. সহীহ ওয়া যঈফ সুনানুত তিরমিযী। সাত খণ্ডে সমাপ্ত।

৭. সহীহ ওয়া যঈফ সুনানু ইবন মাজাহ। ছয় খণ্ডে সমাপ্ত।

৮. সহীহ ওয়া যঈফুত তারগীব ওয়াত তারহীব। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত।

৯. তাববীবু ওয়া তারতীবু আহাদীসিল জামি আস-সাগীর।

১০. সহীহ ওয়া যঈফুল জামি আস-সাগীর ওয়া যিয়াদাতিহ।

❑ আন্তর্জাতিক বাদশা ফায়সাল পুরস্কার:

ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা ও ইসলামী শিক্ষার প্রচারে অবদানের জন্য তাকে ১৪১৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৯ ঈসাব্দে আন্তর্জাতিক বাদশা ফায়সাল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। তার পুরস্কারের শিরোনাম ছিল: 'প্রায় একশ'র অধিক পুস্তক রচনার মধ্য দিয়ে হাদীসের তাহকীক, তাখরীজ ও গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাদীসের সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য সিরিয়-নাগরিক সম্মানিত শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানীকে এ পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হলো'।

❑ তার ব্যাপারে আলেমগণের ভূয়সী প্রশংসা:

১. ইমাম বিন বায ﵀ বলেন: 'আমি বর্তমান বিশ্বে আসমানের নিচে আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানীর মতো এত বড় হাদীসবিশারদ আলেম দেখিনি।'

ইমাম বিন বায ﵀-এর নিকট একটি হাদীস সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। হাদীসটি হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা প্রতি একশ বছরের মাথায় এই উম্মাতের জন্য এমন একজনকে পাঠাবেন যিনি দ্বীন-ইসলামকে সংস্কার করবেন।' তিনি বলেন, আমার ধারণা, শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী হলেন এ যুগের মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

২. আল্লামা ইমাম শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল-উসাইমীন ﵀ বলেন:

'শাইখের সাথে বৈঠকাদিতে বসার পর (যদিও তা কম) যা বুঝতে পেরেছি তা হলো, তিনি সুন্নাহর প্রতি আমল এবং আমল-আকীদা উভয় ক্ষেত্রেই বিদআত উৎখাতে খুবই আগ্রহী। তার লিখিত বই-পুস্তক পড়ে তার ব্যাপারে জানতে পারলাম যে, তিনি হাদীসের সনদ ও মতন উভয় ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী। এ সকল বই-পুস্তক দ্বারা আল্লাহ তাআলা অনেক মানুষকে উপকৃত করেছেন। যেভাবে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তারা লাভবান হয়েছে তদ্রূপ নীতি নির্ধারণ এবং হাদীসশাস্ত্রের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তারা লাভবান হয়েছেন। এটি মুসলমানদের জন্য বড় একটি বড় প্রাপ্তি। আলহামদুলিল্লাহ। ইলমে হাদীসে তার জ্ঞানগর্ভ গবেষণা সত্যি চমৎকৃত হওয়ার মতো।'

৩. খ্যাতনামা মুফাসসির আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকীতী।

শাইখ আবদুল আযীয আল-হাদ্দাহ বলেন, আল্লামা শানকীতী শাইখ আলবানীকে বিস্ময়করভাবে সম্মান করতেন। মদীনার মসজিদে হারামে দারস প্রদান করার সময় তিনি যদি শাইখ আলবানীকে হেঁটে যেতে দেখতেন, তাহলে তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সালাম প্রদান করতেন।

৪. শাইখ আল্লামা মুকবিল ইবন হাদী আল-ওয়াদিঈ বলেন,

'আমি যে আকীদা পোষণ করি এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে দ্বীন হিসেবে যা মনে করি তা হলো, শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী হলেন, সে সকল মুজাদ্দিদগণের অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই হাদীসটি প্রযোজ্য: 'আল্লাহ তাআলা প্রতি একশ বছরের মাথায় এই উম্মাতের জন্য এমন একজনকে পাঠাবেন যিনি দ্বীন-ইসলামকে সংস্কার করবেন।'

❑ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله-এর অন্তিম অসিয়ত:

প্রথমত: আমি আমার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব ও যারা আমাকে ভালোবাসে তাদের নিকট এই অসিয়ত করছি যে, যখন তাদের কাছে আমার মৃত্যুসংবাদ পৌঁছবে তারা যেন আমার জন্য আল্লাহর নিকট রহমত ও মাগফিরাত কামনা করে দুআ করে এবং আমার মৃত্যুতে কেউ যেন নিয়াহা বা উচ্চআওয়াজে ক্রন্দন না করে।

দ্বিতীয়ত: যেন অনতিবিলম্বে আমাকে দাফন করা হয় এবং প্রয়োজনীয় কাফন-দাফনের প্রস্তুতির জন্য যাদেরকে না হলেই নয় তাদেরকে ছাড়া নিকটাত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধবকে মৃত্যুর সংবাদ দিতে গিয়ে যেন দাফনকর্ম বিলম্ব না করে। আমাকে গোসল দেওয়ার দায়িত্ব পালন করবে, ইযযত খাযার আবূ আবদুল্লাহ এবং তিনি যাকে এ কাজে সহযোগিতার জন্য পছন্দ করবেন। তিনি আমার প্রতিবেশী এবং একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু।

তৃতীয়ত: তিনি মৃত্যুর আগেই তার বাড়ির অদূরেই কবরের জন্য জায়গা নির্ধারণ করে দেন। যেন গাড়িতে উঠিয়ে তার লাশ বহন করে দূরে নিতে না হয় কিংবা কবর দিতে আসা লোকজনকে গাড়িতে চড়ে লাশের সাথে যেতে না হয়। সেই সাথে এমন পুরনো গোরস্থানে যেন তাকে কবর দেওয়া হয় যেটার ব্যাপারে আশা করা যায় যে, সেটা আর খুঁড়া-খুঁড়ি করা হবে না।

আমি যদি দেশের বাইরে মারা যাই তবে আমার দাফনকর্ম সমাধান করার আগে যেন দেশে আমার সন্তান-সন্ততি বা অন্য লোকজনকে খবর না দেওয়া হয়। অন্যথায় তারা আবেগের

বশবর্তী হয়ে হয়তো এমন কিছু করবে যার কারণে আমার দাফনকর্ম বিলম্ব হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করি, আমি যেন তাঁর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করি যে, তিনি মৃত্যুর আগেই আমার পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।

আর আমার লাইব্রেরির ব্যাপারে অসিয়ত হলো, লাইব্রেরির প্রকাশিত, অপ্রকাশিত, পাণ্ডুলিপি, আমার লেখা বা অন্যের লেখা সকল বইপুস্তক মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়াকফ করছি। যেন কুরআন-সুন্নাহ ও সালফে-সালিহীনের মানহাজের দিকে দাওয়াতের পথে এগুলো স্মৃতি হিসেবে অবশিষ্ট থেকে যায়। কারণ, আমি এককালে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলাম। আল্লাহর নিকট আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক থাকা অবস্থায় তিনি যেভাবে আমার মাধ্যমে ছাত্রদের উপকার করেছেন ঠিক সেইভাবে আমার লাইব্রেরিতে যে সকল মানুষ জ্ঞানার্জনের জন্য আসবে তারাও যেন এগুলো থেকে উপকৃত হয়। আর আমি নিজেও যেন তাদের দুআর মাধ্যমে লাভবান হই।

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

হে রব! তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যে নেয়ামত দিয়েছ তার শুকরিয়া আদায়ের তাওফীক দান করো। আরও তাওফীক দান করো এমন নেক আমল করার যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। আমার উপকারের জন্যে আমার সন্তান-সন্ততিকে পরিশুদ্ধ করে দাও। আমি তোমার নিকট তওবা করলাম। নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।[৯৪৭]

অসিয়তের তারিখ: ২৭ জুমাদাল আওয়াল, ১৪১০ হিজরী।

❑ মৃত্যু:

ইমাম আলবানী رحمه الله-এর ওফাত হয় শনিবার ২২ জুমাদাল আখিরা ১৪২০ হিজরী মোতাবেক ২ই অক্টোবর ১৯৯৯ ঈসাব্দ। ঈশার সালাতের পরে তাকে দাফন দেওয়া হয়। দুটি কারণে শাইখের দাফন তাড়াতাড়ি দেওয়া হয়:

প্রথমত তার অসিয়ত বাস্তবায়ন।

দ্বিতীয়ত শাইখের মৃত্যুর সময়কালটা ছিল খুব গরম। তাই যেন দাফন দিতে আসা লোকজনের কষ্ট না হয়ে যায় ।

৯৪৭. সূরা আহকাফ, আয়াত : ১৫

যদিও শাইখের মৃত্যুর সংবাদ নিকটাত্মীয় ও কাফন-দাফনে সহযোগিতার জন্য বিশেষ কিছু লোককে ছাড়া অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি এবং মৃত্যুবরণের পর দাফন করতে তেমন বিলম্বও করা হয়নি, তথাপি তারা জানাযায় হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়। যে-ব্যক্তিই তার মৃত্যুর খবর জানতে পারে সেই অন্য ভাইকে এই খবর পৌঁছিয়ে দেয়।

আমরা দুআ করি, হাদীসশাস্ত্রের এই মহান খাদেমকে আল্লাহ তাআলা যেন মুসলিম জাতির পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করেন। আমীন।

জীবনী-লেখক:

— শাইখ আবদুল্লাহিল হাদী মাদানী হাফিযাহুল্লাহ।

প্রকাশিত বইসমূহ

হাদীস কেন মানতে হবে?
লেখক: কামাল আহমাদ,
সম্পাদক: উস্তায আব্দুল্লাহ মাহমুদ।

মুসলিম জাতির দুর্দশার কারণ ও উত্তরণের উপায়
মূল: শাইখ ইবনু উসাইমীন,
অনুবাদ: হুসাইনুল ওয়ালিদ।

একগুচ্ছ উপদেশ
মূল: শাইখ ড. রাবি আল মাদখালি,
অনুবাদ: নাঈম রহমান।

এটা সালাফগণের মানহাজ নয়!
মূল: শাইখ ড. মুহাম্মাদ বাযমূল,
অনুবাদ-সম্পাদনা ও ব্যাখ্যা:
শাইখ ড.আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া।

সাহাবিগণের অন্তঃকলহ এবং সালাফগণের অবস্থান
মূল উর্দু: শাইখ ইরশাদুল হক আসারি,
অনুবাদক: ওমর ফারুক রায়হান।

বিংশ শতাব্দীর তিন কিংবদন্তি
শাইখ আলবানি, শাইখ বিন বায ও
শাইখ ইবন উসাইমীনের সংক্ষিপ্ত জীবনী
ও শিক্ষনীয় ঘটনাবলির সংকলন।

ফাতাওয়ায়ে আলবানী
সংকলন ও অনুবাদ: উস্তায আব্দুল্লাহ মাহমুদ।

পূর্ণাঙ্গ নাহু ও সরফ সিরিজ

সহজ ব্যবহারিক নাহু (১ম ও ২য় খণ্ড)
লেখক: আব্দুল হাসীব বিন রইস উদ্দিন।

সহজ ব্যবহারিক সরফ (১ম ও ২য় খণ্ড)
লেখক: আব্দুল হাসীব বিন রইস উদ্দিন।

প্রকাশিতব্য বইসমূহ

নারীদের ইসলামী ফিকাহ
মূল: আল্লামা আমর আবদুল মুনঈম সালিম।
অনুবাদ: উস্তায আব্দুল্লাহ মাহমুদ।

নব দম্পতির প্রতি রাসূল ﷺ এর ৩০ উপদেশ
অনুবাদ ও সম্পাদনা: আব্দুল হাসীব বিন রইস উদ্দিন।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ : কারণ ও প্রতিকার
মূল: শাইখ আবদুল আযীয আলুশ শাইখ।
অনুবাদ: মুহাইমিনুর রহমান স্নিগ্ধ।
সম্পাদনা: ড. আসিমউল্লাহ নাবিল।

الفتاوى الألباني

لمحدث العصر الامام الفقيه محمد ناصر الدين الألباني

جمعه وترجمه

عبد الله المخفوظ

راجعه

الشيخ د. عبد الله الفاروق السلفي

الشيخ د. محمد شهيد الله خان المدني